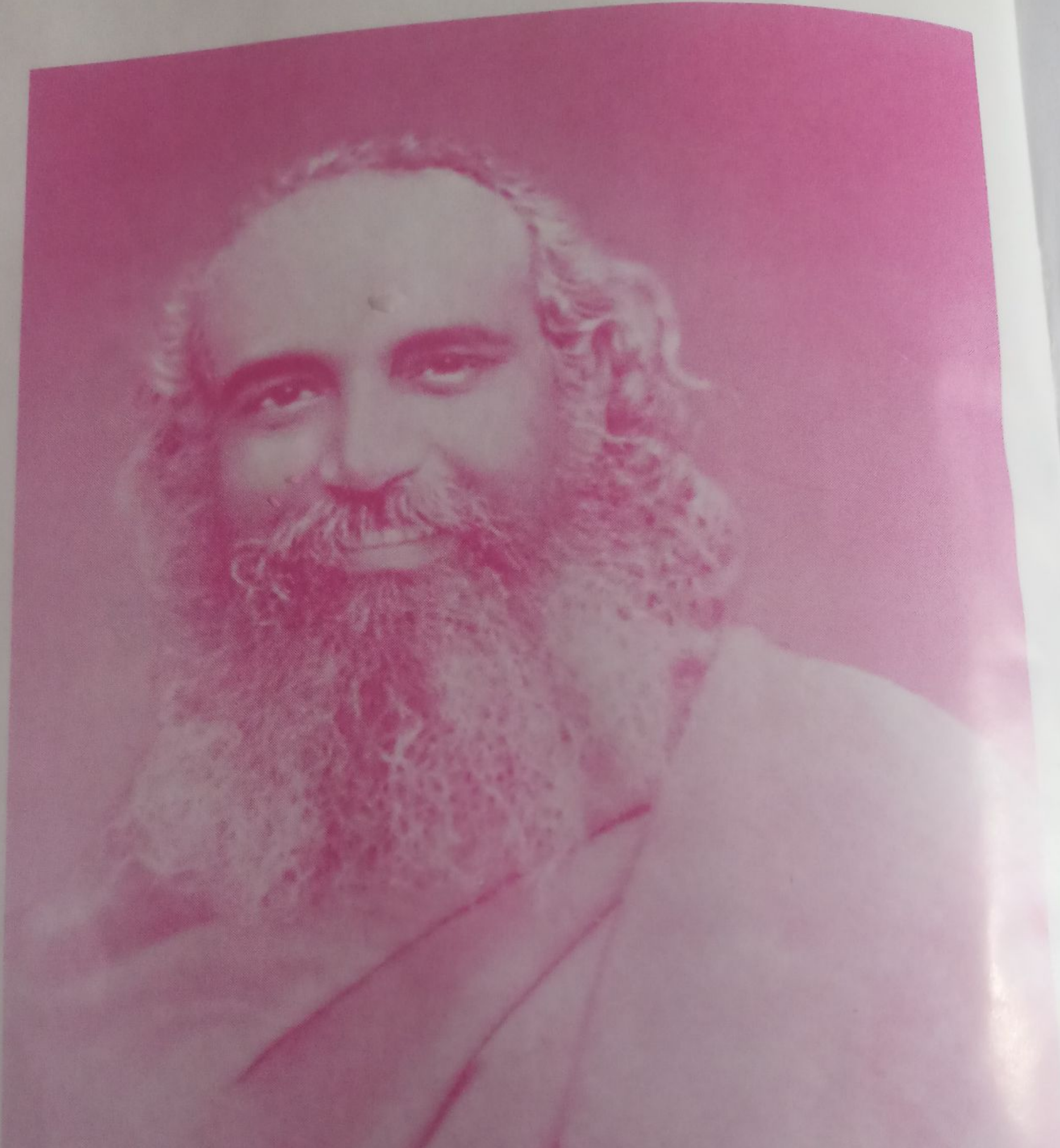
অখণ্ড সংহিতা

বা

একবিংশ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

একবিংশ খণ্ড

—ঃ (*) ঃ—

গোপালপুর (নোয়াখালী)
২৯শে আশ্বিন, বুধবার, ১৩৪২
(১৬ই অক্টোবর, ১৯৩৫)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে আসিয়াছেন। গ্রামের উৎসাহী সেবাকর্ম্মী যুবকেরা সকলে মিলিত হইয়া একটী "শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম" স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণির সেখানেই স্থিতিস্থান করা হইয়াছে। গ্রামবাসী সজ্জন ও জননীরা সকলেই পূর্ণ সহযোগ দিতেছেন।

প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখনেই ব্যস্ত ছিলেন। টেবিলের উপর তাড়ায় তাড়ায় পত্র সজ্জিত রহিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি একটার পর একটা করিয়া উত্তর দিতেছেন। একটী নবাগত যুবক আসিয়া পত্রগুলির অনুলিপি লিখিয়া রাখিতেছে।

সৎ হওয়া ও সদ্ভাবে চলা

কিন্তু একজন আসিয়া প্রশ্ন শুরু করিলেন। তিনি বলিলেন,— বলুন ত' বাবামণি, সদ্ভাবে চলি কি ক'রে? চারিদিকে প্রলোভন, চারদিকে কুদৃষ্টান্ত।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চারিদিকে শত প্রলোভন আর দশ দিকে সহস্র সহস্র কুদৃষ্টান্ত, মাত্র এই কারণেই আমরা সদ্ভাবে চল্‌তে পারি না, একথা ঠিক নয়। আমরা নিজেরা সৎ হই না, নিজেদিগকে সৎ ক'রে গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করি না, তারই জন্য চারিদিকের প্রলোভনের হাতছানি দেখে আর নিজেদের সামলাতে পারি না। তারই জন্য দিকে দিকে যত কুদৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাই, সবগুলি যেন একযোগে এসে আমাদের ঘাড়ে চেপে ধরে। ফাঁকতালে একটু প্রেম করবার সুযোগ পাই ব'লেই একজনের সঙ্গে অবৈধ প্রেম ক'রে বসি, তা' নয়, চরিত্রের যে অনুশীলনের অভাবে ফাঁকতালের প্রেমকে আর ছেড়ে দেওয়া যায় না, সেই অনুশীলন আগে থেকেই জীবনে ক'রে আসিনি ব'লে তুচ্ছ

প্রলোভনে পা পিছলে পড়ে যাই। চরিত্রের যে দৃঢ়তার অনুশীলন থাক্‌লে জগতে কাউকে তার সঙ্গত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত ক'রে নিজে বেশী লাভবান হবার জন্য কদাচ রুচি হয় না, সেই অনুশীলন আমার মধ্যে না থাকার দরুণই অন্যকে তার সঙ্গত প্রাপ্য না দিয়ে নিজেকে বেশী লাভবান করার চেষ্টা করি। প্রলোভন আর কুদৃষ্টান্ত জগতে চিরকাল ছিল এবং চিরকাল থাক্‌বে। কিন্তু যিনি নিজের চরিত্রকে প্রলোভন-জয়ী এবং কুদৃষ্টান্তের জ্বলন্ত প্রতিবাদ-রূপে গড়ে তোল্‌বার চেষ্টা আবাল্য করে এসেছেন, তিনি কখনো এক কথায় কাবু হতে পারেন না এবং তিনি জীবনে কোনো ভুল ক'রে বসলে প্রলোভনকেও দায়ী করেন না, অপরের কুদৃষ্টান্তেরও দোহাই দেন না। প্রয়োজন হচ্ছে সৎ হওয়ার। সৎ একবার হতে পারলে জীবনকে নিষ্কলঙ্ক ভাবে চালিয়ে যাওয়া সহজ হবে।

সদসদ্ বিচারে তীক্ষ্ণতা প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সৎ হ'তে গেলে সৎ এবং অসতের পার্থক্য-বিচারে একটু দক্ষতার প্রয়োজন। যার এই পার্থক্য-বিচারে বিভ্রান্তি থাকে, সে বিচারের ভুলের জন্য সৎ ভেবে অসৎ কাজ করে। একটী কামার্ত্তা নারী এসে তোমাকে

বল্ল যে, তার স্বামী দূর-বিদেশে হয়ত মারাই পড়েছে। তার মৃত্যু সংবাদটা ঘরে এসে পৌঁছা মাত্র সে সন্তান-লাভের বৈধ অধিকার থেকে চিরতরে সামাজিক ভাবে বঞ্চিত হবে এবং সে সমাজের কাছে এভাবে ধিক্কৃত হতেও চায় না। কিন্তু অনাথা নিরাশ্রয়া রমণী একটী পুত্র-সন্তান, এমন কি একটা কাণা খোঁড়া মেয়েও যদি না পায়, তবে কাকে অবলম্বন ক'রে সে সুদীর্ঘ বাকী জীবনটা কাটাবে? অতএব, হে পর-দরদী যুবক-বন্ধু, তুমি আজ এসে আমাতে গর্ভাধান ক'রে একটা পরোপকার ক'রে যাও। একথা দুনিয়ার কারো কাছে কখনো প্রকাশ পাবে না, গোপনই থাক্‌বে এবং যুবক-বন্ধুর সহায়তার প্রয়োজন ত' মাত্র একটী রজনীর। বন্ধু, তুমি কি এই এতটুকু উপকার কত্তে পার না এক অনাথিনী কাতরা নারীর? চরিত্র যদি সুগঠিত না হয়, তাহ'লে অনেক যুবকই এরূপ প্রলোভনের জালে আটক পড়ে যাবে। এক্ষেত্রে প্রলোভনের আর দোষ কি? দোষ সমস্তই ত' যুবকের অগঠিত চরিত্রের। কত সমর্থ যুবক কত স্বল্প-পরিচিত গৃহস্থের ঘরে আশ্রিতের মত বাস করে এবং গৃহস্বামিনী দুশ্চরিত্রা হ'লে এরূপ কত প্রলোভন তাদের সামনে আসে। ধরা প'ড়ে গেলে তারা দোহাই দেয় যে, মেয়ে-মানুষটাই খারাপ ছিল, তার নিজের কোনো দোষ নেই। রোজই যদি একটী কামাতুরা নারী নানা ভাবে নানা ঢংয়ে নানা অছিলায় ঘনিষ্ঠতা ক'রে

ক'রে কেবল নির্দ্দিষ্ট একটা কাজের জন্য আকর্ষণ কত্তে থাকে, তবে পুরুষত্বে অভিমানী ব্যক্তি কি ক'রে আত্মসম্বরণ কত্তে পারে? কিন্তু এটা একান্তই কুযুক্তি। কেউ তোমাকে ক্লীব ব'লে গাল দিয়েছে ব'লেই তুমি অবৈধ ভাবে তোমার পুরুষত্বকে প্রমাণের জন্য এগিয়ে যাবে, এটা নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা। অন্য নারীর কাছে ক্লীব থেকেও নিজের চরিত্র নিজে বাঁচানো তোমার কর্ত্তব্য। কিন্তু এটাই যে তোমার কর্ত্তব্য, তা' বুঝবার মতন সূক্ষ্ম এবং দৃঢ় ধীশক্তি তোমার থাকা প্রয়োজন। অফিসের সব বাবুরা ঘুষ খায়, সুতরাং আমি না খেলে আমার বড়ই বিপদ,—এই রকমের অজুহাতও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মবঞ্চনা মাত্র। সব রেল-যাত্রীরা বিনা টিকিটে যাচ্ছে, একা আমি একখানা টিকিট পয়সা দিয়ে কাটলেই বা কি, না কাটলেই বা কি, এই বিচারও এই ঢংয়ের হ'ল। নিজের সদসদ্-বিষয়ক বিচার-শক্তিকে তীক্ষ্ণ না কত্তে পার্ল্লে কেবল সদিচ্ছার গুণে কেউ সৎ থাকতে পারে না।

ভুলের প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বুঝে বা না বুঝে কোনো পাপ কাজ কর্ল্লে, সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ আসে ভাগ্যবান লোকের। আরো ভাগ্যবান যারা, তারা কুকাজটা করার পূর্ব্বক্ষণেই হঠাৎ সাবধান হ'য়ে যান। কিন্তু অনেকেরই অনুতাপ আসে

ধরা পড়ে গেলে বা অন্য কারণে। পাপ করার সঙ্গে সঙ্গে পাপের জ্বালা যাকে বৃশ্চিক-দংশনের মত অধীর ক'রে ফেলে, তার পক্ষে পরবর্ত্তী পাপানুষ্ঠান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অতি সহজ। কিন্তু অনেকের আবার অনুতাপ করাটা একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়। যে কুকাজ ক'রে অন্তরে জ্বালাবোধ হচ্ছে, তারই বারংবার চর্চ্চা কত্তে কত্তে অনুতাপ জিনিষটা একটা নিয়ম-মাফিক ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে যায়। অর্থাৎ এই লোক-দেখানো অনুতাপে মনের গতি সৎপথে ফিরে না। এমন লোকেরা বারংবার পাপ করে এবং ভগবানের দোহাই দিয়ে বলে, "ঠাকুর, আমি ত' কর্ত্তা নই, কর্ত্তা ত' হচ্ছ তুমি, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমাকে করধৃত যন্ত্রের মত ব্যবহার ক'রে যখন যা করাচ্ছ, আমি তোমার খেলার পুতুল, তাই তখন ক'রে যাচ্ছি। এতে আমার কোনো দোষ নেই, দোষটা সবই তোমার।" এ হ'ল এক অতি চমৎকার স্তরের আত্মবঞ্চনা। পাপে নিশ্চয় কোনো না কোনো প্রকারের সুখ হয়। সেই সুখটুকু পাব আমি, আর কর্ম্মফলের জন্য দায়ী কর্ব্ব ভগবানকে, এর চেয়ে বড় প্রহসন আর কি হ'তে পারে? এসব ন্যাকামিতে ভগবান্ ভোলেন না। তিনি কাজের যোগ্য সুখটুকু ত' তোমাকে লুটতে দিয়েছেনই, তা থেকে তোমাকে বঞ্চিত করেন নি, কিন্তু এ কাজের জন্য প্রাপ্য দুঃখটুকু থেকে তোমার রেহাই নেই। কেউ কেউ বলেন,—কৈ পাপ ত'

কিছু করিনি, একাজ ত' সৃষ্টির আদি থেকে বিশ্বের সমস্ত মানব-মানবী নির্ব্বিচারে ক'রে এসেছে। এগুলি ত' স্বাভাবিক ব্যাপার। যেটা স্বাভাবিক, তাতে আবার পাপ কিসের? বেশ, মেনে নিলুম পাপ তাতে নেই। কিন্তু তবে তাপে ভোগ কেন? যা-কিছু তোমার অন্তরে, আজ হোক্, কাল হোক্, তাপ সৃষ্টি করে, তারই নাম পাপ। তাপ সৃষ্টি না হ'লে তুমি কদাচ বুঝতেই পারতে না যে, তুমি ভুল করেছ। তাপের যখন সৃষ্টি হয়েছে, তখন তুমি অবিলম্বে প্রতিজ্ঞা কর যে, একাজ আর কখনো কর্ব্বে না। একটা পেনসিল চুরি থেকে পরনারী-ধর্ষণ পর্য্যন্ত ছোট বড় যত কাজে তাপ আছে, যদি দৈবাৎ তার কোনো একটা ক'রে থাক, তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা কর যে, একাজ আর কর্ব্বে না আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সংসর্গগুলি ছেড়ে দাও, যে-সব সংসর্গে থাকার ফলে তোমাকে পাপাসক্ত হ'তে হয়েছে। সৎসংসর্গের ফলে পাপীও পুণ্য-পথে চলবার প্রেরণা পায়, অসৎসংসর্গের ফলে পুণ্যবান্‌ও পাপ-পথ আশ্রয় করে।

সৎসংসর্গ ও অসৎ-সংসর্গ নিরূপণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সৎসংসর্গ কোন্‌টা আর অসৎ-সংসর্গই বা কোন্‌টা, তা' প্রথম দুই চার দিনের পরিচয়ে না

বুঝা গেলেও বুঝতে খুব দীর্ঘ সময় লাগে না। যার সংসর্গে এলে মনের উন্নতি-মুখিনী প্রেরণাগুলি শত মুখে বিস্তার পেতে থাকে, তার সংসর্গ সৎসংসর্গ। যার সংসর্গে এলে মনের অবচেতনে নানা কদর্য্য অভিলাষ বা মিথ্যার সাথে মিতালির প্ররোচনা জাগে, জান্‌তে হবে যে, তার সংসর্গ কুসংসর্গ। নিজের চারিত্রিক বল দৃঢ় থাক্‌লে প্রলোভন আর কুদৃষ্টান্ত কিছু কত্তে পারে না, একথা যেমন সত্য, ঠিক তেমনি চরিত্রকে দৃঢ় ও আদর্শকে অনমনীয় ক'রে গড়ার জন্য শক্ত মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট সৎলোকের সংসর্গও প্রয়োজন। এসব কথা বহু মহাজন বহু ভাবে বহু যুগে বারংবার বলে গেছেন, আমি আর নূতন ক'রে কি বল্‌ব?

বিবেকের দ্বন্দ্ব

প্রশ্নকর্ত্তা ভয়ে, সঙ্কোচে, সম্ভ্রমে ও ভক্তিতে কাঁদিতে কাঁদিতে অর্দ্ধকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—এমন সব দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা আপনি আমাকে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন, যেমন ঘটনা আমারই জীবনে ঘটেছে। আপনি কি ক'রে আমার জীবনের অত্যন্ত গোপনে রাখা কাহিনীগুলি জান্‌লেন? আপনি কি থট্-রিডিং জানেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না, আমার পরচিত্তজ্ঞান নেই, ঐসব আশ্চর্য্য বিদ্যার আমি অধীশ্বর নই। আমার সম্বল

সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান। নিজের জীবনের ঘটনা দিয়েও মানুষ অনেক সময়ে পরের জীবনের ঘটনার উপরে উপদেশ দিতে পারে। অপরের বর্ণিত আত্মকাহিনীর মধ্য থেকে সকলকে উপদেশ দেওয়ার উপকরণ আহৃত হ'তে পারে। আমি কোনও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ নহি, আমি সাধারণ মানুষ। পুপুন্‌কী থেকে রংপুর আসার ভাড়া আমাকে একজন ভদ্রলোক দিয়েছেন। পথে আমাকে বৰ্দ্ধমানে নামতে হ'ল, কলকাতায় নামতে হ'ল, উভয় স্থানে নিজের করণীয় কাজ কত্তে হ'ল। এমন অবস্থায় বৰ্দ্ধমান বা কল্‌কাতায় কেউ যদি আমাকে পুপুন্‌কী থেকে বর্দ্ধমানের রেলভাড়া বা বর্দ্ধমান থেকে কল্‌কাতার রেল-ভাড়া দেন, তবে তা' আমি নিতে পারি কি? হিসাবের এক সাধারণ বিচার। যদি কেউ যেচে এসে এই ভাড়াটা আমাকে দেন, তবু আমি নিতে পারি না এবং নিতে পরি না ব'লেই নেই না। বল ত', এটা আমার বোকামি হ'ল, না সাধুতা হ'ল? সাধুতা হ'য়ে থাক্‌লে, এই সাধুতা আমার অর্থকৃচ্ছ্রের কারণ হ'ল। অযাচক সাধুর অর্থকৃচ্ছ্রতা তো গলার কণ্ঠী। অর্থকৃচ্ছ্রতা আমাকে শারীরিক ক্লেশ দিল কিন্তু অন্তরে অনাবিল আত্মপ্রসাদ অৰ্জ্জনের বাধা হ'ল না। তাই থেকে আমি বুঝে নিতে পারি যে, কাজটা ভাল করেছি। দেশের পর দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি কত কৃচ্ছ্র স'য়ে, তবু অন্তরে প্রশান্ত উল্লাস এই ভেবে যে, আমি জগতের একটী প্রাণীকেও

অন্যায় ভাবে একটী পয়সা ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে দেই নাই। তুচ্ছ এক একটা বিষয় নিয়ে এভাবে নিয়ত আমার বিবেকের দ্বন্দ্ব চলে। দুই পক্ষে দুই, চার বা পাঁচটী মাত্রই নয়, একেবারে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের সমাবেশ হয়, যারা প্রতি মুহূর্ত্তে পরস্পরকে আঘাত হানবার জন্য সশস্ত্র ভাবে দণ্ডায়মান, যাদের অশ্বের হ্রেষারবে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত, যাদের করিকুলের বৃংহণে ধরিত্রী কম্পিত। নিজের মনের কুরুক্ষেত্রকে দেখে দেখে আমি তোমাদের মনের কুরুক্ষেত্রের অবস্থাটা কল্পনা করি। তোমাদের কারো মনের ভিতরের গুপ্ত কথাকে আমি জানি না। তোমাদের জিজ্ঞাসু মনের ভিতরে আমি আমার সরল সহজ দ্বিধাহীন মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে তার অতল তলে হাতড়িয়ে যখন যা' মুঠোর মধ্যে পাই, তখনি তা' উপঢৌকন দেই।

স্ত্রীসম্ভোগ কি পাপ

প্রথম জিজ্ঞাসু বিদায় নিতে না নিতেই আর একজন জিজ্ঞাসু শ্রীশ্রীবাবামণির স্থিতি-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন,—পরে ভিড় হ'য়ে যাবে। আমার কথা আমি প্রকাশ্য স্থানে বল্‌তে পাচ্ছি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বেশ ত' বল।

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—সবাই আপনারা বল্‌ছেন, স্ত্রীসঙ্গম

পাপ। স্ত্রীসঙ্গম পাপ হ'লে দুনিয়ার যত মহাপুরুষেরা কি বিনা সঙ্গমে জন্মগ্রহণ করেছেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সৃষ্টির যেটা নিয়ম, সেটা মহাপুরুষ বা অবতার সম্পর্কে অন্যরূপ হবে, এটা ভাবা যায় না। পুরুষ আর নারী যখন পৃথক্ দেহ-গঠন ও পৃথক্ শারীরিক দায়িত্ব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে, তখন সন্তান-জননের প্রয়োজনে তাদের সম্মিলিত চেষ্টার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। নতুবা উভলিঙ্গী প্রাণীর ন্যায় একটী স্ত্রী একাকিনীই অথবা একটী পুরুষ একাকীই পুত্রকন্যার জননী বা জনক হতে পাত্তেন। মানুষের জন্মরূপ ক্রিয়াটী যখন পাপজনক নয়, তখন জননকর্ম্মে সহায়ক কোনও কর্ম্মকাণ্ডকে পাপ ব'লে ঘৃণা করা চলে না। নির্ব্যক্তিক বিচারে নর-নারীর সম্ভোগ-ক্রিয়া পাপও নয়, পুণ্যও নয়, একটী স্বাভাবিক ব্যাপার মাত্র। কিন্তু সম্ভোগের ফল যদিও নূতন মানুষের জন্ম, তথাপি স্থলবিশেষে সম্ভোগ পাপ, স্থলবিশেষে তা' পুণ্য। সম্ভোগের স্বাভাবিক সুফলটুকু কি? সুখোদয়। কার সুখোদয়? যে দুজন একাজে লিপ্ত, তাদের সুখোদয়। কি জাতীয় সুখ? না, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের স্পর্শজনিত সুখ। সুখ কার? যে সম্ভোগ করে। যে নিজে সম্ভোগ করে না, অপরের সম্ভোগ-কার্য্যে সহযোগ কত্তে বাধ্য মাত্র হয়, তার কি সুখোদয় হয়? হয় না, হ'লেও তা অতি তরল ও স্বল্প। তাহ'লেই স্বীকার কত্তে হবে যে,

সম্ভোগের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, সম্মিলিত দুই জনেরই প্রভূত সুখোদয় এই কাজটীর লক্ষ্য। যে স্থলে এই লক্ষটী লাভ হ'ল না, বল্‌তে হবে, সেখানে সম্ভোগ ব্যর্থ হয়েছে। দুজন দুজনের সংসর্গে সুখাস্বাদন করেছে, এইটুকুই কি সম্ভোগের চূড়ান্ত সার্থকতা? নিশ্চয়ই নয়। কারণ, তাই যদি হত, তাহ'লে একবার সম্ভোগের পরেই পুনরায় অতি সত্বর সম্ভোগের জন্য ব্যাকুলতার সৃষ্টি কি ক'রে হয়? ক্ষণকালের সম্ভোগ যদি দুজনের মধ্যে দীর্ঘকালের গভীর সখ্যভাবের জন্ম দিতে পারে, তবেই সম্ভোগ সার্থক। নিজ বিবাহিতা পত্নীর সহিতই এই সখ্যভাবের একটা সার্থকতা আছে। স্বামী যখন স্ত্রীর সঙ্গে গভীর সখ্যভাবে বদ্ধ, তখনি সংসারীর জীবন হয় সুখের। স্বামী এবং স্ত্রীর শারীর সম্ভোগ যখন প্রীতির মধ্য দিয়ে ঘটে এবং যখন তা' হয় উভয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ আত্মিক মিলনের পরিপূরক, যখন তা' হয় সুনিশ্চিত সুগভীর তৃপ্তির সাধক, তখন তা' সখ্যভাবের যে স্থায়িত্ব দান করে, তা অনির্ব্বচনীয়। নিজ স্ত্রী ছাড়া বা নিজ স্বামী ছাড়া অন্যের সহিত এইরূপ গভীর সখ্যের সৃষ্টি হ'লে সংসারকে সুখময় করার পক্ষে তা' কখনো সহায়ক হয় না। এই কারণেই স্ত্রী ছাড়া স্বামীর বা স্বামী ছাড়া স্ত্রীর অন্য কারো সঙ্গে সঙ্গমকে পাপজনক ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। স্ত্রীপশুর সহিত পুরুষ পশুর সম্বন্ধের স্থায়িত্ব, দায়িত্ব, ব্যাপকতা এবং

গভীরতার সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই উঠে না কিন্তু স্ত্রী-মানুষের সহিত পুরুষ-মানুষের সম্বন্ধের স্থায়িত্ব, দায়িত্ব, ব্যাপকতা এবং গভীরতা নিয়েই ত' মানুষ সমাজকে করেছে সৃষ্ট, পুষ্ট, বিস্তারিত ও বিকশিত। সারা পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের মানুষ স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর আর স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্কের দৃঢ়তা আর শিথিলতার ভিত্তিতেই নিজ নিজ যুগের উপযোগী জীবনাদর্শ চিরকাল রচনা ক'রে এসেছে। এই কথাটী স্বীকার ক'রে নিয়ে সুস্থ চিত্তে স্ত্রী-সঙ্গম ব্যাপারটীকে অনুধাবন করা উচিত। কোনও স্ত্রীতে উপরত হ'য়ে তারপরে তুমি নিজেই ত' নিজেকে প্রশ্ন কত্তে পার যে, কাজটী পাপ হ'ল, না পুণ্য হ'ল। কুমারী, বিধবা, ব্রহ্মচারিণী, ব্রতধারিণী, অনিচ্ছুকা, গুরুতর রুগ্না, নিরাশ্রয়া, গর্ভবতী বা ক্ষুধার্ত্তা রমণীতে উপরতা হ'লে, তোমার মনই ত' তোমাকে বলে দেবে যে, কাজটা পুণ্য হল, না পাপ হ'ল। যে তোমার স্ত্রী নয়, যে তোমাকে সৎ ব'লে বিশ্বাস ক'রে তোমার আশ্রয় নিয়েছে, যে অন্য এক লম্পটের হাত থেকে উদ্ধার পাবার আশায় হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্যা হ'য়ে তোমারই গৃহে এসে প্রবেশ করেছে, তাকে এনে সম্ভোগ কর্ল্লে পাপ হয়, না পুণ্য হয়, তা' জান্‌বার জন্য তোমাকে পঞ্চাশখানা শাস্ত্রগ্রন্থ পড়্‌তে হবে না। একটুখানি পরে তোমার মনই সত্য কথাটা তোমাকে শুনিয়ে দেবে। যে

সম্ভোগ অন্তরের তাপবর্দ্ধক, তা-ই পাপ। যে সম্ভোগে মানুষের হয় ক্ষতি, জীবনের মূল্যমান যায় ক'মে, তাই হচ্ছে পাপ। সমাজের লোক অনেক সময়ে নিজ নিজ কুলপ্রথার দাসত্বানুসারে পাপকে পুণ্য এবং পুণ্যকে পাপ ব'লে ভ্রম করে কিন্তু নিজের কাজের নিজে যদি বিচারক হও, তাহ'লে দেখ্‌বে, কোন্‌টা পাপ আর কোন্‌টা পুণ্য, তা' বুঝতে তোমার দেরী হবে না। আজ যে কাজটাকে পুণ্য মনে কচ্ছ, কাল যদি সে কাজটাকে পাপ মনে হয়, তবে বুঝতে হবে, তোমার বিচারে বিভ্রাট ছিল। কাল-প্রতীক্ষা কর, আবার বিচার ক'রে দেখ, বারংবার নিজেকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখ যে, নিজেকে সত্য সত্য মুক্তিদান সম্ভব কিনা। মানুষের বিচার বারংবার ভুল পথে চলে না, মানুষের বিবেক বারংবার ভুল কথা বলে না।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি পত্রলিখনে মনোনিবেশ করিলেন।

প্রকৃত সেবা

চট্টগাম জেলান্তর্গত গুজরা-নোয়াপাড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিজেদের কাজ নিজেরা খুঁজিয়া বাহির করিয়া লও। চারিদিকে লক্ষ্য দাও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মানুষের অন্তরাত্মার ভিতরে প্রবেশ কর। কে কোন্ অভাবের তাড়নায় মরিয়া হইয়া

উঠিয়াছে, তাহা দেখাই তোমার প্রধান প্রয়োজন। যাহার যাহা অভাব, তাহাকে তাহা দেওয়া বা তাহার অভাব-বোধকে অন্যতর শ্রেষ্ঠ পথে প্রধাবিত করিয়া তাহার অন্তরের ক্ষুধার অপনোদন ঘটানোই প্রকৃত সেবা। উৎকৃষ্ট বিষয়ের ক্ষুধাতৃষ্ণাকে অপকৃষ্ট বিষয়ের দিকে অপসারিত করার নাম সেবা নহে, তাহার নাম সর্ব্বনাশ-সাধন। শুনিতে পাই, কোনো কোনো পরাধীন দেশের শাসনকর্ত্তারা দেশহিতব্রতী বন্দীদিগকে নানা কুৎসিত পরিস্থিতির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহাদের চরিত্রের হেয়তা সাধনে যত্নপর হইয়া থাকে। একথা সত্য হইলে বলিতে হইবে যে, মানবাত্মার স্বাধীনতা লাভের স্পৃহাকে ইহারা হেয়তর পথে প্রধাবিত করিয়া তাহাদের জীবনের সর্ব্বনাশ সাধনে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছে। যে সময়ে দেশ, জাতি বা জগতের স্বাধীনতাকামী উচ্চাকাঙ্ক্ষ মানুষগুলির ভিতরে প্রয়োজন রুদ্র পৌরুষ ও দীপ্ত মনুষ্যত্ববোধের প্রোজ্জ্বল জ্যোতি প্রতিফলিত করার, সেই সময়ে যদি কবি, দার্শনিক, বক্তা, গায়ক, রাজনৈতিক নেতা বা ধর্ম্ম-সংগঠনকারীরা এমন কিছু করেন, যাহার ফলে ইহাদের অন্তরের খাঁটি সোণায় ভেজাল আসিয়া ঢোকে, তবে জানিও, ইহার চাইতে দেশের অধিকতর মারাত্মক ক্ষতি আর কিছু হইতে পারে না। প্রতিটি মানুষই কোনও না কোনও ক্ষুধায়, কোনও না কোনও তৃষ্ণায়, কোনও না কোনও নেশায় কাতর। নিকৃষ্ট যাহার নেশা,

তাহাকে উৎকৃষ্টতর নেশায় আকৃষ্ট করাই তাহার সেবা। উৎকৃষ্ট যাহার নেশা, তাহাকে নিজের নেশায় আরও মশগুল হইবার প্রেরণা দানই তাহার সেবা। শুধু প্রেরণা দানেই তোমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যাইবে না। সম্ভব হইলে তাহার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া দিবার কাজেও তোমাকে নামিতে হইবে। সেবা করিতে হইলেই অনেকগুলি টাকা লাগে, এই ধারণা সত্য নহে। অধিকাংশ সময়েই আমরা মুখোচ্চারিত সরল সত্য কথার দ্বারা মানুষের অধিকতর সেবা করিতে পারি। মানুষের ক্রমোন্নতিতে যে আমাদের বিশ্বাস আছে, সেই ক্রমোন্নতিকে এই একটী নির্দ্দিষ্ট মানুষের মধ্য দিয়া বিকশিত হইতে দেখিলে আমরা যে সত্য সত্যই নিজেদের নয়ন-মনকে সার্থক বলিয়া জ্ঞান করিব,—এই বোধের অকৃত্রিমতা হইতেই প্রকৃত সেবার জন্ম। সেবা,—সেবা,—সেবা,—কথাটা আমরা বারংবার নানা প্রয়োজনে উচ্চারণ করিতেছি কিন্তু সেবা কথাটার প্রকৃত মানে বুঝিবার চেষ্টা করি কি?”

সমালোচনা

বগুড়া জেলান্তর্গত গোবিন্দপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“সমালোচনার হাত এড়াইতে হইলে সমালোচনা সত্ত্বেও কাজ করিয়া যাইতে হইবে। কে সমালোচনা করিল, তাহাও

জানিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কি সমালোচনা করিল, তাহা জানিতে দোষ নাই। বরং অনেক সময়ে সমালোচকেরা আমাদের কাজের দোষ-ত্রুটি ধরিয়া দিয়া আমাদের উপকারই করিয়া থাকেন। আমরা সাধারণতঃ নিজেদের কাজ-কর্ম্মকে অনুকূল দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকি কিন্তু প্রতিকূল দৃষ্টিতে আমাদের কাজকে কে কিরূপ দেখিতে পাইতেছে, তাহাও কম চিত্তাকর্ষক নাটক নহে। নাট্যকার বা উপন্যাস-রচয়িতা সংসারকে নিজের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, আমরা তাহা দেখিতে বা পাঠ করিতে কম কৌতুক অনুভব করি না। তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী না মিলিতে পারে কিন্তু যাঁহারা আমাদের কাজের নিন্দা বা সমালোচনা করেন, তাঁহারা আমাদিগকে কেমন দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তাহা ধীর দৃষ্টিতে সুস্থ মনে একবার দুইবার বিচার করিয়া দেখিতে ভয় কি? সমালোচিত হয় না মাত্র তাহাদের কাজ, যাহারা কিছুই করে না বা করিলেও, যাহাদের কাজের খবর কেহই জানিতে পারে না। কিন্তু যত গোপনেই কাজ কর না কেন, কেহ না কেহ, কোনও না কোনও সময়ে তাহার কিছু না কিছু জানিবেই জানিবে। সুতরাং স্বপক্ষে হউক আর বিপক্ষে হউক, সদিচ্ছায় হউক বা দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই হউক, সমালোচনা একদা কিছু হইবেই হইবে। সুতরাং সমালোচকের ভয়ে কাজ করিব না, ইহা হইতে পারে না। কাজ নিশ্চয়ই

করিব এবং দ্বিধাহীন চিত্তে করিয়াই যাইব। সকলের সকল সমালোচনাকে স্তব্ধ বা ব্যর্থ করিয়া দিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। পরিস্থিতির দাবী বুঝিয়া কাজের গতি-প্রকৃতি, বেগাবেগ প্রভৃতির রূপান্তর কাল হইতে কালান্তরে নিশ্চয়ই ঘটিতে পারে কিন্তু আমাদের কাজ নিয়া লোকের রসনা চঞ্চল বলিয়াই আমরা আমাদের করযুগকে শিথিল ও নিঃস্তব্ধ করিয়া দিব,—এমন কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না। আমাদের কল্পনা সুদূরপ্রসারিণী। আমরা দিগন্তের অনেক ওপারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া প্রতিটি পদক্ষেপ করিতেছি। অতীতের শিক্ষাকে আমরা নতশিরে গ্রহণ করিয়াছি, বর্ত্তমানকে আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু আমাদের সব কাজ যে একমাত্র ভবিষ্যৎকে লইয়া।"

অভিক্ষা

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত রাঙ্গুনিয়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কাজ আমি কিছুই করিতে পারি নাই। শুধু পঁয়তারাই করিতেছি। চাহিতেছি যে, ভিক্ষা সংগ্রহ ব্যতীত একটী লোক-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গড়িতে পারি কিনা। লোককল্যাণের জন্য যত প্রকারের সৎকার্য্য করা যাউক, তাহাদের মূলীভূত শ্রেষ্ঠ কাজ শিক্ষা-দান এবং মানুষের চরিত্র-গঠন। শিক্ষাদানের জন্য

বারংবার পুপুন্‌কীতে বিদ্যালয় খুলিতেছি আর নানা প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়িয়া তাহা তুলিয়া দিতেছি। ইহা এক চমৎকার অভিনয় চলিতেছে। যাহাদিগকে শিক্ষাদান করিব, আর যাহাদের পুত্রদিগকে গড়িয়া তুলিব, তাহাদের দিক হইতে পরিপূর্ণ সহযোগের আশ্বাস না পাইলে একটা বিদ্যালয় দীর্ঘকাল চালু রাখা যায় না। আমিও তাহা রাখিতে পারি নাই। জনশিক্ষা দানের জন্য গ্রামে গ্রামে সকালে আর রাত্রিতে প্রত্যহ অভিযান করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু ধারাবাহিক প্রযত্নে একাজ বৎসরের পর বৎসর চালাইতে পারি নাই বা পারিতেছি না। জনশিক্ষা প্রদানের জন্য বহু অর্থব্যয়ে এবং নিদারুণ কায়িক শ্রম স্বীকার করিয়া চিত্র-প্রদর্শনী নির্ম্মাণ করিয়া পুপুন্‌কীতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাহার নিঃশুল্ক প্রদর্শন চালাইয়াছি কিন্তু এই শিক্ষার দীপ্তি ক্ষণেকের জন্য মানুষের মনকে আলোকিত করিয়া আপনি নিবিয়া গিয়াছে, স্থায়ী হয় নাই। দেশের পর দেশ অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ভ্রমণ করিয়া যেখানে একটুকু সুযোগ পাইয়াছি বা পাইতেছি, সেইখানেই মানুষকে নিঃস্বার্থ সেবার প্রেরণায় চরিত্র-গঠন-মূলক হিতবাণী বিতরণ করিয়া যাইতেছি কিন্তু কণ্ঠ ত' আমার মাত্র একটী। একা একটী কণ্ঠ দেশ, সমাজ ও জগতের কতটুকু কাজ করিতে পারে? কাজ করিতে হইলেই সহকর্ম্মীর প্রয়োজন। কর্ম্মীর আবার অন্নের প্রয়োজন। অন্ন-সংগ্রহ করিতে নিশ্চয়ই অর্থের প্রয়োজন। আমি অযাচক,

অভিক্ষু, অপ্রার্থী, সন্ন্যাসী। আমার কর্ম্মীদের অন্ন আমি সংগ্রহ করিব কি করিয়া? সুতরাং স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে, আমি কাজ করিতে চাহিলেও কাজ কিছুই করিতে পারি নাই। হয়ত আরও কয়টী যুগ এভাবেই নিদারুণ কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়া আমার কাজ চলিবে এবং সুদীর্ঘ কাল পরে অথবা আমার আয়ুর বিচারে এক নিতান্ত অসময়ে চারিদিক হইতে স্বাভাবিক সহায়তা আসিয়া যাইবে কিন্তু তখন দেহ অপটু বা অনুপস্থিত বলিয়া আমি আর তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিব না। তথাপি আদর্শ-হিসাবে অভিক্ষাকে এক পৌরুষদীপ্ত ব্রত বলিয়া আমি জ্ঞান করিয়াছি। এই জন্যই যখনই যাহা ইচ্ছা করি, তখনই তাহা করিয়া উঠিতে পারি না। তোমরা আমার পুস্তক পড়িয়া শত শত জনে উন্মাদিত হইতেছ আর অধিক সংখ্যায় পুস্তকগুলি পাইবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছ। আমিও সম্ভব হইলে এই সকল ক্ষুদ্র পুস্তিকা লক্ষ লক্ষ খণ্ডে ছাপাইয়া দেশে দেশে অকাতরে বিনা-মূল্যে বিতরণের চেষ্টা নিশ্চয়ই করিতাম। কিন্তু কাগজ কিনিতেও টাকা লাগে, মুদ্রণ-কার্য্যেও অর্থের প্রয়োজন। অযাচক অভিক্ষু অর্থ কোথায় পাইবে? কাহার ট্যাকের গাঁট খুলিবার জন্য আমি অধ্যবসায়ী হইব? মানুষের কাছে টাকা চাইতে গেলে যে আমি ব্রতভ্রষ্ট হইব, এই কথাটী আমার সর্ব্বদা স্মরণে থাকে। অন্যেরা ভিক্ষার দ্বারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ রাখিবার চেষ্টা

করিতেন বলিয়াই দৃষ্টান্ত-হিসাবে তাহার যে অনুসরণ করিতে পারিতেছি না। তাঁহাদের ব্রত জনসেবা। আমার ব্রত যে অভিক্ষার দ্বারা জনসেবা।"

প্রচার, সংগঠন, অভিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য, স্বদেশ ও ধর্ম্ম

হাওড়া জেলান্তর্গত উদয়নারায়ণপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কলিকাতার উপর দিয়াই রংপুর আসিলাম অথচ তোমাদের ওখানকার আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলাম না, এজন্য আমি দুঃখিত। প্রথমতঃ পারিলাম না সময়ে কুলাইতে। দ্বিতীয়তঃ তোমাদের ওখানে আমাকে অল্প হইলেও জানেন, এমন ব্যক্তি একমাত্র তুমি ছাড়া কেহ নাই। তুমিও প্রয়োজনীয় কাজগুলি করিবার জন্য অবসরের সৃষ্টি করিতে পারিতেছ না। কোথাও যাইতে হইলে আমি যাই প্রভূত ক্লেশ স্বীকার করিয়া, যাই আমি এই সঙ্কল্প নিয়া যে, সেখানে গিয়া ঘুণাক্ষরেও কাহারও নিকটে আশ্রমের আর্থিক দৈন্যের বিষয় প্রকাশ করিব না এবং কাহারও কাছ হইতে পরোক্ষ ভাবেও আশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিব না। সর্ব্বত্র যাই শূন্যহস্তে, ফিরিয়াও আসি শূন্যহস্তে। এমতাবস্থায় একটা বিষয়ে পূর্ণতা না থাকিলে নিজেকে সান্ত্বনা দেই কি করিয়া, নিজের শ্রমকে

সার্থক মনে করি কি রূপে? আমি গেলে দুই-দশ জন ভদ্রলোক আসিয়া আমার সহিত আলাপ-সালাপ করিয়া চিত্তবিনোদন করিবেন, আমার ভ্রমণ-ক্লেশের সার্থকতা এইটুকুতেই সম্পাদিত হইয়া যায় না। মানুষেরা, বিশেষ করিয়া যুবকেরা, দলে দলে আসিয়া সভাস্থলে উপনীত হইবে, আমি তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের বীর্য্যময়ী বাণী বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে শুনাইয়া তাহাদের অন্তরে নবচেতনার সঞ্চার করিয়া দিয়া এই তৃপ্তিটুকু নিয়া স্থানটী ত্যাগ করিব যে, না, ইহারা জীবন গড়িবার শুভ সঙ্কল্প গ্রহণ করিল, ইহাদের মধ্যে কিছু না কিছু মানুষ দেশ, জাতি এবং জগতের হিতসম্পাদনে ব্রতী হইবে, ইহাদের দ্বারা দেশমাতৃকার দুঃখমোচনের সূত্রপাত হইবে,—এই কামনা কি আমার থাকিতে পারে না? যেই শ্রমটুকু করিয়া আমি দশটী বিশটী লোকের সেবা করিয়া যাইব, ঠিক সেই শ্রমটুকু করিয়াই কি আমি দুই শত, চারি শত বা দ্বিসহস্র লোকের সেবা করিতে পারি না, যদি তোমাদের স্থানটাতে আগে হইতে কিছু সাংগঠনিক শ্রম বা প্রচার করিয়া রাখ? আমি নিজ গিয়া হাজির হইব, তারপরে তোমরা প্রচারে নামিবে, সাংগঠনিক ব্যাপারে সুধী-জন-সম্মত রীতি ইহা নহে। আমাকে কাজের জন্য পাইতে হইলে আমাকে আহারীয় না দিলেও চলে, এমন কি স্বল্প বিশ্রামের উপযোগী একটুকু আশ্রয় না দিতে পারিলেও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু ভাষণ শুনাইবার জন্য

জনতা দিতে হইবে। মানুষের কুসংস্কারকে পুঁজী করিয়া আমি কাজ করিতেছি না। স্বকীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে অনুবর্ত্তীদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য আমি কাজ করিতেছি না। কোনও ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মপথের বিরুদ্ধে যুক্তি-পরম্পরা প্রদর্শন করিয়া আমি আমার আসল কাজের সময় নষ্ট করিতে চাহি না। আমার লক্ষ্য একটী মাত্র দিকে। দেশের মানুষ বলসঞ্চয় করিতেছে কিনা, এই বলকে দেশ, সমাজ ও জগতের কুশলে প্রয়োগ করিতেছে কিনা এবং সর্ব্ববলের আধার-স্বরূপ ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি পরিণিষ্ঠিত হইতেছে কিনা। সংসার-জোড়া যত অপরাধের তালিকা আছে, তন্মধ্যে চৌর্য্য, দস্যুতা ও ধর্ষণ, এইগুলিই ত' সংখ্যায় বেশী। যে ধর্ষণের মতন অপরাধে অপরাধী নহে, সে নিজেকে নিজে কদভ্যাসের অনুশীলন দ্বারা প্রতিনিয়ত হত্যা করিয়া চলিয়াছে। জাতীয় বল সঞ্চয়ের হিসাবের দিক হইতে ইহা কম ক্ষতিকর নহে। আমার যুদ্ধ ইহার সহিত, কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সহিত নহে। মানুষ ঈশ্বরের দিকে ধবিত হইলেই আমার আনন্দ, সে কোন্ সম্প্রদায়ের পতাকাতলে দাঁড়াইয়া ভগবানকে ডাকিতেছে, তাহা আমার বিবেচ্য নহে। প্রকৃতই যে ঈশ্বর-বিশ্বাসী, স্বভাবতঃই সে সর্ব্বজনপ্রেমিক, স্বভাবতঃই সে পরোপকারী ও উদার, স্বভাবতঃই সে নিষ্ঠুরতা-পরিত্যাগী এবং সদাচারী। সুতরাং যে-কোনও মত আশ্রয় করিয়া কেহ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্

হইলেই আমার আনন্দ। কিন্তু সভাস্থলে ঈশ্বর-প্রেমেরও আমি মুখ্য প্রচারক নহি, আমি প্রচারক ব্রহ্মচর্য্যের। বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়তা ও বার্দ্ধক্য নির্ব্বিশেষে জীবনের প্রতিটি বয়সে প্রতিটি পুরুষ ও নারী সময়োচিত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া নিজেকে রাখিবে পবিত্র আর পরিবেশকে করিয়া দিবে স্বচ্ছ, সুন্দর, অমলিন, আমার ত' মাত্র ইহাই কাম্য। সুতরাং আগে তোমাদের গ্রামে যাইব, গ্রামবাসী প্রাজ্ঞেরা আসিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে, কে আসিল, তারপরে তোমারা সভার আয়োজন করিবে এবং আমি বক্তৃতা দিয়া দেশোদ্ধার করিব, এত অধিক পরিমাণে সময় যে বাছা আমার হাতে নাই। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত-সমূহ প্রচার করিয়া ভারতবর্ষের কেহ বিশেষ কোনও স্থায়ী উপকার করিতে পারিবেন না, এই কথা বিগত হাজার বৎসরের ধর্ম্ম-প্রচারের ইতিহাসই স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করিয়া যাইতেছে। ধর্ম্মমতকে ব্যক্তিগত সাধনার বস্তু-রূপে জ্ঞান করিয়া স্বদেশকে সর্ব্বজনের সার্ব্বভৌমিক আরাধিতব্য না করিতে পারিলে ভারত তাহার দুর্দ্দৈন্যদশা হইতে কদাচ মুক্তি পাইবে না। ধর্ম্মান্দোলন যেখানে চারিত্রিক মেরুদণ্ডকে সুদৃঢ় করে, ধর্ম্মান্দোলন সেইখানেই মাত্র স্বদেশানুকূল। অধিকাংশ ধর্ম্মপ্রচারকেরা সদাচার, সন্নীতি, অচৌর্য্য, আত্ম-সংযম ও ত্যাগ-প্রবণতার পোষকতা করিয়া

থাকেন বলিয়াই ধর্ম্মীয় আন্দোলন অনেক সময়ে স্বাদেশিক কর্ত্তব্য-পরায়ণতাকে দৃঢ়তা দিয়াছে। এইখানেই ধর্ম্ম তাঁহার বিজয়-পতাকা প্রোথিত করিয়াছেন। এই উদার সত্যকে বুঝিতে না পারিয়া যাঁহারা কেবল সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে বর্দ্ধিতায়তন করিবার মধ্যেই ধর্ম্মের সার্থকতা খোঁজেন, আমি তাঁহাদের সহিত একমত নহি।"

সৎকর্ম্ম ও সৎপরিবেশ

হাওড়া জেলান্তর্গত উলুবেড়িয়া-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সৎকর্ম্মের স্বাভাবিক রীতিই এই যে, এক স্থানে একটী সৎকর্ম্ম উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে সিদ্ধিযুক্ত হইলে, দেখিতে না দেখিতে চরিদিকের আদর্শবান্ প্রাণগুলির মধ্যে যেন উৎসাহের দাবানল ছড়াইয়া পড়ে। ইহা সৎকর্ম্মেরই ধর্ম্ম, আর ইহা সৎপরিবেশেরই প্রকৃতি। সৎকর্ম্মের ফলপ্রসারণ যদি এই ভাবে না ঘটে, তবে বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মটীর মধ্যে সদ্‌বস্তুর সহিত হয়ত কিছু অসদ্‌বস্তুর ভেজাল মিশ্রিত ছিল। নতুবা বুঝিতে হইবে যে, পরিবেশের মধ্যে অসদ্‌বস্তুর প্রাধান্য থাকায় সৎকর্ম্ম, সদাদর্শ, সদ্‌দৃষ্টান্ত যোগ্য ভাবে ফলপ্রসূ হইতে পারিল না। দুইটী স্থলেই দোষটী আমাদের নিজের। ইহার দায়িত্ব অপরের স্কন্ধে ফেলিতে পারি না।"

আপনি আচরি

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত দক্ষিণ ভূর্ষি-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিজে সৎকার্য্য করিতে পার না কিন্তু সৎকর্ম্মের প্রতি অপরের রুচি, আগ্রহ ও চেষ্টা বর্দ্ধিত করিতে পার, ইহাও কম কথা নহে। তবে জানিও, সৎকর্ম্মে নিজের রুচি না থাকিলে অন্যের ভিতরে সেই রুচি সৃষ্টি করা বড় শক্ত। অন্ততঃ ছোট ছোট সৎকার্য্যও যাহারা করে, এমন কি লোকের অগোচরেও যদি করে, তবে তাহাদের মনের ভিতরে এমন একটী ওজস্বিতার জন্ম হয়, যাহার প্রভাবে তাহারা, অন্যের মনকে বৃহত্তর বা বৃহত্তম সৎকার্য্যেও রুচিসম্পন্ন করিতে পারে। দৃষ্টান্ত কেবল প্রত্যক্ষ ভাবেই মানুষকে উৎসাহিত করে, তাহা নহে, সৎকার্য্যের বাস্তব অনুষ্ঠান যে ব্যক্তি গোপনেও করে, অপ্রকাশ সত্ত্বেও তাহার শক্তি এবং প্রতিভা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। নিজে যাহা আচরণ করিবে, অন্যকে তাহাতে প্রবৃত্ত করাইতে অধিক বেগ পাইতে হইবে না। তোমার আচরণের মহিমা তোমাকে বাক্যে দিবে এমন এক প্রভু-শক্তি, যাহা কদাচ অন্যে অমান্য করিতে পারিবে না। ভিতর বাহির এক কর,—এই কথা গ্রামীণ বৃদ্ধদের চিরকালের উপদেশ। তাঁহারা ভুল বলেন নাই। তাঁহাদের বাক্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে

উজ্জ্বল। নিজে আচরণ করিয়া জগতের জীবকে সদাচরণের পথে টানিয়া আন।”

মৃত্যুকে পরাজিত কর

ফরিদপুর জেলান্তর্গত নারিকেলবাড়ী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার উপায় জগতের একটী প্রাণীরও নাই। সুতরাং এই অবধারিত সত্যকে সানন্দে স্বীকার করিয়া নিয়াও মৃত্যুকে জয় করিবার অন্য একটী বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহা হইতেছে, অতীতের পূর্ব্বপুরুষদের সাধনাকে নিজের জীবনে এমন ভাবে রূপবন্ত করা যেন ইহার ফলে তোমার বা আমার মৃত্যুর পরেও সেই সাধনার শুভফল তোমার পুত্রাদিক্রমে বা আমার শিষ্যাদিক্রমে জগতের মধ্যে ক্রমবিস্তারিত হইতে পারে। মৃত্যু তোমার দেহকেই মাত্র ধ্বংস করিতে পারিল, তোমার আরব্ধ সাধনার ক্রমবিকাশকে অবরুদ্ধ করিতে পারিল না,—এইখানেই মহাবিক্রান্ত মৃত্যুর আসল পরাজয়। যেখানে সে তোমার বা আমার আরব্ধ সাধনার ক্রমগতিকে তোমার বা আমার দেহাবসানের দ্বারাই থামাইয়া দিতে সমর্থ হইল, স্বীকার করিতে হইবে যে, সেখানেই মৃত্যুর রণতাণ্ডব জয়মাল্যে বিভূষিত হইয়াছে। মানুষের মত মানুষ মরিয়াও কখনো মরে না এই জন্য যে,

তাহার দেহান্ত ঘটিলেও তাহার সাধনা অন্তহীন আবেগে ক্রমশঃ ভাবী কালকে জয় করিতে করিতে দিগ্বিজয় করিয়া ছুটিতে পারে। মানব-সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস প্রকৃত প্রস্তাবে এভাবে মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়া আগাইয়া যাওয়ার ইতিহাস। এই জন্যই মানুষকে সকল দৃষ্টি সবল ভাবে নিক্ষেপ করিতে হইবে ভবিষ্যতের দিকে। মৃত্যুকে আমরা জয় করিব আমাদের বৈধ-প্রয়াসের দ্বারা। মৃত্যু আসিবে এবং যাইবে কিন্তু আমাদের ভাব-বিকাশকে কদাচ প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিবে না। তাহা অফুরন্ত কাল ব্যাপিয়া চলিতেই থাকিবে।"

প্রেম ও সেবা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত উজানচর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের সর্ব্বশক্তি তোমরা মানুষকে নির্ব্বিচারে ভালবাসিবার কাজে নিয়োজিত কর। খ্যাত-অখ্যাত, ছোট-বড়, দীন-ধনী, বিদ্বান্-মূর্খ নির্ব্বিশেষে প্রতিটি মানুষের প্রতি কিসে প্রেম ধাবিত হইতে পারে, তাহার উপায় অনুসন্ধান কর। সকলের পক্ষে একই উপায় অবলম্বনীয় না হইতে পারে কিন্তু তাহার যাবতীয় চেষ্টার ফল হওয়া চাই মানবপ্রীতি। মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিবে, বিদ্বেষ করিবে, হিংসা করিবে, ঈর্য্যা করিবে, মানুষ মানুষকে পায়ে দাবাইয়া ছোট করিয়া

রাখিবে, ইহা যে মনুষ্যত্বের অবমাননা, একথা বুঝিবার দিন আসিয়াছে। কাহাকেও আমরা কৌশল খাটাইয়া ছোট করিয়া রাখিলাম না, মাত্র এতটুকুতেই আমাদের উপরে মানবিকতার দাবী পূর্ণ হইয়া যায় না। যে যতটা পারি, ছোটকে বড় হইতে, দরিদ্রকে স্বচ্ছল হইতে, অজ্ঞানকে জ্ঞানবান্ হইতে, দুর্মেধাকে সুবোধ হইতে, দুশ্চরিত্রকে সচ্চরিত্র হইতে এবং অনাদৃতকে আদরের যোগ্য হইতে সহায়তা করিব,—ইহাও চাহি। মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম না থাকিলে কেহ অপরকে সেবা দিতে পারে না। সেবা কোনও অনুগ্রহের দান নহে। সেবা এক মহনীয়া বৃত্তি। ভালবাসা হইতেই ইহার জন্ম, ভালবাসাতেই ইহার সার্থকতা। ভালবাসিবার মত ভালবাসিতে পারিলে আমরা যে যতটুকু সেবা দানের যোগ্য, তার চেয়ে অনেক গুণ অধিক পরিমাণ সেবা জগদ্বাসীকে দিতে পরিব। কারণ, প্রেমই সেবার যোগ্যতা প্রদান করে। প্রেম যত গভীর ও অকৃত্রিম, সেবা তত সুন্দর ও সুদূরপ্রসারী।"

করুণার সুরধুনী

বীরভূম জেলান্তর্গত নারায়ণপুর-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার একটী মাত্র প্রার্থনা যে, তোমরা মানুষ হও। মানুষের আকৃতিতে অমানুষেরা দিকে দিকে দাপাদাপি করিতেছে, নিরীহ নিরপরাধ সরলস্বভাব মানুষগুলি তাহাদের

পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া কেবল আর্ত্তনাদ করিতেছে, এই দৃশ্য আর সহিতে পারিতেছি না। সব চাইতে মারাত্মক বা মর্ম্মঘাতী হইতেছে সেই দৃশ্য, যেখানে দেখিতে পাই যে, ধর্ম্মের ধূয়া ধরিয়া মানুষকে অমানুষের পর্য্যায়ে ফেলিয়া অত্যাচার করা হইতেছে। এই অত্যাচার সাম্প্রদায়িক, সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক বা অন্য যে-কোনও প্রকারের হইতে পারে। কোটি কোটি লোকের দ্বারা অধ্যুষিত এই দেশে নানা স্থানে নানা পকেটে নানা শ্রেণীর লোক থাকিতে পারে, যাহাদের হিংসাবুদ্ধিকে বিদমিত করিবার মতন সুব্যবস্থা আপাততঃ সম্ভব নহে কিন্তু মানুষ মানুষকে কষ্ট দিবে, এই কথা ভাবিতে যাহাতে প্রতিটি প্রাণীর প্রাণে করুণার সুরধুনী ডুকরিয়া কাঁদিয়া ওঠে, তেমন সহানুভূতি সংক্রমণের জন্য আমরা দিকে দিকে আন্দোলন ত' করিয়া যাইতে পারি। কাজ, আমরা স্থানে স্থানেই শুরু করিলাম, ছোট ভাবেই আরম্ভ করিলাম, সংবাদপত্রের প্রচার-সুযোগের দিকে লোলুপ নেত্রে না তাকাইয়াই কাজ ধরিয়া দিলাম, বড় বড় নামী লোকদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য প্রতীক্ষায় বসিয়া নাই থাকিলাম। ইহা কি অসম্ভব জ্ঞান কর?''

নীরব কর্ম্ম

রাজশাহী জেলান্তর্গত নাটোর-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সৎকাজে হাত দিতে হইলে বারংবার বিফল হইয়াও কাজ করিয়াই যাইতে হইবে। আর, সে কাজ শুরু করিবার জন্য পাঁজি দেখিবারও প্রয়োজন সর্ব্বক্ষেত্রে নাই। আমাদিগকে সৎ হইবার জন্যই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, জগৎকে ধন্য করিবার জন্য নহে। জগতে দিকে দিকে কত কত মহৎ ব্যক্তি নিজ নিজ নাম-পরিচয় এবং কর্ম্ম-পদ্ধতি গোপন রাখিয়া কত সৎকার্য্য করিয়া যাইতেছেন। আমরা তাহার কতটুকু খবর রাখি? ঐ সকল নিভৃতচারী নীরব কর্ম্মীরাই আমাদের সম্মুখে আদর্শ-স্থল হউন। যশঃ-সম্বর্দ্ধিত লোকপ্রসিদ্ধ জনসেবকদের উদাত্ত আহবান যদি আমাদ্গিকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে ব্যর্থও হইয়া থাকে, নীরব কর্ম্মীদের নিভৃত আবেদন যেন আমাদের কর্ণকে বধির বলিয়া ঘোষণা না করিতে পারে। নীরব কর্ম্মীরাই জগতের আসল কর্ম্মী। তাঁহারাই আমাদের আদর্শস্থল হউন। তাঁহাদের চরিত্রকেই আমরা অনুসরণ করিব। তাঁহাদের মতই মানযশোলোভহীন হইয়া আমরা যে যতটুকু কাজ করিতে পারি, করিব। আমাদের শতাব্দীব্যাপী নীরব কর্ম্ম তিন শতক পরের এক মহাসমা-রোহের আয়োজন-পর্ব্ব সুসম্পন্ন করিতে যেন সমর্থ হয়। সদ্যঃ সদ্যঃ ফল টম্যাটো বা বেগুন গাছে ধরে, তাল গাছের ফল পাইতে হইলে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতে হয়। মনে রাখিও, তালের কাষ্ঠ শালের চেয়েও অনেক শক্ত।"

ধর্ম্ম, ভয় ও বিদ্বেষ

দিনাজপুর জেলান্তর্গত বীরগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কেহ কেহ ভয় দেখাইয়া ধর্ম্ম বিস্তার করিতে চাহেন। আমার ধর্ম্মে ভয়ের কোনও স্থান নাই, সবটাই প্রেম। প্রেমের আকর্ষণে ধর্ম্ম-প্রচারই প্রকৃত প্রচার। অবশ্য, এই প্রেম জৈব প্রেম নহে, এই প্রেমের মধ্যে রক্তমাংসের ক্ষুধাতৃষ্ণার কোনও স্থান নাই। এই প্রেম অনাবিল এবং সর্ব্বভূতগামী। এই প্রেম ছোট-বড়-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটী জীবের জন্য, বিশেষ করিয়া প্রত্যেকটী মানুষের জন্য। ধর্ম্ম প্রচার করিয়া মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বৃদ্ধির প্রয়াস জগদ্বাসীর অশেষ ক্ষতির কারণ হইবে। ধর্ম্মকে তোমার সহিত তোমার পরমারাধ্যের নিঃশঙ্ক মিলনের হেতুরূপে যদি পাও, তাহা হইলে ইহা জগতে কোনও মালিন্যের বা সমস্যার সৃষ্টি করিবে না। অপরকে ঘৃণা করিবার উপায়-স্বরূপে যদি ধর্ম্মকে প্রচার কর, তবে জগতে মহা-অনর্থের সৃষ্টি হইবে। ধর্ম্ম কাহারও ভয়কে বর্দ্ধিত করে না, করে অভয় বিতরণ। প্রকৃত ধর্ম্ম কদাচ বিদ্বেষের প্রশ্রয় দেয় না, প্রসারিত করে প্রেম ও মমত্ববোধকে।"

নবীন ও প্রবীণ

খুলনা জেলান্তর্গত রাংদিয়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পুরাতন কর্ম্মীদের ইহাই এক সর্ব্বনাশা দুর্ব্বলতা যে, নূতন কেহ আসিয়া আগ্রহ-সহকারে কাজে নামিলে তাহাদ্দিগকে উৎসাহ না দিয়া 'হঠাৎ-দরদী' বা 'হুজুগের মরমী' বলিয়া টিট্‌কারী দেয়। পুরাতনেরা যদি মনে করে যে, তাহারা বিশ বৎসর পূর্ব্বে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছিল বলিয়া নূতনেরা কাজ করিবার অযোগ্য, তবে এর চেয়ে মারাত্মক ভুল আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু নূতন কর্ম্মীদেরও যথেষ্ট সতর্ক হইবার প্রয়োজন আছে। পুরাতনেরা যদি কিছু প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহাদের সেবার জন্যই সম্ভব হইয়াছে। নূতনেরা একটু বেশী ছট্‌ফটে বলিয়াই পুরাতনদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া চলিবার অধিকারী নহে। পুরাতনদের যেমন অভিমান ক্ষতিকর, নূতনদের তেমন অহঙ্কার ক্ষতিকর। অভিমান পুরাতনদের একটা মজ্জাগত দুর্ব্বলতা, অহঙ্কার নবীনগণের এক স্বাভাবিক পথ-কণ্টক। এই দুর্ব্বলতা এবং এই পথ-কণ্টক উভয়েরই অন্তর হইতে দূর করিতে হইবে। নবীনে প্রবীণে, নূতনে পুরাতনে, আধুনিক ও প্রাচীনে মিলন-সেতু নির্ম্মাণ না করিতে পারিলে কোনও মহৎ সঙ্কল্পের ধারাকে তোমরা দুই তিন চারি শতাব্দী-ব্যাপী করিতে পারিবে না। নবীনেরা যদি প্রবীণদিগকে কেবল নিজেদের যৌবনের দাপটে মঞ্চ হইতে অপসারিত করিয়া দেয়, আর প্রবীণেরা যদি নবীনদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে প্রাণপণে বাধা

দেয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দেশের স্কন্ধে ভূত চাপিয়াছে, এখন দৈত্যদানবের পিশাচ-নৃত্য শুরু হইবে।”

পারিবারিক অশান্তি

যশোহর জেলান্তর্গত নাওপাড়া-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“পারিবারিক জীবনে শান্তি না থাকিলে আধ্যাত্মিক জীবনে শান্তি সুদূরপরাহত। শান্তি ও শৃঙ্খলার অনুশীলন পারিবারিক জীবনে যেমন, সংঘজীবনেও তেমন, জাতীয় জীবনেও তেমন সর্ব্বতোভদ্র সুফল সৃষ্টি করে। প্রতিজন যখন প্রতিজনের প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে শান্তি লাভের সহায়তা করে, ধরণী তখন স্বর্গ হয়। চিত্তপ্রশান্তিকে পুণ্যের নামান্তর বলিতে পার। সৎকর্ম্মের দ্বারা আত্মপ্রসাদ জন্মে। আত্মপ্রসাদ আসিলে নানা দুঃখদ দুর্য্যোগেও চিত্ত প্রশান্ত থাকে। মানুষ যখন অন্নাভাবে শীর্ণ, তখন সে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভের পথে দারুণ বাধা পায়। কিন্তু সে যখন পারিবারিক কোন্দলে, অশান্তিতে, অবিশ্বাসে, হিংসায় ও নির্য্যাতনে উৎপীড়িত, তখন তাহার পক্ষে অগ্রগতি একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণেই অনেক অধ্যাত্ম-জীবন-প্রয়াসী সাধক সংসারের প্রতি আকর্ষণকে সমূলে উৎপাটন করিয়া পরিব্রজ্যার পথে পাদচারণা করেন। স্থলবিশেষে ইহা সমর্থনযোগ্য, স্থলবিশেষে ইহা অসমর্থনীয়

কিন্তু সহস্র দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও যে চিত্ত-প্রশান্তি হারায় না, সে বীর এবং পারিবারিক অশান্তি, ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ, হিংসা-নিন্দার মধ্যেও যে স্থির চিত্তে নিজের কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে পারে, হাসিমুখে বিষধর সর্পের দংশন-জ্বালাকে তুচ্ছ করিয়া দিতে পারে, সে মহাবীর। খাইতে পাও না অন্ন, পরিতে পাও না বস্ত্র, এমন দুর্দ্দিনও দুর্দ্দিন নহে, পরন্তু এমন দিন যদি কখনো আসে, যখন তোমার প্রিয়-বান্ধব বা প্রিয়বান্ধবীই তোমার অগ্রগমনের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়া দিয়া সেই প্রাচীরের উচ্চ চূড়া হইতে তোমাকে শেলাঘাত করিবে এবং তোমার কাতর অর্ত্তনাদ-শ্রবণে প্রকাশ করিবে আনন্দ-উল্লাস, তবে তাহার মতন দুর্দ্দিন তোমার আর কিছু হইতে পারে না। পারিবারিক অশান্তি লক্ষ লক্ষ নন্দন-কাননে আগুন ধরাইয়া তাহা ছারখার করিয়া দিয়াছে।”

আমাদের কর্ম্ম ও ধর্ম্মের উৎস

নোয়াখালী জেলান্তর্গত আমিরাবাদ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“আমাদের জীবন-কাঠি প্রীতিতে নিহিত। আমাদের কর্ম্মের উৎস ও ধর্ম্মের প্রেরণা প্রেমে। অবান্তর বহির্ম্মুখ প্রয়োজনের দাবী হইতে আমাদের কর্ম্মোৎসাহ বা ধর্ম্মবোধের উদ্দীপনা আসে নাই। আমাদের অভ্যুদয় ঘটিবে প্রীতির মহিমায়। প্রেম-

প্রীতি ভালবাসার অনুশীলনমুখিনী আমাদের কর্ম্মের ধারা বিশ্বজগৎকে প্রেমে স্রক্ষিত করিয়া দিবে। ধরণী এই ভাবেই স্বর্গ হইবে।"

সহযোগীর চরিত্র-সংশোধন

মুর্শিদারাদ জেলান্তর্গত আনন্দ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সহযোগী অথবা সহকর্ম্মীদের চরিত্র-সংশোধনের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে নিন্দাপূর্ণ অপবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া বেড়ানো কোনও সৎপন্থা নহে। ইহা ফলোপধায়কও নহে। যাহার নিন্দা তুমি ছড়াইলে, সে কিন্তু ইহাতে সংশোধিত না হইয়া অপরাধী হইলে বেপরোয়াও হইয়া উঠিতে পারে। নিরপরাধ হইলে ত' তোমার পরিচয় জানিবা মাত্র গর্জ্জিয়া উঠিয়া প্রতিশোধ নিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবে। এসব ক্ষেত্রে সৎপন্থা হইতেছে, সহযোগী বা সহকর্ম্মীর একান্ত বিশ্বাসভাজন বান্ধবের যোগ্য ভ্রাতৃত্বের বোধ ও পরশটুকু নিয়া তাহার নিকটে অকপট হওয়া। রূঢ়ভাবে নহে, প্রেম-ভরে তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, তাহার মতন চরিত্রবান্ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানুষে অপবাদ রটনা করিলে তোমরা এবং তোমাদের মতন অন্যান্য অকৃত্রিম বান্ধবেরা বেদনা পাও। অপবাদ রটিলেই তাহা সত্য হয় না। বরং অপবাদ সাধারণতঃ

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একেবারে ভিত্তিহীন আক্রোশের ফসল মাত্র এবং কোনও কোনও স্থলে যৎসামান্য সত্যভিত্তিক মিথ্যার এক বিপুল পাহাড়।”

নবীনে ও প্রবীণে

ফরিদপুর জেলান্তর্গত সদর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

প্রবীণেরা দেশ, সমাজ ও সংঘের জন্য অতীতে অনেক কিছু করিয়াছেন, নবীনেরা বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে কিছু কিছু করিবেন,—এই দুইটী সত্যকেই সমান মূল্যবান্ জ্ঞান করিও। অতীতে যাহারা অনেক কিছু করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ তোমাদের প্রত্যাশা-পূরণে সমর্থ হইতেছেন না দেখিয়া তাঁহাদের উপরে রুষ্ট হইও না। তাঁহাদের অতীত সেবাকে সম্ভ্রমের সহিত স্বীকার কর। নূতনেরা আসিয়া এমন কতকগুলি কাজে হাত দিয়া ফেলিয়াছে, যেগুলি করার অধিকার একমাত্র প্রবীণদেরই আছে বলিয়া প্রবীণেরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিলেও, একাগ্র, একনিষ্ঠ, নিষ্ঠাবান্ ও প্রত্যুৎপন্নমতি সাহসী নবীনেরা আসিয়া সে কাজে হাত দিয়া ফেলিলে তাহাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরাইয়া দিবার অধিকার কাহারও নাই। প্রবীণেরা যখন নিজেদের দীর্ঘকালের অধিকৃত সিংহাসনটী ছাড়িয়া সরিয়া যান, তখন তাঁহাদের মনে ক্লেশ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা যেন ঈর্ষ্যা বা অমঙ্গল কামনার সৃষ্টি

না করে। কারণ, প্রবীণেরা কেহই অনন্ত-কালজীবী নহেন। একদা তাঁহাদের দেহান্ত ঘটিবেই ঘটিবে। তখন ত' সিংহাসনটি বা সিংহাসনগুলি নবাগতেরা অধিকার করিবেই করিবে। সিংহাসন কদাচ শূন্য পড়িয়া রহিবে না। নবীনে ও প্রবীণে কলহের সম্ভাবনা দেখিলে প্রবাদের নারদ ঋষির মতন কল্পিত ব্যক্তি খুশী হইলে হইতে পারেন, যুক্তিমান্ কোনও মানুষ খুশী হইবেন না। নবীনে ও প্রবীণে পারস্পরিক ভাব ও কর্ম্মের আদান প্রদান যাহাই হউক, তোমাদের প্রতিজনের কর্ত্তব্য হইতেছে, উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী কলহের সম্ভাবনা-সৃষ্টিকর অসৎ উপাদানগুলি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া দূর করিয়া দেওয়া। যে দেশে জনমত জাগ্রত, সেখানে সংবাদপত্রগুলি ইচ্ছা করিলে এই কাজটী প্রশংসনীয় ভাবে করিতে সমর্থ হন।"

কলহের ছোঁয়াচ হইতে বাঁচ

ফরিদপুর জেলান্তর্গত ভোজেরগতি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কোথাও পরস্পরের মধ্যে বেশ একটু সঙ্ঘবদ্ধতার ভাব জমিয়া আসিলেই, প্রায় সর্ব্বত্র লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, হঠাৎ একটা বিরোধী শক্তি মাথা জাগাইয়া ওঠে এবং একটা মতদ্বৈধের দ্বৈরথ যুদ্ধ শুরু করিয়া দিয়া নিরীহ ব্যক্তিদের

শান্তিভঙ্গ ও কলহপ্রিয় ব্যক্তিদের আনন্দ-বর্দ্ধন করে। এই অপ-সম্ভাবনা হইতে বাঁচাইয়া তোমাদের জীবন-তরণীকে চালাইতে হইবে। কর্ত্তৃত্ব, নেতৃত্ব, যশ এবং প্রতিষ্ঠার লোভ হইতে এইগুলির সৃষ্টি হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যাপারে অন্যায় লাভের সুযোগ-সন্ধানীরাই প্রধানতঃ এই সব কলহের বীজ বপন করে। ঝগড়া-ঝাটির ব্যাপারে দুই দলে বিভক্ত হইয়া মানুষ একে অপরকে হেয় বা খাটো করিবার জন্য যতটা পরাক্রম বা পুরুষকার প্রয়োগ করে, একটী মাত্র দলে মিলিত হইয়া সকলের সর্ব্বশক্তি দিয়া একটী মহৎ-কার্য্য উদ্ধারের জন্য সচরাচর তদ্রূপ অধ্যবসায়ী বা আগ্রহী হয় না। ঝগড়ার ভিতরে রজোগুণের ক্রিয়াই অত্যধিক, সুতরাং উহাতে মানুষের রাজসিক পৌরুষ অতি সহজেই উদ্দীপ্ত হইয়া ওঠে। স্নিগ্ধ বাতাবরণে মৃদুমন্দ গতিতে সুধীর প্রযত্নে একটী সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রতিদানবুদ্ধিহীন কাজ করিয়া যাওয়ার মধ্যে সত্ত্বগুণেরই লীলাপ্রকাশ। সুতরাং উহাতে মানুষের ততটা আগ্রহ, উদ্যম বা পৌরুষের প্রকটন লক্ষ্য করা যায় না। মুস্কিল হইয়াছে ঠিক্ এইখানেই। ঝগড়া কলহে যাহারা ইন্ধন দেয় বা উত্তেজনা যোগায়, মদত দেয় বা সহায়তা করে, তাহারা ত' নিজেদের মুখগুলিকে আগুনের আলোকে উজ্জ্বল দেখাইবার প্রলোভনেই তাহা করে। সূর্য্য বা চন্দ্রের কিরণের চেয়ে কলহের খাণ্ডবানল ইহাদের অধিকতর প্রিয়। যেখানে যে যেটুকু কাজ করিতে পার,

কলহের ছোঁয়াচ হইতে বাঁচিয়া চলিবার চেষ্টা করিও। কলহের পাপ স্পর্শ করিলে সত্যবাদিতা হ্রাস পায়, সরলতা নাশ পায়, মিথ্যা-কথনে, মিথ্যা-রটনে, মিথ্যার প্রশ্রয়-দানে অত্যধিক আগ্রহ জন্মিয়া যায় এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিরোধী নানা অপকথার সৃজনে অশেষ পটুতার সৃষ্টি ঘটে,—যে প্রতিভাটুকু সর্ব্বজন-সুখকর অধ্যবসায়ে প্রযুক্ত হইতে পারিত, তাহা সর্ব্বনাশকর কুকর্ম্ম-কাণ্ডে নিয়োজিত হইয়া স্বর্গকে নরকে আর ভূলোককে পূতিগন্ধময় শ্মশানে পরিণত করে।”

চরিত্র-বলই শ্রেষ্ঠ বল

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত বালিজুড়ি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“অতীত ভুলিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হও। অতীতে অন্যেরা কে কি কুকাজ করিয়াছে, তাহার হিসাব রাখিতে গেলে ত’ তোমার আত্মাবনতি হইবে। নিজে যে কুকাজ করিয়াছ, তাহা সম্পর্কেও ঐ একই কথা। অতীতের কুকাজের কথা প্রীতি সহকারে স্মরণ করিলে অধঃপতন অনিবার্য্য। অতীতে এমন অনেক কুকাজ করিয়াছ বা কুকাজ করিবার এমন অনেক সুযোগ পাইয়াছ, যাহা তখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে করিয়াছ বা চেষ্টা-চরিত্র করিয়া সুযোগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। আজ যদি মনে মনে ভাবিতে থাক যে, তখন উহা প্রত্যাখ্যান না করিলে কি আর ক্ষতি হইত অথবা তখন কুকাজটুকু আরও একটু রসাল ও মধুর করিয়া আরও একটু গভীর

এবং স্থায়ী ভাবে করিয়া নিলে কি ক্ষতি হইত,—তাহা হইলেও তুমি অধঃপতিত হইবে। অতীতে যে কুকাজ করিয়াছ, তাহার জন্য এখন যদি অপবাদ আসিয়া পড়ে, তবে জানিবে, পাপক্ষালন হইল। সাবধান হইয়া যাও, যেন এক ভুল জীবনে দুইবার না করিতে হয়। ভুল মানুষ মাত্রেরই জীবনে থাকিতে পারে। প্রকাশ পায় না বলিয়া কেহ কেহ সাধু থাকিয়া যায় কিন্তু জীবনের একটী মাত্র ভুলের জন্য কেহ পচিয়া যায় না। অতীত ভুলিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হও। কেহ ভ্রমবশতঃ তোমার নামে মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া থাকিলে তাহার প্রতি আক্রুষ্ট হইও না। একদা সত্য নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইবে। অপরের প্রতি রোষ তোমার চরিত্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। তোমার চরিত্রই তোমার কাছে সব চেয়ে বেশী মূল্যবান্ বস্তু। সেই কথাটী মনে রাখিয়া চল। চরিত্র-সাধকের চরিত্র-সিদ্ধির মূল কথা পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্বে বিশ্বাস। তিনি তোমার মধ্যেও আছেন, তোমার আশে-পাশে সর্ব্বত্র ত' বটেই, এই বিশ্বাস চরিত্রকে তেজ দেয়, বল দেয়, আয়ু দেয়। তিনি সর্ব্বদর্শী, অন্তর্য্যামী, এই উপলব্ধি আসিলে, চরিত্রহারক কুচিন্তা মনের চতুঃসীমার মধ্যেও আসিতে পারে না। চরিত্রবলই জগতের শ্রেষ্ঠ বল।"

সংগঠন

ফরিদপুর জেলান্তর্গত ডোমসার-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে বাবামণি লিখিলেন,—

"জনপদের প্রত্যেকটী প্রাণীর অন্তরে সাত্ত্বিকী প্রেরণা সৃষ্টির সংঘবদ্ধ, ধারাবাহিক, সুপরিকল্পিত ও অবিরাম চেষ্টা চালাইয়া যাইবার নাম সংগঠন। একটীও নরনারী থাকিবে না যে তোমাদের পবিত্র উদ্দেশ্য এবং অকপট অভীপ্সার সহিত নিজেদের প্রাণের যোগ স্থাপন না করিয়া থাকিতে পারিবে, এমন প্রয়াসের নাম সংগঠন। কোনও বাধা, কোনও বিঘ্ন, কোনও উপদ্রব, কোনও অত্যাচার, কোনও অপপ্রচার, কোনও কূটকৌশল, কোনও শঠতা, কোনও ষড়যন্ত্র সমর্থ হইবে না তোমাদের বিরাট এবং অন্তর্ভেদী অভিযানকে আটক করিতে, রুখিয়া রাখিতে, স্তব্ধ, নিশ্চল বা দুর্ব্বল করিতে, এমন অধ্যবসায়ের নাম সংগঠন। একটী প্রাণীকেও ক্ষুদ্র বলিয়া তুচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা বা অবহেলা করিবে না। বিশ্বালিঙ্গন-কারী ব্যাপক প্রেম-প্লাবনে প্রত্যেকে আসিয়া তোমাদের বক্ষোলগ্ন হইবেই হইবে, ইহাই হওয়া ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর থাকিবে না, এমন ভাবে কাজ করিয়া যাইবার নাম সংগঠন। এই সংগঠন তোমার নিজের কোনও স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে, ইহা জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য। সংগঠন করিতে হইলেই যে দূরদূরান্তেই যাইতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। তোমার ঘরের কোণে কত অনাদৃত ও অনাবিষ্কৃত মানুষ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার কি তুমি খোঁজ রাখ? যেদিন তোমার চক্ষুর অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িবে এবং

তাহাদিগকে তাহাদের স্বরূপে দেখিতে পাইবে, তখন ভাবিয়া অবাক্ হইবে যে, ষ্ট্যান্‌লি ও লিভিংষ্টোনের আফ্রিকার জঙ্গল আবিষ্কার করার কাজের তুলনায়ও ইহা তুচ্ছ ব্যাপার নহে। অনাবিষ্কৃত কত মহাদেশ আর অনবগাহিত কত সমুদ্র তোমার চক্ষু কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জনের জন্য যুগ যুগ ধরিয়া নীরব প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, তাহাদের মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে সরব ও মুখর করিয়া তোলাই হইতেছে আসল সংগঠন।"

সমবেত উপাসনা ও অখণ্ডমণ্ডলী

খিলপাড়া হইতে সেখানকার উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দত্ত আসিয়াছেন একটী প্রস্তাব নিয়া যে, একবার খিলপাড়াতে যাইতে হইবে এবং দুই একটী ভাষণ দিতে হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রস্তাব সাধু কিন্তু এবার ত' প্রগ্রাম সন্দ্বীপের দিকে আর বরিশালে। শরীরটা একেবারেই তালে নেই, তাই সমস্তটা প্রগ্রাম রক্ষা করা যাবে কিনা, এই বিষয়টী অনিশ্চিত। আমার বক্তৃতা শোনার চেয়ে অনেক বড় কাজ সকলে মিলে সমবেত উপাসনা করা। সমমন্ত্রে দীক্ষিত লোক সর্ব্বত্র জুটানো সম্ভব নয়, কিন্তু ঈশ্বর-বিশ্বাসী সমমনা

ব্যক্তিদের ডেকে এনে সমবেত উপাসনার আসরে বসাতে পার। সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রীষ্টান হোক আর অন্য কোনও ধর্ম্মাবলম্বীই হোক, তোমার দিক থেকে আপত্তির কিছু কথা নেই। তবে সবাইকে এই বিশ্বাসটী নিয়ে আসতে হবে যে, ঈশ্বর আছেন, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি আমাদের সকলের পক্ষে সমান আর আমরা প্রত্যেকে তাঁর চোখে সমান, তাঁর সঙ্গে আমাদের সকলের একটী মাত্র সম্পর্ক এবং তাঁর স্মরণে, মননে, গুণগানে আমাদের চিত্তশুদ্ধি হয়। শুদ্ধ শরীরে, শুদ্ধ মনে, সৎ উদ্দেশ্যে যে-কেউ যোগ দিবে, সে-ই এই সমবেত উপাসনায় যোগদানের অধিকারী। যেখানে এই সমবেত উপাসনা সপ্তাহে নিয়মিত একটী দিন ক'রে করার ব্যবস্থা আছে, তারই নাম অখণ্ডমণ্ডলী। যেখানে মণ্ডলী আছে কিন্তু সমবেত উপাসনা নেই, জান্‌বে, সেখানে মণ্ডলী একটা ভাণ বা ভড়ং মাত্র, তার আসল অস্তিত্ব শূন্যময়, মিথ্যা।

সমবেত উপাসনার আসরে সবাই সমান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংসারী আর অসংসারী প্রায় সকল মানুষই অল্পাধিক কলহরত অবস্থায় জীবনের অধিকাংশ বৎসর কাটিয়ে দিচ্ছে। এই কলহ তাদের অপমৃত্যু বা

অকালমৃত্যুর তুল্য মারাত্মক ব্যাপার। এই নিদারুণ শক্তিশেল থেকে বাঁচবার বিশল্যকরণী হচ্ছে আমাদের সমবেত উপাসনা। মুচি, মেথর, হাড়ি, ডোম, কামার, কুমার, জলচল ও অনাচরণীয় সকল জাতের সকল লোককে নিয়ে আমরা সমবেত উপাসনাতে বস্‌তে পারি, যদি তারা আসে উপাসকোচিত আগ্রহ ও বিনম্রতা নিয়ে। এখানে কেউ কারো বড় নয়, কেউ কারো ছোট নয়। কেউ কারো আগে নয়, কেউ কারো পিছে নয়। কেউ কারো উপরে নয়, কেউ কারো নীচে নয়। এখানে সবাই মনে, প্রাণে, ভাবে, ব্যবহারে, আচারে, অনুষ্ঠানে সমান। নিজেদের উচ্চতা-বোধের অহং থেকে যে সকল ঔদ্ধত্যের জন্ম, এখানে তা' থাক্‌বে কেন? নিজেদের হেয়তা-বোধ যখন ভিতরে ভিতরে জাতিবৈরের সৃষ্টি করে, তখন অপরকে হেয় ক'রে চলার যে দুষ্প্রবৃত্তি নিম্নমানের লোকদের মধ্যে অনেক সময়ে দেখা যায়, এখানে তাও থাক্‌বে না। সমবেত উপাসনায় এসে আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যেতে বাধ্য যে, কার কৌলিক সম্মান কত, কার ধনকৌলীন্য কত, কার বিদ্যার গৌরব কত, কার দারিদ্র্যের শোচনীয়তা কত তীব্র, কার অশিক্ষার অপঘাত কত গভীর। এখানে আমরা সবাই সমান এবং যে শ্রেষ্ঠ, সে নিকৃষ্টের নিকৃষ্টতার অনুপূরক, পরিপূরক সহায়ক এবং শক্তিধর সহযোগী মাত্র। প্রাণে প্রাণে প্রেমের বন্ধন এখানে সৃষ্ট হবে ব'লেই ত' এখানে আসা।

শান্তির নীড়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষে মানুষে মতের অমিল, মনের অপ্রীতি, ব্যবহারের বৈষম্য, সুযোগ-সুবিধার তারতম্য দূর ক'রে দিয়ে সকলকে একমত, একমনা, সমগুণসম্পন্ন, সমযোগ্যতাধার ক'রে তোলা যায় কিনা এবং যায় কিরূপে, তা' নিয়ে তপস্বীরা তপস্যা, মনীষীরা মনন-কার্য্য, কর্ম্মীরা কর্ম্মযোগ সাধনা ক'রে যাচ্ছেন, চিরকাল ক'রে যাবেন। সেই সুদূর লক্ষ্যে মানব-সভ্যতা কবে গিয়ে পৌঁছুবে বা কত দিনে পৌঁছুবে, তার হিসাব করা এখন সদ্যঃ সদ্যঃ খুবই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু যেখানে ঝগড়া-কলহ নাই, যেখানে সাময়িক হ'লেও একটী গভীর শান্তির নিবিড় আশ্রয় মিলে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী, তার প্রয়োজন আছে। সেই পুণ্যময় স্থানটী বা শান্তিময় নীড়টী হচ্ছে তোমার সমবেত উপাসনার আসর। এখানে কদাচ কোনো ঝগড়া-কলহকে প্রবেশ কত্তে দিও না। বেদেরা সারা জীবন সপরিবারে নৌকায় বাস করে। তাদের জন্ম হয় নৌকায়, তারা বড় হয় নৌকায়, তাদের মৃত্যুও ঘটে নৌকায়। কিন্তু তাদের মধ্যে একটী অত্যাশ্চর্য্য নিয়মের শৃঙ্খলা আছে। সেটি এই যে, নৌকার সম্মুখের অর্দ্ধাংশে তারা জীবনেও কখনো কোনো কলহ করে না। হাজার উত্তেজনার কারণ ঘট্‌লেও তারা রুদ্র-মূর্ত্তি নিয়ে নৌকার সেই অংশটুকুতে প্রবেশ কর্ব্বে না। সেইখানটুকুতে কেউ কাউকে

কটুকাটব্য ক'রে না, গাল দেয় না, প্রহার করে না, কেউ কারো সঙ্গে হাতাহাতি ধস্তাধস্তি করে না। এই এক আশ্চর্য্য শৃঙ্খলাটী নদীর বেদুইন বেদেদিগকে তাদের অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে এক সুগভীর শান্তির শীতল মলয় প্রবাহিত ক'রে দিচ্ছে। তোমাদের সমবেত উপাসনার স্থানটী ঠিক এইরূপ হোক্। এমন একটা স্থান তোমাদের নিশ্চয়ই প্রয়োজন, যে স্থানে তোমরা কেউ কারো শত্রু নও, যে স্থানে তোমরা অতীতের অপমান, অসম্মান, ক্ষতি ও বিকৃতি সব বিস্মৃত হ'য়ে বিশ্বজনের সঙ্গে একত্র হয়ে পরমেশ্বরকে আত্মসমর্পণের অর্ঘ্যরাশি দান কত্তে পার। আমার সমবেত উপাসনার পরিকল্পনা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী সকলকে নিয়ে আনন্দময় মিলনের পরিকল্পনা। সম্প্রদায়-বৃদ্ধির প্ররোচনা এতে নেই, সম্প্রদায় বুদ্ধির প্রশ্রয় এতে নেই, সকল সম্প্রদায়ের সকল মানুষকে প্রকৃত মানুষ-রূপে, জগন্মঙ্গলকারী রূপে, যথার্থ ব্রাহ্মণরূপে নিজের বুকের কাছে পেয়ে যাবার আকূতিই এর প্রাণ।

অবতারত্ব চাহি না, চাহি সর্ব্বজনের মিলন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সর্ব্বসম্প্রদায়ের জন্য মিলন-ভূমি রচনার আকূতিই আমার সকল আকাঙ্ক্ষার প্রাণবিন্দু। এই জন্যই আমি নিজেকে অবতার, পূজ্য-বিগ্রহ বা আরাধ্য দেবতা ব'লে পরিচিত, প্রতিষ্ঠিত ও প্রপূজিত দেখতে এক

কণাও আগ্রহ রাখি না। আমার পূজা-প্রবর্ত্তনে আমার নিজের কোনও লাভ নেই। বিশ্বের সকলকে আমার বুকের স্পর্শটুকুর মধ্যে পাওয়াতে আমার অপরিসীম লাভ। যে দেশে শত শত অবতার সাদরে পূজিত, যে দেশে শত শত অবতার অবহেলে প্রতিষ্ঠিত, যে দেশে শত শত নূতন নূতন অবতার অবিরাম প্রচারিত, সেই দেশে আমাকে দিয়ে নূতন একটী অবতারের অবতারণা কর্ল্লে জগতের কোনও অসাধারণ লাভ কিছু হবে না। তার চেয়ে অনেক বড় কাজ হচ্ছে, সকল মতের মানুষকে একটী মিলন-মঞ্চে ক্ষণকালের জন্য হ'লেও প্রাণের পরশে পাওয়া।

ব্রহ্মচর্য্য ও সমবেত উপাসনা মহামিলনের সেতু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু এই ধ্যান আর এই ধারণাকে বাস্তবে রূপায়িত কত্তে হ'লে চাই পুরুষানুক্রমিক ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা। একাকী একজন বা এক যুগল দম্পতী নিজ নিজ জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা কর্ল্লেই হ'য়ে গেল না, এই সাধনাকে তাদের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, পুত্রবধূ, প্রৌত্রবধূ, প্রপৌত্রবধূ আদি ক্রমে ধারাবাহিক চালিয়ে যেতে হবে। শুধু ব্যক্তি নিয়ে ত' আমি চিন্তা কচ্ছি না, আমি সমগ্র জাতিটাকে নিয়ে এবং বিশ্বব্যাপী সকল জাতিকে নিয়ে চিন্তা কচ্ছি। এই

জন্যই আমার গতিশীলতা যতই অধিক হউক, প্রকৃত কাজ আমি কত্তে পাচ্ছি অতি ধীরে, অত্যন্ত আস্তে আস্তে। তোমরা আমার কথাই কেবল শুনতে পাচ্ছ, কিন্তু চিন্তার জগতে আমার মন ও ইচ্ছাশক্তি কি ক'রে যাচ্ছে, তা' তোমাদের দেখার উপায় নেই। আসল কাজটা ত' হচ্ছে বাবা সেইখানেই। যত দীর্ঘ আন্দোলন, তত গভীর তার ছাপ, আর তত ব্যপক তার সুফল-প্রসার। এটী একটী নৈসর্গিক নিয়ম। সার্ব্বজনিক প্রেমকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার দান কোথায় এবং কতটুকু, তার সঠিক বিচার তোমরা মাত্র তখনই কত্তে পার্ব্বে, যখন ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিতরে সকলের অজ্ঞাতসারে বা দৃষ্টির অগোচরে দীর্ঘকাল ধ'রে প্রতিপালিত হচ্ছে। এক এক বিন্দু শুক্র দিকে দিকে কত লক্ষ কত কোটি জীবের জন্মদান কচ্ছে, এটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। ঐ এক এক বিন্দু শুক্র সযত্নে ধারণ করার ফলে মানুষের মনের ভিতরে যে দুর্দ্দমনীয় কর্ম্মস্পৃহা জাগরিত হবে, তা আবার কত কর্ম্মের, কত শিল্পের, কত প্রয়োগযোগ্য বিজ্ঞানের, কত রসের, কত সঙ্গীতের, কত চিত্রের, কত দর্শনের, কত সাহিত্যের জন্ম একদা দেবে, তাও ভেবে আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই। একটা ধারণা একটা গোষ্ঠীর ভিতরে বদ্ধমূল হ'তে তিন থেকে নয়টী প্রজন্মের প্রয়োজন হয়। এক পুরুষের সাধনাতে এটা হয় না। এই জন্যই ত' বলি, ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হও, সমবেত-উপাসনা-পরায়ণ হও, মানুষের সঙ্গে

মানুষের মিলনের সেতু নির্ম্মাণ কর। ব্রহ্মচর্য্য সেই সেতুর সিমেন্ট, সমবেত উপাসনা সেই সেতুর লোহা-লক্কড়, সত্যভাষণ, সত্যানুসরণ সেই সেতুর কংক্রিট ও বালি।

আমরা সবাই যাযাবর

একটী যুবক, চুল আলুথালু, কথাবার্ত্তা একটু উদ্‌ভ্রান্তের মতন কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ী, সকলের অপরিচিত। সে প্রশ্ন করিল,—আপনি এত ছুটে বেড়ান কেন? বাঁকুড়ায় আমার বাড়ী। বর্দ্ধমানে এসেছেন শুনে দামোদর পেরিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। আপনি নেই। শুনলাম রংপুর, না কোথায় যাবেন। আবার ছুটলাম রংপুর। সেখানেও আপনি নেই। খবর পেলাম, যাবেন ময়মনসিংহ। সেখানেও আপনি নেই। সব জায়গাতেই আমি পৌঁছার আগেই আপনি আপনার বক্তৃতা সেরে পালিয়েছেন। শুনলাম চট্টগ্রাম যাবেন। তাই চট্টগ্রামে যাচ্ছিলাম। লাকসাম জংশনে একজন বল্ল,—আপনি নাকি নোয়াখালী যাচ্ছেন। চাপলাম নোয়াখালীর গাড়ীতে। ট্রেণেরই আর একজন যাত্রী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য গোপালপুরে আসছিলেন। তাঁর সঙ্গে এলাম।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জানো বাছা? আমরা সবাই যাযাবর। কেউ আসিনি একটী গৃহকোণে নীরবে ব'সে থাকতে। চলাই আমাদের স্বভাব, চলতেই আমাদের আনন্দ। তুমিও

তাই ঘুরে বেড়াচ্ছ, আমিও তাই ঘুরে বেড়াচ্ছি। কেউ ঘুরে বেড়ায় সত্যের সন্ধানে, কেউ বা বেড়ায় সত্যের প্রচারে। মন থাক্‌বে ধ্যানস্থ, বাহু থাক্‌বে প্রসারণরত, প্রাণ থাক্‌বে সমাধিমগ্ন, দেহ করবে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অনায়াসে বিচরণ, এইটাই আমাদের স্বভাব-ধর্ম্ম, স্বভাব-কর্ম্ম। তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ বেশ ত'! তবে, রেলের কড়ি ফাঁকি দিও না, পরের উপরে ভার স্বরূপ হ'য়ো না, স্বচ্ছন্দে চল, অন্য কাউকে কোনো প্রকারে বিব্রত না ক'রে প্রতিটি কাজ কর। অন্তরের দিকে লক্ষ্য রাখো যে, নিজেকে ঊর্দ্ধতর পথে নিয়ত পরিচালিত কচ্ছ কিনা। মন নীচে নেমে যাচ্ছে দেখলে, পরমেশ্বরের নামে মনকে লগ্ন ক'রে সকল অধঃপতন-সম্ভাবনাকে ঠেকিয়ে দাও। পতনের পথ বড় পিচ্ছিল। একবার পড়্‌তে শুরু কর্ল্লে আর থামা যায় না। কিন্তু কোনও ক্রমে একবার থাম্‌তে পার্ল্লে ওঠা কিন্তু বড় সহজ।

নারী

যুবকটী বলিল,—নারী আমাকে বড় চঞ্চল করে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এমন দেশ কোথায় পাবে, যেখানে নারী নেই? জগৎ-সভ্যতার নারী এক অপরিহার্য্য সামগ্রী। নারীহীন সমাজ কল্পনা করা যায় না। নারী আছে ব'লেই ত' সংসার আছে। কিন্তু নারী একটা বস্তু নয়। নারীর

প্রতি বস্তুবোধ থাক্‌লে সে জীবনের কক্ষপথে এক অশুভ উপগ্রহ-স্বরূপা। নারী একটা তত্ত্ব, পরমেশ্বরের সঙ্গে যার অভিন্নতা নিত্য এবং সতঃসিদ্ধ। নারী যখন তত্ত্ব, তখন সে স্বয়ং মহাশক্তি, তখন সে সকল শক্তির উৎস-স্বরূপিণী। তুমি পুরুষ কিন্তু তুমি কি একটী বস্তু, না একটা তত্ত্ব? তুমি যখন বস্তু, নারী তখন তোমার পক্ষে ভয়ঙ্করী। তুমি যখন তত্ত্ব, তখন তুমি নারীর প্রলয়ঙ্করী শক্তিকে এক নূতন রূপে, নূতন সৌন্দর্য্যে, নূতন সুষমায়, নূতন মাধুর্য্যে দেখ্‌তে পাবে। নিজেকে বস্তুবুদ্ধির অতীত কর, নারীকেও বস্তুবিচারের সীমার বাইরে দেখ্‌তে পার।

নামের মহিমা

যুবকটী বলিল,—তার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্থূলকে সূক্ষ্ম করার, জরাগ্রস্তকে যৌবন-মণ্ডিত করার, কর্ম্মকে পাপমুক্ত করার, চিন্তাকে কলুষহীন স্বচ্ছ ক'রে তোলার একমাত্র উপায় পরমেশ্বরের নাম। অবিরাম অবিশ্রাম নাম ক'রে যেতে থাক। নামের মহিমাতে তোমার সকল চঞ্চলতা, সকল দুর্ব্বলতা, সকল অক্ষমতা দূর হ'য়ে যাবে। এটী একটী অভ্রান্ত সত্য।

ওঙ্কার ও জগন্মঙ্গল

যুবকটী বলিল,—আমি ওঙ্কার মন্ত্র জপ করি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওঙ্কার-মন্ত্রের চেয়ে নিরাপদ মন্ত্র আর কিছু নেই। এই মন্ত্রে অভীষ্টদেবের পুরুষত্ব বা স্ত্রীত্ব কোনোটাই স্বীকৃত বা অস্বীকৃত নয়। সকল বস্তুর অতীত যে তত্ত্ব, তারই স্মারক এই নাম। সকল সত্যের স্বীকৃতি যেই উদার মনোভঙ্গী, সেইটী প্রাণপণ যত্নে আয়ত্ত কর। তাহ'লে ওঙ্কার জপের পরিপূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা কত্তে পার্ব্বে। ওঙ্কার জপে, শক্তি, তেজ, বীর্য্য ও পৌরুষ যেন দৈববলে তোমার ভিতরে জাগ্রত হবে। কারণ, ওঙ্কার জপ কত্তে হ'লেই তোমাকে সর্ব্বাগ্রে জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পটী ক'রে নিতে হবে। যে কেবল নিজের মুক্তির জন্য জপ করে, ওঙ্কার-জপে তার অধিকার নেই। এই একটী কারণেই ত' লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ-সন্তান ব'লে পরিচিত মানুষগুলি ওঙ্কার জানা থাক্‌তেও নানা খণ্ড মন্ত্রে ভগবানের উপাসনা কচ্ছে। তুমি ওঙ্কারই যখন জপ, তখন তার আগে জগৎকল্যাণের সঙ্কল্পটী বেশ কতক্ষণ ধ'রে নিষ্ঠা-সহকারে ক'রে নেবে।

আদি গুরু

যুবকটী বলিল,—আমি কোনও স্থানে কারো নিকটে দীক্ষা নেই নি। নিজে নিজেই জপ কচ্ছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগতের যিনি আদি গুরু, তিনি কার কাছে দীক্ষা নিয়াছিলেন? কারো কাছে নয়। স্রেফ্

নিজের কাছে। সেই আদি গুরুরই আমরা বংশধর, তাঁরই আমরা সন্তান-সন্ততি। তাঁরই আমরা শিষ্য-প্রশিষ্য। তাঁর চরিত্রের ধাত আমাদের মধ্যে কিছুটা থাক্‌বেই থাকবে। আর যে কাজে তাঁর কোন দোষ হয় নি, সে কাজে তোমার বা আমার দোষ নাও ত' হতে পারে। নিজে নিজে মন্ত্র নিয়েছ, দীক্ষা কারোও কাছে নাও নি, এতে কোন দোষ হয়নি। জপ কচ্ছ যখন ওঁকার, তখন সেই মন্ত্রেই ডুবে যাও।

যুবকটী বলিল,—আপনি দীক্ষা দিয়ে দেবেন কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যখন প্রয়োজন বুঝব, দীক্ষা দেব বৈকি। এই যে বাঁকুড়া থেকে এতগুলি জেলা পর্য্যটন ক'রে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ, এতেই তোমার দীক্ষা লাভের কাজ হ'য়ে গেছে। কোথায় বর্দ্ধমান, কোথায় রংপুর, কোথায় ময়মনসিংহ এত সব জায়গায় ঘোরবার কালে তুমি ত' একমাত্র আমাকেই ধ্যান করেছিলে বাবা। নূতন ক'রে তোমার গুরুমন্ত্র নেবার দরকার ত' দেখি না।

এই কথা বলিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি যুবকটির মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন। দেখিতে না দেখিতে যুবকটি সমাধি-মগ্ন হইয়া গেল। উন্মেষিত চক্ষু নিমীলিত হইল এবং শরীর হইতে বাহ্য-জ্ঞানের সমস্ত চিহ্ন লোপ পাইল।

শিবপুরের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার মজুমদারকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই ছেলেটির পেছনে সর্ব্বক্ষণের

জন্য একটি লোক নিযুক্ত করিয়া রাখ। কারণ, ইহার ভববন্ধনের মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে। ইহাকে স্বাধীন ভাবে চলিতে ফিরিতে দাও। যখন যাহা ইচ্ছা করে, তাহা পূরণ কর। কেননা, এজগতে আর ইহার করিবার কিছু নাই, সব ফুরাইয়াছে।*

উন্নত হও

একটী যুবক আসিয়া প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিল। বলিল,—আশীর্ব্বাদ করুন, জীবনে উন্নতি কত্তে যেন পারি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আশীর্ব্বাদ আমি নিশ্চয়ই কর্ব্ব। উন্নতিও তুমি নিশ্চয়ই কর্ব্বে। কিন্তু উন্নতি কর্ব্বে ত' অধ্যবসায়ের ফলে। পৃথিবীতে দুই চার জন মুষ্টিমেয় লোকই দৈব কারণে উন্নতি করে। কোটি কোটি মানুষ নিজেদের অভ্যুদয় সাধন কচ্ছে অধ্যবসায়ের বলে। সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-পথ বেছে নেওয়া, সেই পথে সুদীর্ঘ প্রযত্নে লেগে থাকা, হাজার বার আছাড় খেয়েও লক্ষ্যভ্রষ্ট না হওয়া, আমৃত্যু সৎসঙ্কল্প নিয়ে অবিচল বিক্রমে পথ চলা,—অভ্যুদয় এ সকলের উপরে নির্ভর করে। দুশ্চরিত্রেরা কোথাও কোথাও জীবনের বৈষয়িক

* মাত্র কয়েক দিন পরে নোয়াখালী শহরে দেবালয় নামক মন্দিরের প্রাঙ্গণে ধ্যানস্থ অবস্থায় ইহার দেহাবসান ঘটে।

দিকে উন্নতি করেছে ব'লে এই ভ্রান্তিতে প'ড়ো না যে, তোমাকেও চরিত্রহীন হ'তে হবে। পরস্বাপহারীরা কোনো কোনো সময়ে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে অন্যায় ভাবে নেতা বা সমাজপতি হয়েছে দেখেই মনে ক'রো না যে, তোমার জন্যও পরবিত্তাপহরণের রাস্তাই গ্রহণীয়। জীবনের উন্নতি বলতে কেবল আর্থিক উন্নতি বা সামাজিক প্রতিপত্তিই বোঝায় না। চরিত্রবলে, ত্যাগবলে, মনুষ্যত্বের মহিমায় যে উন্নতি লাভ করে নাই, তার উন্নতি অবনতিরই নামান্তর মাত্র।

যুবকটী বলিল,—তাই আশীর্ব্বাদ করুন বাবামণি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্ব্ব, তুমি সত্যবাদী হও, সৎ-পথাবলম্বী হও, সচ্চিন্তক হও আর সচ্চিদানন্দময় হও। আশীর্ব্বাদ কর্ব্ব, নিজের বলে নিজেকে উদ্ধার কত্তে সমর্থ হও, নিজের বলে বিশ্বকে উদ্ধারের যোগ্যতাও অর্জ্জন কর। সমগ্র বিশ্বে তোমার আত্মীয়তা প্রসারিত হোক্।

ব্রহ্মচর্য্যের আকর্ষণী শক্তি

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণির ভাষণ আরম্ভ হইল। এত জনতা হইল যে, আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ বিস্ময় মানিলেন। ভাষণ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ ক'রে নিজের কাছে টেনে আনে। সূর্য্য পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণকে

এমন ভাবে আকর্ষণ ক'রে রেখেছে যে, নিজেদের চল্‌বার শাশ্বত আবেগ থাকা সত্ত্বেও একটা নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথেই তাদের বারংবার আবর্ত্তিত হ'তে হচ্ছে। এই আকর্ষণ-শক্তি যদি সূর্য্যের না থাক্‌ত, তা' হ'লে পৃথিবীটা দিগ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে যে কবে কোথায় হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়ে মরত, তার ঠিকানা নেই। ভারতের প্রাচীন ঋষিরা এই তত্ত্বকে নিজ নিজ দেহমন্দিরেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন যে, ব্রহ্মচর্য্য-রূপ মহাশক্তি কারো মধ্যে থাক্‌লে সে নির্গুণ হ'য়েও সহস্র সহস্র মানব-মানবীকে নিজের দিকে আকর্ষণ ক'রে নিতে পারে। সুতরাং মানুষকে দুর্ব্বার আকর্ষণে টেনে এনে নিজের সমীপস্থ করার যদি করো আকাঙ্ক্ষা থাকে বা প্রয়োজন থাকে, তবে সে যেন প্রাণপণ যত্নে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে। কথার চাতুরীতে মানুষকে আর কতক্ষণ টেনে রাখা যায়? বচনের বাহার দিয়ে মানুষের কবিত্ব-প্রিয়তাকে তুষ্ট করা যেতে পারে কিন্তু অন্তরের স্পৃহাকে সম্মানিত করা যায় না। ব্রহ্মচারী হ'লে যে-কোনো মানুষ নিজের চিন্তাশক্তির অমিত প্রভাবে শত শত মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে, অর্থাৎ শত শত তপ্ত প্রাণে শান্তি দিতে পারে, শত শত তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয় পিপাসানিবারক অমৃতরসে ভ'রে দিতে পারে।

চিন্তার শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অন্যান্য প্রয়োজনের ন্যায়, এই জন্যও ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাপক অনুশীলন সমগ্র জাতির ভিতরে

সুপ্রতিষ্ঠিত করা দরকার। প্রাচীন ভারতের অমোঘ ঋষি-শক্তি একমাত্র চিন্তার মহিমায় এই অসাধ্য সাধন কত্তেন। তাঁরা কেবল নিজেদের জীবনকেই নিজেদের গভীর চিন্তার অব্যর্থ শক্তিতে গ'ড়ে তুলতেন না, তাঁরা সকলের অজ্ঞাতসারে সর্ব্বত্র চিন্তার প্রভাবকে বিস্তারিত ক'রে দেশব্যাপী বা জগৎ জুড়ে শান্তিময়, তৃপ্তিময়, সন্তোষস্নিগ্ধ, উদ্বেগ-বর্জ্জিত সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির কাজও ক'রে যেতেন। অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা উদ্ভট উৎপীড়ন সহ্য করার পরে একদা আমাদিগকে আমাদের সেই সুপ্রাচীন শান্তির পথ অবলম্বন কত্তেই হবে। আমি শুধু সেই কথাটী বলার জন্যই অকাতরে দেশের পর দেশ আর স্থানের পর স্থান পর্য্যটন ক'রে বেড়াচ্ছি।

বক্তৃতা তিন ঘণ্টা কাল চলিল।

নিঃশ্বাসঃ লৌহগন্ধী স্যাৎ

তিন চারিদিন ধরিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে লৌহগন্ধ পাইতেছিলেন। রক্তগন্ধী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস তাঁহাকে প্রতিনিয়ত সাবধান করিয়া দিতেছিল। অদ্যকার বক্তৃতা দীর্ঘ হইল বটে কিন্তু তিনি বলিলেন ধীর গতিতে। আবেগের মুহূর্ত্তগুলিতে তিনি থামিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশ্য, মন্ত্রমুগ্ধ জনতার ঘন ঘন করতালি-ধ্বনি তাঁহাকে মাঝে মাঝে থামিয়া যাইবার প্রচুর সুযোগও দিতেছিল।

তিনশত বৎসরের পরে

বক্তৃতান্তে যখন অমলেন্দু শাস্ত্রী নামক এক ভদ্রলোক তাঁহাকে চিন্তার শক্তি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—খুবই অসুস্থ বোধ কচ্ছি। তবু তোমার প্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই দিব। অসুস্থ আমি পুপুন্‌কীতেই ছিলাম। কিন্তু সেখানে এমন সব উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'ল যে, বাইরে বেরুলে নিরুদ্বেগ হ'ব ভেবে ভ্রমণ-তালিকা ক'রে ফেল্লাম। আমার এক সহকর্ম্মী রংপুরে এল আমাকে ভাষণ দানে সহায়তা কত্তে। কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গেই চল্‌ল, অথচ তার সাহায্য পেলাম না। সে কোনও প্রকারে দুই স্থানে দুটী অতি সাধারণ বক্তৃতা দিয়েই যেন জিদ্ ক'রে চুপ মেরে গেল। অথচ এখন আমার বুকে তীব্র বেদনা চল্‌ছে, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে রক্তের গন্ধ পাচ্ছি, আবার যদি সেই পুরাতন রক্তপাতের রোগ শুরু হয়, তবে সন্দ্বীপ বা বরিশাল যাওয়া হবে না।

শ্রীযুক্ত অমলেন্দু শাস্ত্রী বলিলেন,—আপনার ঐ অবর্ণনীয় বক্তৃতা কি substitute (বিকল্প বক্তার) দ্বারা হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পারে না। কিন্তু একজনের মুখের সৎকথাগুলি দশ জনে দশ দিকে দশ রকমে যদি বল্‌তে থাকে শুভবুদ্ধি নিয়ে, তবে তাতে সুফল কেন হবে না? আমার বিকল্প বক্তা আমার প্রাণই বা কোথায় পাবে, আমার

ভাষাই বা কোথা থেকে আহরণ কর্ব্বে? আমার বিকল্প বক্তা আমার জীবনের অভিজ্ঞতাগুলির প্রকৃত মূল্য কেমন ক'রে উপলব্ধি কর্ব্বে? আমারই কথা সে বল্‌বে তার নিজের ভাবে, নিজের ভাষায়, নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-গুলির উপরে দাঁড়িয়ে। এতে বক্তব্য বিষয়ের বর্ণনে, বিস্তারে, ব্যাখ্যানে এবং পরিবেশনে নানা রূপ পার্থক্য ঘট্‌বেই ঘট্‌বে। কিন্তু উদ্দেশ্যের যদি থাকে একতানতা এবং সমধর্ম্মিত্ব, তবে ফলের বেলা একই জিনিষ পাওয়া যাবে। ফসলের পরিমাণে তারতম্য হতে পারে, তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? আমিও ধান্য-বীজই বপন ক'রে যাচ্ছি, সেও ঐ ধান্য-বীজই যদি বপন করে, তবে ফসলের পরিমাণে পার্থক্য ঘট্‌লেও ফসলের জাত্যন্তর ঘট্‌বে না। খ্রীষ্টের উপদেশ যাঁরা সারা পৃথিবীময় বিলিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের মন, প্রাণ, ভাষা কি খ্রীষ্টের মন, প্রাণ, ভাষার সঙ্গে একেবারে হুবহু মিলবে? কিন্তু উদ্দেশ্যের একতানতা এবং সহধর্ম্মিত্ব থাকায় ছোট্ট একজন পাদ্রী সাহেব সে কাজটাই কচ্ছেন, যেটা যীশুখ্রীষ্ট নিজে ক'রে গেছেন বা দীর্ঘায়ু হ'তে পার্ল্লে বহু বৎসর জুড়ে নিজেই কত্তেন। আমার অবস্থা ত' সঙ্গীণ। সঙ্গী নাই, সাথী নাই, বিশ্বাসভাজন বা বিশ্বাসযোগ্য অনুচর প্রায় নাই। যারা আসে, দুদিন থেকে চলে যায় সংসার-বুদ্ধির তাড়নায়। আমি পারি না দুমুঠা উদরান্নে কর্ম্মীদের পেট ভ'রে দিতে, আর কাজে বেরিয়েছি জেলার পর জেলা ঘুরে বুকে পিঠে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে

কেবল বক্তৃতা দিতে। আমার এই বক্তৃতার কোনো দাম নেই। দামী হচ্ছে আমার স্বচ্ছ চিন্তা, যা একদা সুনিশ্চিত রূপ ধারণ কর্ব্বে তিনশত বৎসরের পরে।

গোপালপুর (নোয়াখালী)
৩০শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২
(১৭ই অক্টোবর, ১৯৩৫)

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামনির বুকের ব্যথা খুবই তীব্র। এজন্য অদ্য মৌনী রহিলেন। জিজ্ঞাসুদিগকে লিখিয়া লিখিয়াও কোনও প্রশ্নের জবাব দিলেন না। কিন্তু নিজ খুশীমতন নানা স্থানে পত্র লিখিতে বসিলেন।*

কীর্ত্তন, স্বাধ্যায়, ভাষণ

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত ভাটিয়ালপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবমণি লিখিলেন,—

"কীর্ত্তনে সাধারণ বুদ্ধির নরনারী অতি সহজে আকৃষ্ট হয়। কীর্ত্তনের সুরমাধুর্য্যেও বটে, পদ মাধুর্য্যেও বটে। নামকীর্ত্তনে অনেক সময়ে ধ্যানাবেশের আমেজ আসে বলিয়া ইহা

* সর্ব্বপ্রথম যে পত্রখানা লিখিলেন, তাহা জনৈকা কুমারীকে। পত্রখানা "কুমারীর পবিত্রতা" চতুর্থ খণ্ডে পঞ্চম পত্র-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী দুইখানা পত্র লিখিলেন দুইটী সধবা মহিলাকে। পত্র দুইখানা "সধবার সংযম" গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণে ৮৩ এবং ৮৪ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

চিত্তপ্রশান্তিকর এক পরম মহৌষধও বটে। কিন্তু কীর্ত্তনই যদি শেষ পর্য্যন্ত চরম লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে জগতের আশু-মঙ্গলকারী জরুরী লোকহিতকর কর্ম্মগুলি ব্যাপক ভাবে করিবার সুযোগ সহজ হইবে না। কীর্ত্তন এই সকল ক্ষেত্রে আকর্ষণের জন্য। 'আকৃষ্য কীর্ত্তনেন চ।' তার পরবর্ত্তী সিঁড়ি হইতেছে 'স্বাধ্যায়েন।'

"সুতরাং সুদক্ষ কীর্ত্তনীয়া এবং সুযোগ্য পাঠক বা পাঠিকা সৃষ্টির প্রয়োজন।

"কিন্তু বিরাট বহরে একাজ করিতে হইলে জনসভা এবং ভাষণ প্রয়োজন। আন্দোলনের বন্যা হইতেছে জনসভায়। একটী দুইটী নহে, দশটী বিশটী নহে, শত শত সহস্র সহস্র মানুষের চিন্তার জগতে নব নব নক্ষত্রের বিচিত্র আলোক-রশ্মি নিক্ষেপ করিয়া সর্ব্বত্র অভাবনীয় ও ব্যাপক জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি ইহার বিশেষত্ব। কীর্ত্তনকে জোয়ার বলিতে পার, শুধু পূর্ণিমা-রজনীর স্নিগ্ধকিরণোল্লসিত সুশৃঙ্খল জোয়ারের কলনাদ, কলভাষ বা কলকল্লোল। স্বাধ্যায়কে জোয়ারের পলিমাটী আটক করিবার কৌশল বলিতে পার। সফল জনসভা একেবারে প্লাবন। সুতরাং বক্তা সৃষ্টিও প্রয়োজন। বগ্‌বগ্ করিলেই বক্তা হয় না, বক্তাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। যাহার ওজস্বী হুঙ্কার সহস্র ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গিবে, যাহার বজ্রময়ী বাণী লক্ষ জনের অন্তর হইতে শঙ্কা, সঙ্কোচ, ভয়, কুণ্ঠা, দ্বিধা ও

দুর্ব্বলতাকে নির্ব্বাসিত করিবে, তাহার নিজের অন্তরে অকারণ উত্তেজনা থাকিবে না একটী কণাও। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া যে দাবানল জ্বালাইবে, তাহার নিজের হাতটী তুষার-শীতল থাকা চাই। সমগ্র জগতের দুঃখ-বিমোচন যিনি করিবেন, তাঁহাকে যেন কোনও দুঃখ, কোনও মোহ, কোনও দুর্ব্বলতা কদাচ বিবশ না করে। তিনি হইবেন স্থিতপ্রজ্ঞ। যে ব্রহ্মচর্য্য পালিবে না, মাদক সেবন করিবে, স্ত্রীগণের সহিত ঢলাঢলি করিবে, তাহাকে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইতে দিবে না। যে ধার নিয়া ধার শোধ করে না, আর্থিক ব্যাপারে লোক-প্রবঞ্চনা করিতে যাহার লজ্জা নাই, যে দুর্নীতির উপাসক, তাহাকে ভাষণের আসরে মুখ খুলিতে বলিও না। যে মাতাপিতার প্রতি অকৃতজ্ঞ, স্ত্রীর প্রতি বা স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার দোষে দুষ্ট, যে হিংস্র, নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণ, তাহাকে ভাষণমঞ্চে দাঁড়াইবার জন্য আমন্ত্রণ করিও না।

"যে আমার লেখাগুলি পড়ে নাই, সে কি করিয়া আমার ভাবাদর্শ প্রচার করিবে? কিন্তু আমি পুস্তক লিখিয়াছি আর কয়খানা? এবং তাহাও ত' নিতান্ত নাবালকের পাঠ্য। জীবন ভরিয়া পত্রই লিখিয়াছি আর যাবতীয় আয় ডাকটিকিটেই ব্যয় করিয়াছি। কিন্তু আমার ভাবাদর্শ প্রচার করিতে হইলে তাহা তোমাদের পড়িতে হইবে। পড়িতে হইবে বারংবার, পড়িতে হইবে গভীর আগ্রহ নিয়া, পড়িতে হইবে কথাগুলির

নিহিত অর্থ বুঝিবার চেষ্টা নিয়া। জেলার মধ্যে অসংখ্য সুদক্ষ বক্তা সৃষ্টি তোমরা অনায়াসে করিতে পার, যদি শুধু আমার মুখের কথা কয়টার সঙ্গে মরমের যোগ স্থাপন করিতে ও করাইতে পার। বক্তা তোমাদের সৃষ্টি করিতে হইবে। কেননা, একদা একই দিনে একই সময়ে পঞ্চাশ ষাট সত্তরটী জনসভা হইতে ঠিক একই কথা যুগপৎ লক্ষ লক্ষ লোককে শুনাইবার প্রয়োজন কি আসিতে পারে না? যাহার সুদূর সম্ভাবনাও আছে, তাহার জন্য প্রস্তুতি অনেক আগে হইতেই প্রয়োজন। A parfect plan is half the work done. অনন্ত কালকে চখে দেখা কঠিন কিন্তু তিনশত বৎসরের পরবর্ত্তী যুগকে আমি স্পষ্ট দেখিতেছি।”

সঙ্গীত ও বক্তৃতা

বীরভূম জেলান্তর্গত মাড়গ্রাম-নিবাসী জনৈক প্রত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“বক্তৃতাদান-বিদ্যাই বল আর সঙ্গীত-চর্চ্চাই বল, ইহারা মনকে নিশ্চয়ই কতকটা বহির্ম্মুখ করে। বিশেষতঃ ইহারা যখন অহঙ্কারের উত্তেজক হয়, তখন ইহারা সদ্যঃ সদ্যঃ আত্মনাশা বিষ। কিন্তু মহৎ লক্ষ্যের জারণ দিয়া এই বিষের অমৃতায়ন ঘটাইতে হয়। বক্তৃতা দাও সদুদ্দেশে, যাহার সহিত তোমার নিজের স্বার্থের সম্পর্ক কম। সঙ্গীত কর এমন বিষয়ের, যাহা দিয়া মানুষ মানুষকে ভালবাসে, পরকে আপন করে, দূরকে

নিকট করে, দুর্ব্বলকে সবলতা দেয়, হতাশকে দেয় আশা এবং ভগ্নোদ্যমকে করে কর্ম্মনিরত। বিদ্যা হিসাবে প্রায় সব বিদ্যাই ভাল, বাদে চৌর্য্যবিদ্যা, প্রবঞ্চনা বিদ্যা, দস্যুতার বিদ্যা। বিদ্যার প্রয়োগ কি ভাবে হইল, কি উদ্দেশ্যে হইল, তাহার উপরে নির্ভর করে তাহার সার্থকতা ও উপযোগিতা।"

দারিদ্র্যের প্রতীকার স্বাবলম্বনে

দিনাজপুর জেলান্তর্গত পার্ব্বতীপুর-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হইয়া গিয়াছে, দেশবাসীর দুরন্ত দুঃখের কথা ভাবিয়া। দিনে দিনে মানুষ দারিদ্র্য ও চরিত্রহীনতার যে পঙ্কে ডুবিতেছে, তাহা ভাবিয়া আমার আহার-নিদ্রা টুটিয়া যাইতেছে। এই দুরবস্থা একদিনে আসে নাই, এক যুগেও নহে। স্মরণাতীত কাল হইতে উত্তর পশ্চিমের দ্বারপথে দুর্ব্বার দস্যুরা ভারতে আসিয়া লুণ্ঠন চালাইয়াছে। অল্প কয়েক শতাব্দী ধরিয়া জলপথেও ব্যাপক লুণ্ঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। স্নিগ্ধ-সুন্দর শস্যশালিনী অরণ্যমালিনী আমাদের জন্মভূমিতে অন্নপূর্ণা মা থাকিতেও আমরা কোটি কোটি সন্তান উপবাসে, অর্দ্ধোপবাসে দিন কাটাইতেছি। কিন্তু ইহাই চূড়ান্ত কথা নহে। ভবিষ্যৎ বলিয়া একটা কাল আছে। সেই সময়ে আমরা কি করিব? খাদ্যের অভাবে হন্যে হইয়া দিগ্‌বিদিকে

ঘুরিয়া বেড়াইব, না মানুষের মাংস মানুষে খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিব? আজিকার ক্ষুদ্রাকার অন্নাভাব একদা যাহাতে ব্যপক বিস্তারে প্রসারিত হইয়া মানুষের মনুষ্যত্বকে পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া না ফেলিতে পারে, তাহার আয়োজন আমাদের করিতে হইবে। দান-খয়রাৎ ইহার প্রতীকার নহে, প্রতিটী মানুষকে স্বাবলম্বী ও আত্মবলপ্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টাই প্রকৃত প্রতীকার-পন্থা।”

ত্যাগের রুচি ও চিত্তশুদ্ধি

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত রিয়াপাড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“ত্যাগের রুচি, দানের বুদ্ধি, স্বার্থহীন সেবার প্রেরণা মানুষের আপনা আপনি আসে না, আসে চিত্ত শুদ্ধ হইলে। যার যত চিত্ত-শুদ্ধি, তার তত ত্যাগের সামর্থ্য। এই শুদ্ধি আসে অকপটে ভগবৎ-সাধনে নিরত থাকার অভ্যাস হইতে। সাধন করিতে করিতে ভগবানকে আপনার আপন প্রাণের প্রাণ বলিয়া মনে হয় এবং ভগবানের যাবতীয় সৃষ্টির প্রতি গভীর মমত্ববোধ জাগ্রত হয়। তখনই মানুষ সহজে এবং স্বভাবিক ভাবে ত্যাগের অনুশীলনে ব্রতী হয়।”

গোপনতা, পাপ, যশোলিপ্সা

দিনাজপুর জেলান্তর্গত বাসাইল শামসা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিজেকে গোপন রাখিয়া সৎকার্য্য করিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা খুবই সাত্ত্বিক মনের পরিচায়ক। আমি ইহার প্রশংসা করি। আমি নিজে আমার জীবনের অধিকাংশ গুরুতর কাজ গোপনে করিয়াছি, লোকলোচনের বিষয়ীভূত হইতে দেই নাই। কিন্তু কাজ যখন জনসাধারণের জন্য এবং ইহা যখন ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন গোপনতার যবনিকা খসিয়া পড়ে এবং সকলে সকল কথা জানিতে পায়। সেই সময়ে যাহাতে লোকযশের তোড়ে তোমার চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ভাসিয়া না যায়, তাহার জন্য প্রয়োজন এক অসাধারণ চারিত্রিক শক্তির। এই শক্তিই তোমার সর্ব্বপ্রযত্নে আয়ত্ব করা আবশ্যক। কাজ গোপনে করিয়াছ বলিয়া বাহাদুরীর কিছু নাই। প্রকাশ্যে করিলেও মানযশের প্রাচুর্য্য বা অল্পতা তোমার মনে উচ্ছ্বাস বা অবসাদ যে আনিতে পারে না, তোমার পক্ষে এই কথাটাই জানিও প্রধান বিবেচ্য। এমন কতকগুলি কাজ আছে, যাহা সৎ হইলেও তুমি গোপনে করিতে পার না, কেননা, করিতে গেলে গুরুতর অনর্থের ব্যাপার ঘটিতে পারে। যত দৃঢ় চরিত্রের লোকই তুমি হইয়া থাক না কেন, একমাত্র যুদ্ধকালে গুপ্তচরবৃত্তি করিবার কালে ছাড়া, তুমি কদাচ কোনও স্ত্রীলোকের বিশেষ কোনও উপকার সাধনের জন্য গোপনে তাহার সহিত একত্র থাকিতে পার না। যেরূপ গোপনতায় কলঙ্ক-সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা আছে, যে সকল গোপনতায় পাপের বীজ অঙ্কুরিত হইবার আশঙ্কা আছে, যে সকল গোপন

কাজে ও ব্যবহারে নিজের চিত্ত-সংযম, ধৈর্য্য ও মনোবলকে প্রলোভনের সমক্ষে নিয়া পরীক্ষার খাতা হাতে বসাইতে হয়, তোমন গোপনতা বর্জ্জনই শ্রেয়ঃ। অনুসরণকারী পুলিশের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য তুমি গণিকার বেশ ধারণ করিয়া গণিকা-পল্লীর পতীতাদের মধ্যে বাস করিতে শুরু করিলে,— এমন গোপনতা সত্যই সর্ব্বনাশকর। সৎ কাজে নিজেকে গোপন রাখার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল যশোলিপ্সার মস্তকে পদাঘাত করা। গোপনতার অন্য কোনও মহত্ত্ব থাকিলেও তাহা নিয়া তোমার মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। সৎকাজ করিয়া যদি যশ আসে, আসুক, না আসিলে মনকে ক্ষুব্ধ, পীড়িত, নির্য্যাতিত মনে না করিলেই ত' হইল। গোপনতা মাত্রেই পুণ্য নহে, কোনও কোনও গোপনতা পাপের পরাকাষ্ঠাও হইতে পারে।"

সার্থক বিদ্যাদান

বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত বন-নবগ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিদ্যার্জ্জন কখনো কখনো বিড়ম্বনায় পরিণত হয়। বিদ্যা যদি বিনয় না দিয়া অহঙ্কার দেয়, তবে ইহা এক অপবাদের আস্পদ হইল। আর, বিদ্যা যদি খুলিয়া দেয় কুবুদ্ধির সপ্তদ্বার, বিদ্যা যদি প্রযুক্ত হয় পাপাচারে, মিথ্যা ব্যবহারে, প্রবঞ্চনায়, সমাজ-বিরোধী নানা দুষ্কর্ম্মে, তবে উহা শুধুই বিড়ম্বনা নহে,

উহা অমঙ্গলদায়িনী পিশাচী মাত্র। বিদ্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি চরিত্র-দান না করিতে পারিলাম, তবে বিদ্যা শুধু নিষ্কলঙ্কই হইল, তাহা নহে, তাহা অপসম্ভাবনা দিয়া গর্ভবতী হইল। বিদ্যা ধন বটে কিন্তু চরিত্রধনের চেয়ে উহার মূল্য অধিক নহে। কি করিয়া মানুষকে চরিত্রবান্ করা যায়, তার প্রকৃত পদ্ধতি যতদিন না আবিষ্কৃত হইবে এবং সেই পদ্ধতি যতদিন না অনুসৃত হইবে, ততদিন লক্ষ লক্ষ কলেজ আর কোটি কোটি বিদ্যালয় খুলিয়াও জাতির বা দেশের কোনও মঙ্গল করা যাইবে না। সাক্ষরতা-আন্দোলন প্রশংসনীয় বটে কিন্তু অক্ষর লিখিতে শিখাইলেই শিক্ষা হইয়া গেল না, অক্ষর-পরমেশ্বরের অস্তিত্ব নিজ অস্তিত্বের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে উপলব্ধি করিয়া এই সাক্ষরেরা যেদিন সর্ব্বজীবে প্রেমভাব ও অত্মীয়তার আস্বাদন পাইবে এবং এই আস্বাদনের অমৃতময় প্রভাবহেতু দুশ্চরিত্রতার উর্দ্ধদেশে অবস্থানের পূর্ণ সামর্থ্য অর্জ্জন করিবে, বিদ্যাদান সার্থক হইবে তখন।”

স্বামীর অজ্ঞাতে

দিনাজপুর জেলান্তর্গত বেপারিটোলা-নিবাসিনী জনৈকা পত্র-লেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“স্বামীর কাছে গোপন রাখিয়া ভ্রাতাকে সাহায্য করিয়াছ। ইহা ভাল, না মন্দ, নির্ভর করিবে, কতটুকু কি করিয়াছ। স্ত্রী

তার ভাইকে স্বামীর সংসার হইতেও কিছুটা সাহায্য-সহায়তা করিতে অধিকারিণী, যদি স্বামীর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ না হয়। এমন কতকগুলি সাহায্য আছে, যাহার জন্য স্বামীর অনুমতি একেবারে অনাবশ্যক। কিন্তু ভাইকে কারবার করিবার জন্য গায়ের গহনা খুলিয়া দিবে বা স্বামীর দ্বারা লোহার সিন্দুকে সযত্নে রক্ষিত নোটগুলি খুলিয়া তাহার অগোচরে দান বা হাওলাত দিবে, ইহা অপরাধ। এইরূপ আদান-প্রদানের ব্যাপারে শ্যালক ও ভগিনীপতির মধ্যে সরাসরি আলোচনা হওয়া উচিত। এই একটা ধারণা অধিকাংশ সংসারী লোকের মনেই বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, সাধারণতঃ মামাবাবু আর শ্যালাবাবুরা আসিয়া এক একটা সুখের সংসারকে শুষ্ক, রুক্ষ, নিষ্করুণ মরুভূমিতে পরিণত করিয়া দিয়া গিয়াছে। এই সংস্কার স্বভাবতঃই অনেকের মনে সঙ্গোপনে একটা ভীতির সঞ্চারও করিয়া রাখিয়াছে। এমতাবস্থায় স্বামীকে না বলিয়া এত বড় দুঃসাহসিক কার্য্য করা তোমার অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে। হয়ত তোমার ভ্রাতা ঐ অর্থের সাহায্যে কারবার করিয়াছে এবং ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞতার দরুণ লোকসান দিয়া পথে বসিয়াছে। অথবা হয়ত সে অলঙ্কারগুলি পরনারী-সেবায় বা অলঙ্কার-লব্ধ অর্থ কুসঙ্গে ও মদ্যপানে ব্যয় করিয়াছে। মনের বেদনা মনেই গোপন করিয়া না রাখিয়া অকপটে স্বামীর নিকটে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া নিরপরাধা হও। স্বামীর নিকটে সকল সত্য প্রকাশ করিলে হয়ত তোমার সাময়িক

কিছু লাঞ্ছনাও হইতে পারে। কিন্তু এই লাঞ্ছনা ত' তোমার প্রাপ্য। কিন্তু এমনও ত' হইতে পারে যে, তোমার স্বামী তোমার সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তোমাকে আগের চেয়ে অনেক বেশী আদরণীয়া জ্ঞান করিতেছেন। দুই রকমই হইতে পারে। মন্দটা ঘটিবার সম্ভাবনাই বেশী জানিয়াও তুমি সৎ-সাহস সহকারে স্বামীর সকাশে সরল হও, অকপট হও। যাহার নিকটে তোমার কিছুই গোপন থাকিবার কথা নহে, তাহার কাছে এত বড় একটা ঘটনার কথা প্রকাশ না করিয়া এতগুলি দিন তুমি কোন্ সুখে কাটাইয়াছ, তাহাই ত' আমি ভাবিয়া পাই না।"

বহু সন্তানের জনকের প্রতি

ঢাকা জেলান্তর্গত বাল্লা রতনগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আটটি, দশটী, বারোটী সন্তানের পিতামাতা হইবার পরেও পুরুষ ও নারীর সন্তানজননোপযোগী ক্রিয়াকলাপ কি করিয়া রুচিপ্রদ হইতে পারে, ইহা আমি অনুমান করিতে পারিতেছি না। দাম্পত্য মিলনের যত প্রকারের প্রয়োজন, দাবী, অভীপ্সা ও আকূতি মানুষের মনে থাকিতে পারে, এতগুলি সন্তানের আবির্ভাবের দ্বারা তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটারই অনেকটা চরিতার্থতা যে ঘটিয়া গিয়াছে, ইহা অনুমান করিলে ভুল হইবে না। তবু নরনারী পরস্পর দৈহিক

ক্রিয়াতে আসক্ত হয় কেন? এই প্রশ্নের শুধু একটীই জবাব,— দীর্ঘকালের অভ্যাস। অভ্যাসের দাসত্ব বুদ্ধিমান্ মানুষগুলিকেও নাকাদড়ি দিয়া টানিতেছে। তোমাদিগকে অভ্যাসের এই দাসত্বকে দ্রোহ দ্বারা দূর করিতে হইবে। বিদেশী আসিয়া তোমার দেশের রাষ্ট্র-ক্ষমতা কাড়িয়া নেওয়াতে তোমাদের যতখানি দুঃখ বা দুর্দ্দশা, তার চেয়ে বেশী দুঃখ ও বেশী দুর্দ্দশা তোমরা নিজেরা নিজেদের অভ্যাসের দাসত্ব দ্বারা ভোগ করিতে বাধ্য হইতেছ। যে ভোগে তৃপ্তি নাই, আনন্দ নাই, উল্লাস নাই, কোনও স্থায়ী আত্মপ্রসাদ নাই, কোনও সুফল নাই, যাহার ফল একমাত্র নিষ্ঠুর নির্ম্মম বেপরোয়া দারিদ্র্য, তাহার কবল হইতে নিজেদের সঙ্কল্পের বলেই তোমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে। অন্য স্বাধীনতার আগে এই বিষয়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন তোমাদের প্রয়োজন। একদা যখন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তোমাদের আসিবে, তখনও দেখিও এই একটী অভ্যাসের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পার নাই বলিয়া বহুসন্তান-জনন-রূপী পাপের ফলে প্রতি গৃহে তোমরা অর্থাভাবে, বস্ত্রাভাবে, অন্নাভাবে ও শিক্ষাভাবে কেবল হাহাকারই করিতেছ। বিধাতাকে নিন্দা করিয়া লাভ নাই,—তোমরা নিজেদের দোষেই অতল পাতালে অগাধ সলিলে অকাল সমাধি পাইতে চলিয়াছ। ইহা বিধিলিপির ফল নহে, ইহা তোমার আত্মকর্ম্মের স্বাভাবিক কুফল।"

ভাব, ভক্তি, ভালবাসা, বিশ্বাস, প্রত্যয়

মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত রঘুনাথগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার ভাব, ভক্তি, ভালবাসা দিনের পর দিন তোমার শান্তি, স্বস্তি, স্নিগ্ধতা বর্দ্ধিত করিতে থাকুক। বিশ্বাস লইয়া যাহারা কাজে নামে, তেমন ভক্তিমান্ পুরুষ ও নারীরা অত্যল্প কাজ করিবার পরেই এমন কতকগুলি প্রত্যয় লাভ করে, যাহা তাহাদের গতি-পথকে সুনিশ্চিত এবং তাহাদের লক্ষ্যকে সুস্থির করিয়া দেয়। ভাব, ভক্তি, ভালবাসা না থাকিলে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইবার রুচি আসে না। বিশ্বাস না থাকিলে কর্ম্মে আসে না দৃঢ়া নিষ্ঠা। নিষ্ঠা সহকারে কাজ না করিলে কদাচ প্রত্যয়সিদ্ধ হওয়া যায় না। কিন্তু মনে রাখিও, প্রকৃত ভাব, প্রকৃত ভক্তি এবং প্রকৃত ভালবাসার জন্মভূমি ব্রহ্মচর্য্যসিদ্ধ নিরুত্তাপ মন। চঞ্চল মন ভালবাসাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দিয়া তাহার অমর্য্যাদা করে। সাহস করিয়া কাজে নামিয়া যাও, বুদ্ধি আপনিই বাহির হইবে। অনেক শলা, অনেক পরামর্শ, অনেক আলোচনা ত' শুধু কর্ম্মকুণ্ঠ অলসদের জন্য। যাহাদের অন্তরে ভালবাসার প্রাচুর্য্য যত কম, অনুরাগ যত ভাসা-ভাসা, তাহাদেরই জন্য বচন-মাধুরীর প্রয়োজন তত

বেশী। মূক হইয়া থাকিতে বলি না, বলিতেছি বাক্-সংযমী হইতে। পরিকল্পনাহীনও হইতে বলিতেছি না, নিষিদ্ধ করিয়া দিতে চাহি বল্গাবিহীন বাগাড়ম্বরকে আর তুচ্ছ বিষয় নিয়া অভিধানের সবগুলি গুরুগম্ভীর শব্দের অপব্যবহারকে।"

নাম-তরঙ্গে মালিন্য-নাশ

নদীয়া জেলান্তর্গত দামুরহুদা গ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জ্ঞাত বা অজ্ঞাত, স্মৃতিতে জাগ্রত বা বিস্মৃত কোনও অতীত পাপের কথা অনুচিত ভাবে চিন্তা করিয়া নিজের মনকে ক্ষতবিক্ষত ও জর্জ্জরিত করিও না। অবিরাম নাম করিয়া যাও, নামের স্রোতে যেন বিরাম না ঘটে। গঙ্গাতীরে মূর্খ লোকেরা মলমূত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, গঙ্গা কিন্তু নিজের স্রোতের বেগে আস্তে আস্তে পুঞ্জীকৃত কলুষ ঐ তীরভূমি হইতে সরাইয়া নিয়া যায়। নাম কর আর নাম কর। নামের সাগরে অবগাহন করিয়া নাম-তরঙ্গের অভিঘাতে নিজেকে যাবতীয় মালিন্য হইতে মুক্ত কর।"

চরিত্র ও সতীত্ব

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত কুটী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"চরিত্রবান্ যুবকেরা জাতির মহান্ রক্ষক এবং সতীত্ব-সম্পন্ন রমণীরা জাতির অমূল্য সম্পদ। এই দুইটী কথা মনে রাখিয়া এই দুই দিকের অক্ষুণ্ণ অটুট সাধন-সিদ্ধির দিকে প্রতিটি মানুষের মনকে আকৃষ্ট কর। বারংবার হয়ত ইতিহাস তোমাদিগকে টিট্কারী দিয়া বলিবে যে, ওসব হইতেছে সেকেলে গ্রাম্য ধারণা। কিন্তু যাহা অতীতে ঘটিয়াছে, তাহাই জগতের সম্পূর্ণ ইতিহাস নহে। যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, ঘটিতে বাধ্য, না ঘটিলে আশ্চর্য্য ব্যাপার হইবে, তাহাও ইতিহাস। বিভিন্ন জাতির, বিশেষতঃ আমাদের দেশের, বারংবার নিদারুণ অধঃপতনের মধ্য দিয়াও এই কথাই ইতিহাস পুনঃ পুনঃ প্রচার করিতে বাধ্য হইবে যে, চরিত্রবলই বল, সতীত্ব-শোভাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য এবং ত্যাগপ্রবুদ্ধ যুবক-যুবতীরাই দেশের জাতির অলঙ্কার, সমাজ ও সভ্যতার সম্বল, সংস্কৃতি ও সৌভাগ্যের মূলভিত্তি।"

অনুতাপ

দার্জ্জিলিং জেলান্তর্গত কার্সিয়াং-নিবাসী জনৈক পত্র-প্রেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অতীতে যদি পাপই কিছু করিয়া থাক, তবে তাহার তিক্ত স্মৃতি মন্থন করিয়া মনোবেদনা ও মর্ম্মযাতনা বাড়াইয়া কোনও লাভ নাই। অনেকে অতীতের পাপানুষ্ঠানকে প্রীতি

সহকারে স্মরণ করে এবং মনে মনে আফশোষ করে যে, আরও একটু ভাল ভাবে তৈরী হইয়া নিয়া কাজটা করিলে পাপটী ঠিক সমানই হইত কিন্তু পাপজাত সুখের উদয় অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইতে পারিত। এই হতভাগ্যেরা বাসনার কীট। অতীত পাপ স্মরণে যদি অন্তরে সুখোদয় বা সুখকামনার উদ্রেক হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, অনুতাপ একটা কথার কথা মাত্র, প্রকৃত অনুতাপ আসে নাই। অনুতাপ যেন তুষানল। অনুতাপ আসিলে অতীত পাপের সংস্কার আস্তে আস্তে দগ্ধ হইয়া যাইতে থাকে। ইহাতে মনের বোঝা হাল্‌কা হয়, বাসনার বাঁধন শিথিল হয়। এই জন্যই মহতেরা সর্ব্বদা প্রার্থনা করেন,—'হে প্রভো, ভুল যদি কখনও করিয়া বসি, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অনুতাপের অনলে দগ্ধ করিও, যেন উহার ফলে মনের মরিচা স্ফুলিঙ্গবৎ দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়া আমাকে বিশুদ্ধ লৌহে পরিণত করিতে পারে।' অনুতাপ যদি অত্যধিকত্বের দরুণ তোমার সাধন-কর্ম্মের যাবতীয় শক্তি হরণ করে, তবে তাহাও একটা পাপ। তোমার যাবতীয় কর্ম্মশক্তিকে মঙ্গলকর্ম্মের সম্পর্কে নির্ভুল ভাবে উদ্যত করিবার জন্যই ত' তোমার অনুতাপ প্রয়োজন।"

হরিভজন ও ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণ

ঢাকা জেলান্তর্গত সোনারং-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সম্প্রদায়-বিশেষের প্রচারক গীতা বা ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রোতাদের নিকট হইতে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করিলে তাহা হইবে পরমার্থের অনুকূল, আবার অন্যতর সম্প্রদায়ের বাখ্যাতারা পাঠ-কীর্ত্তন প্রভৃতি করিয়া টাকাকড়ি কিছু নিলে তাহা হইবে স্বার্থেরই উপাসনা,—এই যুক্তিটি আমি বুঝিতে পারিলাম না। বিদ্যাদান, জ্ঞানদান, শিক্ষাদান, বিপদে আপদে বুদ্ধিদান, রোগে চিকিৎসার পথ-নির্দ্দেশ-প্রদান প্রভৃতি কাজ নিঃশুল্ক হওয়াই ত' ভারতের সনাতন চিন্তাধারার অনুগত। সুতরাং নিঃস্বার্থ ভাবে, আর্থিক আদান-প্রদানের ব্যাপার হইতে দূরে থাকিয়া, যাহারা এই সকল সৎকার্য্য করিবেন, তাহারাই ভারতে সর্ব্বজনের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাজন হইবেন। কিন্তু এইরূপ সৎকর্ম্মে কেহ প্রবৃত্ত হইলে গণমনের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা অনেক সময়ে আর্থিক আনুকূল্য-বিধান করিয়া থাকে। জন-মানসের এই অনুকূল ভাবের সুযোগ নিয়া কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াও কিছু অধিক অর্থ আদায়ের জন্য অধ্যবসায়ী হন। সম্প্রদায়-বিশেষের প্রচারক বা আচার্য্যেরা তাহা করিলে হরিভজনের অনুকূল হইবে আর অন্যেরা তাহা করিলে স্বার্থসেবার ফিকির হইবে, ইহা ভাবিতে একটু কষ্টকল্পনার প্রয়োজন হয়। কোনও মঠবাসী আচার্য্য তনুরক্ষার জন্য ছানার পায়েস খাইলে তাহা হইবে হরিভজন, আর কোনও গৃহবাসী গুরুদেব ঐ একই প্রয়োজনে খেচরান্ন খাইলে তাহা হইবে ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণ, এসব কথা

সদ্‌যুক্তিসিদ্ধ নহে। তোমরা এই সকল জটিল কুতর্কে প্রবেশ করিও না। কে কোন্ উদ্দেশ্যে মালপোয়া মারিতেছেন বা হালুয়ার থালা সাবাড় করিতেছেন, তাহা নিয়া তোমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? সৎকথা যিনি শুনাইতেছেন, তাঁহার হাঁড়ীর বা মনের খবর জানিয়া তোমার লাভ কি? তাঁর মুখনিঃসৃত অমৃতনিঃস্যন্দিনী বাণীগুলি কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করাইয়া হৃদয়ের পরতে পরতে গাঁথিয়া নিয়া পরমোল্লাসে গৃহে ফিরিবে,—ইহাতেই ত' তোমার লাভ। বরিশাল জেলার এক পল্লীগ্রামে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে একদল ডাকাত গ্রামে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থদের ঘরে দস্যুতা পূর্ব্বক তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পিঠ্‌টান দিয়াছিল বলিয়া খবরের কাগজে পাঠ করিয়াছি। এইরূপ কেহ যদি শ্রীভগবানের কথামৃত পরিবেশন করিতে আসিয়া চুরি-ডাকাতিও করেন, তবে ঐ চুরি বা ডাকাতি নিয়া মামলাবাজি করিবার তোমার পথ কোথায়? প্রকৃত ত্যাগী এবং প্রচ্ছন্ন ভোগীর বাহ্য আচরণে অনেক সময়ে পার্থক্য থাকে না। তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক যখন তোমার শুধু হরিকথা শোনার, তখন ঐ টুকু শুনিয়াই তুমি ঘরে ফির। তাঁর সৎকথা শুনানোর পশ্চাতে কতখানি ছিল ভজনানুরাগ আর কতখানি ছিল স্বার্থসিদ্ধির প্ররোচনা, তাহা নিয়া বিচারে বসিয়া সময় নষ্ট করা ভুল। যে যতটা পার, অপরের গুপ্ত জীবন এবং

সুপ্ত অভিপ্রায় নিয়া গবেষণা করা হইতে বিরত থাকিবার চেষ্টা কর। সংশোধন কর নিয়ত কেবল নিজেকে। নিজে যাহাতে কদাচ উন্মার্গগামী না হও, তার বিষয়ে সতর্ক হও। তোমার নিজ জীবনকে ভগবদ্-ভজনের দ্বারা আলোকিত ও পুলকিত করিতে হইবে, তোমার নিজ জীবনকে ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণের সহজগম্য কুপথ হইতে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। শুধু এইটুকুই পণ কর। তাহার পরে যদি মনে কখনও আশঙ্কা-বোধ জন্মে যে, অমুকের সঙ্গ করিলে, কথা শুনিলে বা মুখদর্শন করিলে এই অবাঞ্ছনীয় পাতিত্য আসিলে আসিতে পারে, তবে তাহার সংশ্রব বিনা বাক্যব্যয়ে বর্জ্জন কর।"

গোপালপুর (নোয়াখালী)
১লা কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৪২
(১৮ই অক্টোবর, ১৯৩৫)

কে কার কথা শোনে

গোপালপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে আজ প্রাতে কল্পনাতীত এক বিরাট জনসমাগম হইয়াছে। সকলেরই একান্ত আগ্রহ বক্তৃতা শুনিবেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিছুক্ষণ পরে পরে আমার রক্তোৎকাস হইতেছে, বক্তৃতা দিলে হয়ত রক্ত বমন শুরু হইয়া যাইবে। কিন্তু জনতা কিছুতেই মানিতে চাহিল না।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আচ্ছা, বক্তৃতা দেব। কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে, শেষ পর্য্যন্ত বরিশালের প্রগ্রামটা না বাতিল হ'য়ে যায়। জন্মেছি যখন, একদিন মরণ আছেই। কিন্তু অকালে মরে লাভ নেই। কারণ, কে বল্‌তে পারে যে আমি আরো চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বাঁচব না! যদিই বাঁচি, তবে কি পঙ্গু হ'য়ে, অকর্ম্মণ্য হ'য়ে, পরগলগ্রহ হ'য়ে কর্ম্মহীন নিষ্ফল জীবন-যাপন কর্ব্ব?

কে কাহার কথা শোনে? শ্রীশ্রীবাবামণিকে বেলা আট ঘটিকায়ই বক্তৃতা আরম্ভ করিতে হইল।

সৎকথা শোনারও যোগ্যতা চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বক্তৃতা দিতে হ'লে যেমন যোগ্যতা সঞ্চয়ের প্রয়োজন, দাঁড়িয়ে উঠে কতকগুলি কথা আবোল-তাবোল ব'লে গেলেই বক্তৃতা হয় না, শ্রোতা হ'তে গেলেও তেমন যোগ্যতা সঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে। সভাস্থলে ব'সে গিয়ে বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর দাড়ি-নাড়া আর হস্ত-পদের আস্ফালন দেখ্‌লেই শ্রোতা হওয়া যায় না। প্রাচীন ভারতে গুরু তাঁর শিষ্যকে বেদবাণী শোনাতেন কিন্তু শিষ্য যাতে গুরুর উপদেশগুলি নিজ স্মৃতিতে সুদীর্ঘকাল ধ'রে রাখ্‌তে পারে তার জন্য তাকে ব্রহ্মচর্য্য-পালনেও বাধ্য কত্তেন।

বিগত প্রায় এক শতাব্দী ধ'রে ভারতবর্ষে অনেক ভাল ভাল কথা ভাল ভাল বক্তারা ব'লে গেছেন। প্রশ্ন করা সঙ্গত হবে যে, আমরা তা' মনে রেখেছি কি? ভাল কথা মনে যদি লেগে থাকে সুদীর্ঘকাল, তাহ'লে তা' একদা কর্ম্মে ও অনুশীলনে রূপ পায়। রামমোহন, রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, দয়ানন্দ, শ্রীকৃষ্ণানন্দ, বিবেকানন্দ প্রমুখ ঋষিশ্রেষ্ঠেরা এত কথা ব'লে গেছেন, যার ছন্দাংশ মাত্র মনে রাখ্‌তে পারলে আমরা কৃতার্থ হ'য়ে যেতাম। কিন্তু কে কবে কি ব'লে গেছেন, তার স্মৃতিটুকু জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ মনের গায়ে কোথাও যেন আঁচড় পর্য্যন্ত কাটতে পারে নি। তার কারণ কি? তার কুফলই বা কি? এই কথাগুলি আমাদের ভাবতে হবে। হিসাব করতে গেলে দেখা যাবে, গঙ্গার যত জল এক শতাব্দীতে সাগরে গিয়ে পড়েছে, মহতের শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে আমাদের কাণের ফুটো দিয়ে ঢুকেছে আর বের হ'য়ে গেছে কিন্তু কিছুই আমরা মনে রাখতে পারিনি। রাখতে পারিনি এই জন্য যে, আমরা ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় উদাসীন। সৎকথা হাজার বার বল্‌তেও দোষ নেই কিন্তু মনেই যদি না রাখি, তবে যাঁরা বলেন, তাঁদের ব্যর্থ শ্রম যে কত্তে হয়, এই কথাটা প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত। আমি ত' এক এক সময়ে অতীব গুরুতর পীড়িত শরীরেও ভাষণ দিয়ে থাকি, শ্রোতারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে

শুন্‌তে কখনো কার্পণ্য বা অনুদারতা দেখান নি, কিন্তু অতখানি সময় যে এক জায়গায় স্থির হ'য়ে বসে থাকা, তাও তারা ক্লেশকর মনে করেছেন। এগুলি ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেরই কুফল।

আমার বাক্য শুনিতে হইবে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সুতরাং কথা যদি বলতে হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্য বিষয়েই বলা উচিত। আর, কথা যদি শুনতে হয়, তবে ঐ ব্রহ্মচর্য্য-বিষয়েই শোনা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্প করা উচিত যে, এই কথাগুলির অনুযায়ী সৎজীবন আমরা যাপন কর্ব্ব। আমি কিন্তু সুনিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে কাজ ক'রে যাচ্ছি যে, আজ যদি তোমরা আমার কথা না শোন, না মান, না গ্রাহ্য কর, কাল তোমাদের শুনতেই হবে, মান্‌তেই হবে, গ্রহণ কত্তেই হবে, বরণ ক'রে নিতেই হবে। জগতের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলকে লক্ষ্য রেখে আমি আমার প্রতিটি চিন্তা কচ্ছি, প্রতিটি বাক্য বলছি, প্রতিটি কর্ম্ম কচ্ছি। আমার জীবনের আর কোনও অভীষ্ট নাই, আর কোনও লক্ষ্য নাই। আজ যে আমার কথায় কর্ণপাতও কচ্ছে না, তিন শতাব্দী পরে হ'লেও তাকে আমার উপদেশ নিতে হবে, আমার নির্দ্দেশ পালন কত্তে হবে। কারণ, এই উপদেশ শুধু আমার নয়, এই উপদেশ ভারতের প্রাচীন ঋষির তপঃ-সিদ্ধির প্রথম দিনটী থেকে এ

দেশের আকাশ-বাতাসকে মথিত কচ্ছে শুধু জগৎকল্যাণের জন্য। আমি দল চাই না, সম্প্রদায় চাই না, কর্ত্তৃত্ব, নেতৃত্ব, মহত্ত্ব বা গুরুত্ব কিছুই চাই না,—আমি চাই নিখিল ভুবনের নিঃশ্রেয়স কল্যাণ।

আমাদের জীবন জগৎকল্যাণের জন্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবন ধারণ কর্ব্ব আমরা বিশ্ববাসীর সামূহিক কুশলের জন্য, নিজের স্বার্থে নয়, স্বকীয় সুখ-সম্পাদনের জন্য নয়, তুচ্ছ ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য নয়। তপস্যা কর্ব্ব আমরা সমগ্র জগতের মুক্তির জন্য, একার মুক্তির জন্য নয়। জীবনের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে জগৎকল্যাণের ব্রত ও সঙ্কল্পের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত ক'রে আমরা বিশ্বের প্রত্যেক প্রাণীকে আমাদের আপন কর্ব্ব। ভালবাসাই হবে আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সাধনা। প্রেম, প্রীতি, সমতা, মমতা, আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতা হবে আমাদের জীবন-পথের নির্দ্দেশক।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাতে এমন মহদ্‌ব্রতে আমাদের নিষ্ঠা অটুট থাকে, যাতে আমাদের পদস্খলন না হয়, তারই জন্য আমাদের প্রয়োজন ভগবানকে। তাঁর চরণে শক্ত খুঁটি বাঁধতে পারলে মানুষ সহজে বেতালে চলে না, বেতালে পা

ফক্কে গর্ত্তে প'ড়ে হাত পা-শরীরের অস্থিভঙ্গ ঘটায় না। যাঁরা বলেন,—ভগবান নেই, তাঁদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ বাঁধাবার দরকার নেই। তাঁরা তাঁদের পথে চলুন। বিরুদ্ধতা দিয়ে বা সমালোচনা ক'রে তাঁদের পথ-বিঘ্ন উৎপাদনের আমাদের আগ্রহ নেই। কিন্তু আস্তিক বা নাস্তিকের কোনও বিচার না ক'রেই বিশ্ববাসী সকল মানবের কুশলার্থে জীবনদানের যোগ্য হবার মতন তপশ্চর্য্যা আমরা ক'রে যাব। এইটীই আমাদের হোক্ ব্যক্তিগত লক্ষ্য, এইটীই হোক্ আমাদের সামূহিক যাবতীয় অধ্যবসায়ের চরম উদ্দেশ্য।

বক্তৃতা দেড় ঘণ্টাকাল হইল।

দীক্ষাদানে ভদ্রতা

কয়েকটী ভদ্রলোক ও মহিলা দীক্ষা নেবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এটা শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রম। এখানে আমি অন্য ভাবের একটা দীক্ষা দিয়ে কারো ভাবভঙ্গ কত্তে পারি না। আমার মত ও পথ নির্ব্বিরোধ হ'লেও আমি শ্রীরামকৃষ্ণপন্থী যে নই, এটা সবাই জানে। তোমাদের শত আগ্রহ থাক্‌লেও আমি ভদ্রতার নিয়ম লঙ্ঘন কর্ব্ব না। সুজনতার দিকে তাকাতে গেলে আমি এই আশ্রমে ব'সে কাউকে আমার দীক্ষা দিতে পারি না। আরো শোন। এই আশ্রমে অবস্থান কালে লোকে আমাকে যে প্রণামীর

টাকা দিয়েছে, সব আমি এই আশ্রমেই দান ক'রে শূন্য হস্তে গ্রামান্তরে যাচ্ছি। কারণ, আমার ভদ্রতার শাস্ত্র আমাকে এরূপ কর্ত্তেই নির্দ্দেশ দিচ্ছে।

বেলা বারো ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি পৌঁছিলেন জিরতলী গ্রামে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ভট্ট মহাশয়ের বাড়ীতে।

সাধু-দর্শনে ফল

জিরতলীতে জনৈক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধুসন্দর্শনে মনে বিমল ভগবদ্‌ভক্তির উন্মেষ হয়, ফলে চঞ্চল মন শান্ত হয়, দুর্ব্বল মন সবল হয়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত ও লক্ষ্যহীন মন একাগ্র হয়।

সাধু-দর্শনে যাইবে কি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সন্দিগ্ধ বা অবিশ্বাসী মন নিয়ে সাধু-দর্শনে যেতে নেই। তার কারণ এই যে, ঐরূপ দর্শনে তোমার চিত্তের কোনো উৎকর্ষ সাধিত হবে না, হবে না মনের কোনো প্রসার। কিন্তু বিশ্বাসী মন নিয়ে গেলেও অনেক সময়ে সাধু নামে পরিচিত ব্যক্তিদের ব্যবহারে অথবা যাঁরা নিয়ত তাঁদের ঘিরে বসে থাকেন দুর্গ-প্রাকারের মতন নিরেট হ'য়ে, তাঁদের দুর্ব্বাক্যে বা উচ্ছৃঙ্খলতায় দর্শনার্থীদের বিমল ভক্তিও বিচলিত হয়ে থাকে। এমন সব অবস্থায় সাধুদর্শনে

তুমি যাবে কি যাবে না, সেই বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের তোমার অধিকার আছে।

সাধু-দর্শনে কি আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সকারণেই হোক্ আর অকারণেই হোক্ অনেক সাধুর প্রচুর দুর্নাম থাকে। সকারণেই হোক্, আর অকারণেই হোক্, অনেক সাধুর দিগ্‌দিগন্তব্যাপী সুযশও থাকে। তাঁদের অপযশ বা সুনাম যেন তোমাকে আকৃষ্ট না করে। সাধু-দর্শনের ফলে তোমার হয়ত চিত্তশুদ্ধি ঘট্‌বে, এই আশাটুকু নিয়েই সাধু-দর্শনে যাওয়া উচিত। তিনি অপুত্রককে পুত্র দেবেন, লটারির পুরস্কার জিতিয়ে দেবেন, স্বামী বা স্ত্রীকে বশীভূত ক'রে দেবেন, ইন্দ্রজাল দেখিয়ে তাক্ লাগিয়ে দেবেন, মোকদ্দমায় জিতিয়ে দেবেন, এই সব প্রত্যাশা নিয়ে সাধু-দর্শন একেবারেই বোকামি।

সাধু দর্শন সম্পর্কে শাস্ত্রীয় সংস্কার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধু-দর্শন সম্পর্কে এদেশের শাস্ত্রীয় সংস্কার এক চমৎকার জিনিষ। প্রকৃত মহাপুরুষের

বত্রিশটী সুস্পষ্ট লক্ষণ আছে। মহাপুরুষের ভিতরে জগতের সকল মহৎ গুণসমূহই শুধু বিরাজ করে না, প্রত্যেকটী গুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও তার সঙ্গে বিরাজ করেন। অর্থাৎ, এ যেন এক প্রকারের বিশ্বরূপ দর্শন। শ্রীকৃষ্ণের নাকি পঞ্চাশটী অভাবনীয় সদ্‌গুণ ছিল। মহাপুরুষগণের দেহে সেই সবগুলি গুণ একাধারে প্রকাশমান হয়। গুণদর্শনই যাহার স্বভাব, তেমন ভাগ্যবান ব্যক্তি ঊনগুণ বা নির্গুণ ব্যক্তির মধ্যেও বিশ্বের যাবতীয় গুণের সমাবেশ দেখ্‌তে পায়। সাধু-দর্শনের যোগ্য মনোভঙ্গী কিন্তু ঠিক তাই।

সাধুদর্শনে প্রত্যাশা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবৎ-প্রেমের হ'ল না এক কণা স্ফুরণ, লোক-কল্যাণের এল না এক রতি অনুরাগ, কেবল কতকগুলি বড় বড় কথা শুনে আর ব'লে এলাম, এর নাম সাধুসঙ্গ নয়। সাধু-দর্শনের ফলে বেদ-শাস্ত্র না প'ড়েও তোমার বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির বিকাশ হবে। সাধুদর্শনের ফলে প্রশ্ন না ক'রেও অধিকাংশ সময়ে তুমি তোমার জীবনের দুরন্ত সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবে। সাধুসঙ্গের ফলে মরণশীল জীবও নিজেকে অতিমর্ত্ত্য অমর পুরুষ ব'লে উপলব্ধিতে পেয়ে যাবে। সাধুদর্শনে সর্ব্বজীবের প্রতি তোমার প্রেমবুদ্ধি জাগ্‌বে। সাধুদর্শন তোমাকে নির্লোভ, নিষ্কাম, জিতেন্দ্রিয় ও মিতাচারী

কর্ব্বে। সাধুদর্শন সম্পর্কে চিরকাল হিতকামী মানুষের এইটাই প্রত্যাশা।

সাধু কে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবৎ-প্রীতার্থে যাঁর জীবনের অধিকাংশ কর্ম্ম, তিনিই সাধু। যিনি অত্যুচ্চ উন্নতিতে আরোহণ ক'রেও নিজের জীবনের আচারে ও আচরণে সদাচার থেকে ভ্রষ্ট হন না, তিনি সাধু। যাঁর সংসর্গে মানুষের ইন্দ্রিয়-নিচয়ের বহির্ম্মুখ চপলতা আস্তে আস্তে অন্তর্মুখ গতি পায়, তিনি সাধু। এমন সাধুর সংখ্যা জগতে যত বাড়্‌বে, জগতের ততই মঙ্গল।

গোপন কথা

গোপালপুরে শ্রীশ্রীবাবামণি ভিন্নতর এক সম্প্রদায়ের ভক্তদের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া সেখানে কোনও দীক্ষার্থীকে দীক্ষা দান করেন নাই, সকলকেই বিমুখ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন জেলা হইতে আগত দুইটী মহিলা তাঁহাদের স্বামীদের সহ গোপালপুরে আসিয়াছিলেন এবং অদ্য পুনরায় তাঁহারা দীক্ষা না নিয়া ছাড়িবেন না এবং তাঁহাদের দুই জনেরই দুইটী অতীব গোপনীয় বক্তব্য রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীলোকদের সহিত আমি কদাচ

কোনও গোপনীয় বিষয়ে আলোচনা করি না। এটা আমার নিয়ম। এই নিয়ম ভঙ্গ করা চল্‌বে না।

অগত্যা মহিলারা নিজ নিজ স্বামীর সমক্ষে বসিয়া কথা কহিতে সম্মতা হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামীর কাছে স্ত্রীর জীবনের কিছুই গোপন থাকা উচিত নয়। স্ত্রীর কাছেও স্বামীর জীবনের কিছু গোপন থাকা অসঙ্গত। স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর্ত্তে না পার্লে গার্হস্থ্য জীবন থেকে সুখ, শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দের আশাকে নির্ব্বাসন দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের মধ্যে ক্ষমার শক্তিও সীমাহীন হওয়া প্রয়োজন। নতুবা একজনের জীবনের গোপন কথা অন্য জনের জীবনে মৃত্যু-যাতনার সৃষ্টি কত্তে পারে।

কিন্তু স্বামীরাই ইচ্ছা করিয়া একটু দূরে সরিয়া বসিলেন।

আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, সত্য সত্যই মহিলা দুইটীর জীবনে মারাত্মক গোপনতা উৎপাত করিতেছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুই জনেরই মানসিক যাতনার প্রকৃতি এক। ততোধিক আশ্চর্য্য এই যে, ইহারা দুই জনেই স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া দুই ভিন্ন জেলা হইতে গোপালপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে আসিয়া উপনীতা হইয়াছেন এবং ইহারা পরস্পর পরস্পরের অপরিচিত।

প্রথমা মহিলা নিঃসন্তানা। সন্তান লাভের আশায় সাধু, সন্ত, ডাক্তার, কবিরাজ, ওঝা, ফকীর আদির কাছে ঘুরিতে ঘুরিতে একটী মধুভাষী অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকের হাতে পড়িলেন। লোকটী নানা রূপ ঔষধাদি প্রদান প্রসঙ্গে মহিলাটীর বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরশীলতা অর্জ্জন করিল এবং একদিন সহসা বলাৎকার করিয়া বসিয়া বলিল,—"তোমার স্বামীর সন্তান-জননের ক্ষমতা নাই বলিয়া আমিই তোমাকে সন্তানবতী করিয়া দিলাম, এখন ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সংসার কর। তবে সাবধান, স্বামীকে একথা বলিও না।" মহিলাটীর অন্তরে অনুতাপের দাবানল জ্বলিয়া উঠিল কিন্তু হায়, তখন আর প্রতিকারের কোনও পথ নাই।

দ্বিতীয় মহিলা সন্তানবতী সাধ্বী-পত্নী। পশ্চিম দেশ হইতে একজন দশ মণ ওজনের দেহধারী বিরাটকায় নাগা সাধু বছর বছর তাঁহাদের অঞ্চলে আসিয়া থাকে। সাধু স্বপাক আহার করে। অন্যের তৈরী খাদ্য খায় না। ভারতের অনেক সুবিখ্যাত ব্যক্তি তাহার শিষ্য বলিয়া সে প্রচার করিয়া থাকে এবং বচন-চাতুরীতে বর্ণনা বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়াও লোকে মনে করে। তাহার রান্না তৈরীর সময়ে একটীর বেশী লোককে রন্ধনে সাহায্য করিবার জন্য কাছে থাকিতে দেয় না। সেই একটী মাত্র সাহায্য-কারী ব্যক্তি স্ত্রীলোক হইলেও তাহার আপত্তি নাই। দৈনিক প্রাতরাশ সমাপনের জন্য এই সাধুর

দশ সের দুগ্ধ প্রয়োজন হয়। খাদ্য-তালিকা নিরামিষ হইলেও পরিমাণ গন্ধমাদন-তুল্য। গ্রাম্য সাধারণ অশিক্ষিতা স্ত্রী-লোকেরা এই ভোজনৈশ্বর্য্যকেই এক অসাধারণ যোগ-বিভূতি মনে করিয়া ভক্তিতে গদগদ হইয়া সাধুর চরণ-পূজা ও চরণ-সেবা করে। দ্বিতীয়া মহিলার গৃহে আসিয়া সাধুটী সকলকে দীক্ষা দিল, তিন চারিদিন বাস করিল। মহিলাটী নিজেই সাধুর ভোজ্য-পানীয় তৈরী করার কাজে সহায়তা করিবার জন্য নিরামিষ রান্নার ঘরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন স্বামী অন্য গ্রামে গিয়াছেন, বাড়ীতে ও বাহিরে লোকজন নাই, এই অবসরে একাকিনী পাইয়া বর্ব্বর সাধু মহিলাটীর সতীত্বে আঘাত করিল। দশ সের দুগ্ধ পান করিতে করিতে পাপিষ্ঠ আশ্বাস দিয়া কহিল,—'বেটি, তোর চতুর্দ্দশ পুরুষের মহাভাগ্য যে আমার মতন মহাপুরুষ তোর সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র করিয়া দিল। কিন্তু সাবধান, স্বামীকে একথা বলিস্ না। বলিলে নির্ব্বংশ হইবি, বলিলে তোর একটা ছেলে বা একটা মেয়েও আর ধরাধামে বাঁচিয়া থাকিবে না।'—আরম্ভ হইল অন্তর্জ্জ্বালা।

বলাৎকারের প্রতীকার কেন হয় না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গ্রামের যুবকদের কর্ত্তব্য ছিল এই লম্পট চিকিৎসককে দোকানপাট সহ ভিন্ন গ্রামে তাড়িয়ে

দেওয়া। গ্রামবাসীদের উচিত ছিল, এই সাধু-নামধারী দুর্ব্বৃত্তকে পিঠমোড়া বেঁধে পুলিশে চালান দেওয়া। কিন্তু গোপনতাই সব কাজের বিঘ্ন ঘটাল। আর, মেয়ে দুটো এমন ঘটনা স্বেচ্ছায় প্রকাশ করেই বা কি ক'রে? সমাজ যে অসহিষ্ণু। ঐ ডাক্তারের বা ঐ সাধুর হয়ত দুদিনের জন্য পসার একটু কমবে, তারপরে সমাজপতিরা এদের দুষ্প্রবৃত্তির কথা আস্তে আস্তে ভুলে যাবে বা ক্ষমা কর্ব্বে কিন্তু ঘটনা সব জান্‌তে পারলে মেয়ে দুটোকে বনবাসে না পাঠিয়ে ত' সমাজ আর তুষ্ট হবে না। প্রতীকার এই জন্যই হয় না।

শ্রীশ্রীবাবামণি স্বামী দুইটীকে ডাকাইয়া নিজের একেবারে কাছে আনিয়া বসাইয়া বলিলেন,—এই মেয়েদের পাপ আমি আমার নিজের শিরে ধারণ কর্ব্ব। আমি এদের দীক্ষা দিয়ে সর্ব্বপাপ থেকে ত্রাণ কর্ব্ব। কিন্তু তোমরা দুজনে আগে বল যে, তোমরা এদের ক্ষমা ক'রে নেবে কিনা, তোমরা দুজনে এই দুইটী সরলা বধূর অনিচ্ছাকৃত দুষ্কৃতিকে ভুলে যেতে পার্ব্বে কিনা। আমি উদার, তোমরাও উদার হও।

স্বামীদ্বয় নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। একজনের চক্ষু বাহিয়া অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

পাপের প্রকৃতি ও সর্ব্বপাপ হরণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পাপ দ্বিবিধ। স্বেচ্ছাকৃত আর

অনিচ্ছাকৃত। স্বয়ংকৃত পাপ গুরুতর, অপরের চাপে প'ড়ে করা পাপ তার তুলনায় লঘুতর। জ্ঞানকৃত পাপ আর অজ্ঞানকৃত পাপ কখনো সমভাব হ'তে পারে না। পুরুষের শুক্রের সহায়তা ছাড়া নারীর গর্ভাধান হয় না এবং সেই শুক্র আবার প্রাণময় হওয়া চাই। একথা জেনেও একটা পুরুষ ডাক্তারের কাছে নিজ স্ত্রীকে বারংবার একাকিনী যেতে যে মূর্খ স্বামী প্ররোচিত করে, স্ত্রীর হঠাৎ-পাতিত্য ঘট্‌লে ত' অভিযোগ করার কিছু নেই। লোকটা সৎ, না অসৎ, জিতেন্দ্রিয়, না লম্পট, তার কোনো ঠিকানা না জেনেই সারা গোষ্ঠী-বরাদ্দে সকলে মিলে কেবল দেহের দশ মণ ওজন আর পানীয়ের দশ সের বহর দেখেই দীক্ষা নিয়ে ফেলে, তাদের ঘরে এমন বিপদ এলে স্ত্রীলোকটার ওতে অপরাধ কোথায়? বল্‌বান্ পাষণ্ড দুর্ব্বলা নারীকে কাবু করেছে গায়ের জোরে। এতে নারীর অপরাধ কি?

দুইটী স্বামীই এখন কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওঠ। ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিহার কর। যাও, স্নান ক'রে এস। এখনি আমি তোমাদের চার জনকে দীক্ষা দেব আর তোমাদের দেহ মনের জ্ঞাত, অজ্ঞাত, স্মৃত, বিস্মৃত, ছোট, বড় সব পাপ নিজে গ্রহণ কর্ব্ব। একটী মাত্র সর্ত্ত। তোমাদের জীবন ধারণ এখন থেকে হবে জগতের মঙ্গলের জন্য। এই একটী ব্রতই আমার কাছে

দীক্ষা গ্রহণের চূড়ান্ত দায়িত্ব। মানুষের যে-কোনও গুরুতর পাপ হরণের আমার ক্ষমতা আছে।

সন্ধ্যার সময়ে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ভট্ট মহাশয়ের বাড়ীতে আরতি কীর্ত্তন প্রভৃতির বিরাট সমারোহ হইল। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি অদ্য বক্তৃতা দিলেন না।

জিরতলী (নোয়াখালী)

২রা কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৪২

(১৯শে অক্টোবর, ১৯৩৫)

নূতনদের ডাকো

ঢাকা-জেলান্তর্গত আমিনপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে দীক্ষা দ্বারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে স্বধর্ম্মান্তরিত করিবার প্রথা আছে, তাহাদের ধর্ম্মান্দোলনগুলির বিস্তারের ইতিহাসকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে এই একটী ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে, নবদীক্ষিতেরাই যেন প্রায় সর্ব্বসময়ে ধর্ম্মবোধকে একটা ধর্ম্মোন্মাদনায় পরিণত করিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মকে বিস্তারিত করিবার জন্য সব চেয়ে কঠোর উদ্যম ও কঠিন অধ্যবসায়কে প্রয়োগ করিয়াছে। তোমরাও ত' ভাব-প্রচারের কালে নূতনদের সংস্পর্শে আসিতেছ। তাহাদিগকে উৎসাহ-পূর্ব্বক কর্ম্মে

নিয়োজিত করিয়া দিবার চেষ্টায় তোমরা কেন পরাঙ্মুখ থাকিতেছ? নবাগতদিগকে বিশ্বাস কর, তরুণদের উপরে আস্থা ন্যস্ত কর, যুবকদের হাতে কাজ তুলিয়া দাও, নবীনদিগকে প্রবীণদের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে সমান তালে বা দ্রুততর তালে চলিবার জন্য উৎসাহ দাও। তরুণ আর কচি-কাঁচাদিগকে নিয়া কবিতা লিখিলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যাইবে না। তাহাদের জন্য নিত্য নূতন কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য কোদাল হাতে আমাদের প্রতিজনের মাঠে নামিয়া পড়িতে হইবে। ভাল ভাল কথা রচনা করিয়া আমরা পত্র-পত্রিকার অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিব বা ভাল ভাল পুস্তক রচনা করিয়া আমরা দেশের সাহিত্যিক সমৃদ্ধি বাড়াইব, তার চেয়েও বড় কাজ হইতেছে ক্ষেত্রে নামিয়া তরুণদিগকে ক্ষেতের কাজে হাত পাকাইতে বাধ্য করা। উপদেশ যত মধুরই হউক, ততটা প্রেরণা দিতে পারে না, দৃষ্টান্ত যতটা পারে। এই দেখ আমি কাজ করিতেছি, এই দেখ আমি দীন-দুঃখী-দরিদ্রের হাতে হাত মিলাইয়া, কাঁধে কাঁধ মিশাইয়া জীবনের জয়যাত্রা শুরু করিয়াছি, এস কে কোথায় আছ তরুণ, কিশোর, কচি ও কাঁচা মালকোছা মারিয়া আমারই সাথে কাজে নামিয়া পড়,—এই কথারই আজ প্রয়োজন। দুঃখী মানুষের সঙ্গে এক শান্‌কীতে বসিয়া যাহারা অন্নপান গ্রহণ করে নাই, দুর্গত মানুষের ছিন্ন কন্থার

আড়ালে নিজের দেহকে শীত, বর্ষা ও মশক-দংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্য যাহারা চেষ্টা করে নাই, শতছিদ্রযুক্ত খড়ের ঘরে শয্যা পাতিয়া যাহারা নিরন্নের সঙ্গে উপবাস-ক্লেশ ভাগ করিয়া ভোগ করিবার চেষ্টা করে নাই, তাহাদের কথায় কেহ কদাচ কর্ণপাত করে না। তোমরা কাজে নাম এবং নূতনদের কাজে নামাও।”

চরিত্রান্দোলন ও দেশের অর্থনীতি

২৪-পরগণা অন্তর্গত দক্ষিণ-গড়িয়া গ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“কন্যাগুলির বিবাহ হইবে না, পুত্রগুলি বেকার বসিয়া রহিবে, মালিকেরা প্রাপ্য টাকা চুকাইয়া দিবে না, কোথাও কোনও প্রকারের উপার্জ্জনের রাস্তা উন্মুক্ত দেখা যাইবে না, অথচ হুড়মুড় করিয়া দিনের পর দিন অত্যাবশ্যক খাদ্যপণ্যের মূল্য বর্দ্ধিত হইতে হইতে আকাশ স্পর্শ করিবে,—এমন দুর্দ্দিন এখন কল্পনা করিতেও পারিতেছ না। কিন্তু মহৎ মানুষেরা চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া সাধারণ মানুষের ভিতরে ব্যাপক ভাবে সংযম, সদাচার, নির্লোভতা, অল্পে তুষ্টি, অতি সঞ্চয়ে অবহেলা এবং মানবসেবার আগ্রহকে সৃষ্ট এবং পুষ্ট করিবার

চেষ্টায় নামিয়া না গেলে ইহাই হইবে এই সুবিধাবাদী জগতের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক পরিণতি। চরিত্র-সংযমের সহিত, আত্মগঠনের সহিত, ইন্দ্রিয়-দমনের সহিত, নরনারীর সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ককে সুশালীন রাখিবার ঐকান্তিক চেষ্টার সহিত দেশের অর্থনৈতিক উঠা-পড়ার যে বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা দেশবাসী বিজ্ঞ ব্যক্তিদের চোখে না পড়িলেও আমরা নিত্য খোলা চক্ষে তাহার কত কত দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। পরনারী যাহাকে পোষণ করিতে হইবে, সে স্বাভাবিক আয়ে সংসার চালাইতে পারে না। মদ্যপানের অভ্যাস যাহার মজ্জাগত, সে বিপুল আয়ের সুযোগ সত্ত্বেও নিজ সমৃদ্ধিকে বন্যার জলে ভাসাইয়া দিতে বাধ্য হয়। আমরা যে সচ্চরিত্রতার আন্দোলন করি, পরিণামে তাহা দেশের অর্থনৈতিক হিতসাধনও যে করিতে সমর্থ, এই বিষয়ে আমার ধারণা অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং সুস্পষ্ট।”

কলহ বর্জ্জন করিও

বরিশাল জেলান্তর্গত শোলক-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“কলহ-বর্জ্জিত সংসারে উন্নতি হয় তাড়াতাড়ি। যেখানে ঝগড়া-কলহ আছে, লোক-প্রবাদ এই যে, সেখান হইতে ভাগ্যলক্ষ্মী সভয়ে পলায়ন করেন। উক্তিটা মিথ্যা নহে।

কলহের ঘরে তুমি কলহই আগে করিবে, না অন্য কর্ত্তব্য আগে সম্পাদন করিবে, ইহার ভাগ্য-বিধাতা তুমি নহ,— কলহই তোমার গতি, বুদ্ধি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া চলিবে। আমি আমার মন্ত্রশিষ্যদিগকে নিয়তই বলিয়া থাকি,— 'তোমরা যেখানে দুজন সমধর্ম্মী আছ, সঙ্গে সঙ্গে একটী অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন কর এবং তোমাদের সঙ্গে আমারও জন্য একটী আসন রাখ। ব্যস, আমরা তিন জন হইয়া গেলাম। এখন সমবেত উপাসনা চলিতে আর বাধার কিছু নাই। কিন্তু মণ্ডলীতে কলহ থাকিলে আমার আসন শূন্যই পড়িয়া থাকে, আমি সেখানে যাই না।' এযাবৎ মণ্ডলী খুব অল্প স্থানেই গঠিত হইয়াছে। কিন্তু যে যে স্থানে গঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সেই সকল মণ্ডলীই সত্য সত্য লোকশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, তাহারাই জনহিত-সম্পাদনে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেছে, যাহাদের মধ্যে কলহ নাই। বিহারীরা বাঙ্গালীদের মত আত্মকলহে পটু নহে। তাহার প্রত্যক্ষ সুফল লক্ষ্য কর। বাঙ্গালী হইলে যিনি রাজনৈতিক জগতের আত্মকলহে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সাধারণ মানুষদের ভিড়ের আড়ালে মুখ লুকাইতে বাধ্য হইতেন, বিহারীদের মধ্যে আত্মকলহ তেমন নাই বলিয়া তিনি দেখিতে না দেখিতে সমগ্র ভারতের মধ্যে পরমপূজ্য ও গৌরবস্বরূপ হইয়াছেন। কলহপ্রিয়তার দোষ

এবং কলহহীনতার গুণ ইহা দ্বারা উপলব্ধি কর। কলহ-বর্জ্জিত সমাজে প্রত্যেকের পূর্ণ প্রতিভায় বিকাশের প্রকৃষ্ট সুযোগ ঘটে এবং কলহ-পরায়ণ ব্যক্তি বা জাতি-সমূহ আত্মকলহ করিয়া নিজেদের শক্তি ও প্রতিভার অপচয় করে। তোমরা যখন সমাজ-কল্যাণের কাজেই নামিতে চাহিতেছ, তখন চেষ্টা রাখিও যেন প্রতিপদে বৃথা-কলহ বর্জ্জন করিয়া চলিতে পার। পরধর্ম্মের প্রতি আক্রোশের ভাব নিয়া যাহারা নিজ ধর্ম্ম প্রচারে আগ্রহী, তাহারা অনেক সময়ে অকারণ-কলহের কারণ সৃষ্টি করে। ভিন্ন রাজনৈতিক সঙ্ঘের প্রতিপত্তি নাশ করিবার জন্য যাহারা সত্য, অহিংসা ও সুবিচারের পথ পরিহার করিয়া চলে, তাহারা দীর্ঘস্থায়ী কলহের বীজই বপন করে। এই সকল দেখিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, যেখানে কলহ আছে, সেখানে যাইব না। যাহারা কলহ করে, তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিব না। অগ্নিপিণ্ড করতলে ধারণ করিয়াও উহু না বলিবার আমার সাহস আছে, কিন্তু কলহে জরাজীর্ণ হইয়া জীবন্তে মৃতের সামিল হইতে আমার রুচি নাই। প্রত্যেকে কলহকে কালান্তক যমের মতন অপ্রার্থনীয় জ্ঞান করিয়া বর্জ্জন করিও। কি ধর্ম্মে, কি সামাজিক জীবনে, কি পারিবারিক কাজে, কি রাজনীতিতে, সর্ব্বত্রই কলহ-সম্ভাবনা দূরে রাখিয়া কাজ করিতে পারাই প্রকৃত কর্ম্মকুশলতা।”

সবলতার উৎস

বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত কালনা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দুর্ব্বলেরা জয়ী হয় তখন, যখন তাহারা ঐক্যবদ্ধ হয়, যখন তাহারা ঐক্যের অনুশীলন করে, যখন তাহারা একে অপরকে বিশ্বাস করে, একের ন্যস্ত বিশ্বাস অপরে প্রাণ দিয়া রক্ষা করে। ঐক্য লাভের অন্যান্য সদুপায়ের সহিত আমাদের প্রবর্ত্তিত সমবেত উপাসনাকে একটী শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করিতে পার। দুর্ব্বলকে সবল করিবার জন্য পৃথিবীতে মানুষ অনেককাল ধরিয়া কাজ করিতেছে। সমাজ গড়িয়া বাস করার প্রথাটী মানুষের সবল হইয়া চলিবারই প্রয়াস হইতে জাত। যতই বলশালী হউক, একাকী একটী মানুষ কতটুকু বল ধরে? আত্মাভিমানের প্রাচুর্য্য ঘটিলে মানুষ একাকী থাকিতে চাহে কিন্তু কতক্ষণ সে বিরুদ্ধ পরিবেশের সহিত লড়াই করিয়া বাঁচিতে পারে? সকলের সঙ্গে কি করিলে সহজে মিলিতে পার, সকলের সহিত কি ভাবে সরল সহজ আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করিতে পার, তাহার উপায় প্রতি জনে অতি দ্রুত অনুসন্ধান কর। জন্মে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায় জীবিকায়, আর্থিক অবস্থায়, বয়সে ও যোগ্যতায় মানুষে মানুষে চিরকালই পার্থক্য থাকিবে। কারণ, ইহা স্বাভাবিক। সব মানুষ কদাচ একই দিনে একই তিথি-নক্ষত্রে জন্মিবে না।

সব মানুষের মেধা ও প্রতিভা, মস্তিষ্কের বিচিত্র কার্য্যকারিতা, উদ্ভাবনী শক্তি কদাচ সমান হইতে পারে না। শিক্ষার সমান সুযোগ পাইলেও, একই শিক্ষকেরা একই বিষয়-সমূহ শিক্ষাদান করিলেও প্রত্যেকের বিদ্যা সমান হইতে পারে না। সব মানুষ একই উপায় অবলম্বনের দ্বারা অন্নার্জ্জন করিবে না। নানা অন্নার্জ্জন-পন্থা নানা জনকে নানা সময়ে নানা কারণে গ্রহণ করিতে হইবে। ধনসাম্য বিধান করিয়া প্রত্যেক মানুষের পকেটে সমান অর্থ রাখিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিবার পরেও দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন লোকের জীবনে উপায় ও আরামের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। সব মানুষের কখনো সমান বয়স হইবে না, সমান যোগ্যতাও না। এই বৈষম্যগুলি যাহাতে পৃথিবীতে দীর্ঘকাল না বিদ্যমান থাকিতে পারে, মনীষী ও মনস্বী পুরুষেরা তাহার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয়ে বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন এবং সাধারণ মানুষের মনও দিনের পর দিন এই দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু যে বৈষম্যগুলি স্বভাব-জাত বা স্বাভাবিক, সেগুলি অল্প হউক বা অধিক হউক, চিরকালই থাকিয়া যাইবে। এই দুঃখটুকু হইতে মানবজাতিকে বাঁচাইবার জন্যই আমাদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দেওয়া। নিজেকে খাটো করিয়া আনিয়া ছোট করিয়া নিয়া অপর সকল সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশাইয়া নিজের প্রাণের পরশটী

তাহার হৃদয়ে বুলাইয়া দিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, সে আর আমি সমান, এক এবং অভিন্ন। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন যখন এই কাজটী করিতে সমর্থ হয়, তখন সেই আন্দোলন সত্যই সার্থক। ধর্ম্ম যখন এই কাজটী করিতে সমর্থ হয়, তখন ধর্ম্ম সত্যই জগতের পরমা শান্তির বিধাতা। ধর্ম্ম তখন মানবের জীবনেচ্ছা, জয়িষ্ণুতা ও ত্যাগস্পৃহাকে বাড়াইয়া চলে। ইহারাই শক্তির উৎস, ইহারাই শক্তির আকর। সকলকে সমান জানিয়া পরস্পর মিলিত হও। কে বড়, কে ছোট, এই তর্কে প্রবেশ না করিয়া, সকলে সকলের সমান হইবার চেষ্টা কর। একই রণক্ষেত্রে সকল সৈনিকই সেনাপতি হইতে পারে না, কিন্তু একলক্ষ্যতার মহিমায় সকলে সকলের সঙ্গে একাত্ম হইতে পারে। এই একাত্মতাই মহাবলের মমতাময়ী মাতা। দুর্ব্বল বলিয়াই তোমরা বারংবার স্খলিতপদ, স্খলিত-ব্রত, স্খলিতলক্ষ্য ও বুদ্ধিবিভ্রষ্ট হইতেছ। দুর্ব্বলের চঞ্চলতা বেশী। সবলেরা চঞ্চলতাকে চরণে চাপিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলে। সবলতা সঞ্চয়ের জন্য এখন প্রয়োজন মিলনের কৌশল আয়ত্ত করা।”

ত্যাগ ও চিত্তশুদ্ধি

একটী যুবক প্রশ্ন করিল,—বাবামণি, ত্যাগ আসে কি ক’রে? ইচ্ছা আছে সৎকাজে ত্যাগ স্বীকার কত্তে, কিন্তু পেরে উঠি না। কেন পারি না?

শ্রীশ্রীবাবামনি বলিলেন,—ত্যাগ আসে চিত্তের শুদ্ধতা থেকে, ত্যাগে রুচিই ত্যাগের প্রকৃত সামর্থ্য। চিত্ত শুদ্ধ না হ'লে ধন-সম্পদ প্রচুর থাকা সত্ত্বেও ত্যাগে রুচি আসে না। দাতার চিত্তের শুদ্ধতাই তার ত্যাগের বা ত্যাগশক্তির প্রথম সর্ত্ত। ত্যাগ আসে বিমল সহানুভূতির ফলে। অশুদ্ধচেতার প্রাণে কদাচ এই নিঃস্বার্থ সহানুভূতির জন্ম হয় না। সুতরাং "ত্যাগ কর" "ত্যাগ কর", ব'লে উপদেশ দিয়ে কোনো ফল হবে না। চিত্তকে শুদ্ধ কর, মনকে নিষ্কলুষ কর, প্রাণের আবেগগুলিকে নিষ্কলঙ্ক কর,—তাহ'লেই দেখ্‌তে পাবে যে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত ত্যাগ-স্বীকার কত্তে তোমার কোনো দ্বিধা হবে না, কুণ্ঠা হবে না, কষ্ট হবে না বা অনিচ্ছা হবে না। দেশব্যাপী চিত্তশুদ্ধির আন্দোলন করাই হচ্ছে দেশব্যাপী ত্যাগ-সাধনার প্রবর্ত্তনে সূচনা সৃষ্টি করা। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোককে কখনো শুদ্ধচেতা করা যায় না ব'লে যে ভ্রমাত্মক ধারণা রয়েছে, সেইটীকে মিথ্যা ব'লে প্রমাণিত করার জন্য আমাদের প্রতিজনের সর্ব্বাগ্রে শুদ্ধচেতা হওয়া প্রয়োজন এবং তারপরে অন্য শত সহস্র লক্ষ জনকে শুদ্ধচিত্ত হবার জন্য আহ্বান করা প্রয়োজন। ভোগ কখনো কোনো জাতির অভ্যুদয়ের মূলসূত্র হ'তে পারে না। ত্যাগ দিয়েই জাতি বড় হয়। আমাদের যদি বড় হ'তে হয়, তবে ত্যাগই আমাদের অবলম্বনীয় হবে কিন্তু সেই ত্যাগ আসবে অকপট চিত্তশুদ্ধির অনলস সাধনা থেকে।

সেবাই তোমার লক্ষ্য হউক

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— প্রতিটি মানুষের কাণে পৌঁছাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনুষ্যত্বের অমলিন আদর্শের বাণী, প্রতিজনের প্রাণে প্রবেশ করাও বাধাবন্ধহীন সাধনোন্মাদনা, প্রত্যেককে অনুপ্রাণিত কর ত্যাগের মন্ত্রে আর সেবার তন্ত্রে, উদ্দীপিত কর প্রত্যেকের লক্ষ যুগের সুপ্ত সাত্ত্বিক কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু নিজে আগে নিজ জীবনে সত্যকে কর আস্বাদন নির্ভুল-রূপে এবং সত্যাস্বাদনের উপায়-স্বরূপে গ্রহণ কর নিষ্কাম নিঃস্বার্থ সেবার মহাব্রত। ভালবাসার যোগ্য আধার পাচ্ছ না ব'লে তুমি অপাত্রে কুপাত্রে তোমার ভালবাসাকে ন্যস্ত কর্ব্বে, এটা কোনো কাজের কথাই নয়। মানবজাতির সেবা কত্তে কত্তে সেবার মাধ্যমে তোমার ভালবাসার বস্তুগুলিকে চিনে নিতে চেষ্টা কর। যেই সেবা নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ, যে সেবা দুরভিসন্ধিমুক্ত ও নামযশ-লোভহীন, সেই সেবাই প্রকৃত ভালবাসার জন্মদাত্রী। সেবক হও বিশ্বের প্রতিটি পিপাসিতের, প্রতিটি ক্ষুধার্ত্তের, প্রতিটি ব্যথাতুরের, প্রতিটি বেদনাহতের, প্রতিটি হতাশ, বিবশ, দুর্ব্বল মানবের। সাহায্য কর তাদের প্রত্যেককে পাপের পল্বল থেকে আত্মোদ্ধারে, সাহায্য কর তাদের প্রতিজনকে মানুষ মাত্রের নিষ্কলুষ সেবায় ব্রতী হতে, সাহায্য কর তাদিগকে

অজ্ঞানতার প্রগাঢ় অন্ধকার থেকে আর মায়া-মোহের নিবিড় বন্ধন থেকে মুক্ত হ'তে। সেবাই তোমার লক্ষ্য হোক্, স্বার্থ নয়।

দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বছর বছর সন্তান হচ্ছে আর নীরব সংসারটী একটী জনারণ্যের হট্টগোলে পূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে বিধাতাকে দোষ দিচ্ছ কেন? স্বামী এবং স্ত্রী ইচ্ছা করলেই নিজেদের মধ্যে এমন একটু দূরত্ব রেখে চলতে পারে, যাতে অবাঞ্ছিত সন্তান তাদের দরিদ্র-ভবনে এসে ঢুকে না পড়ে। যে এসে গেছে, তাকে অনাদর বা অবহেলা করার মত পাপ নেই। যে আসে নি, সে আস্‌বে, কি আস্‌বে না, তার দায়িত্ব ও অধিকার তোমাদের নিজেদের হাতে থাকা চাই। নইলে মানুষে আর জন্তুতে পার্থক্যটা রইল কি, বল? আমি সংসারাশ্রম ত্যাগী সন্ন্যাসী হ'য়ে তোমাকে বল্‌তে পারি না যে, বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিক প্রথা অনুসরণ কর। তার ফলাফল জানি না বা অনুমান কত্তেও পারি না। তার সুফল যদি থাকে, কুফলও যে থাক্‌বে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? কিন্তু ঐ যান্ত্রিক উপায়গুলি তোমার মনের কোনো সম্পদ বা শক্তি বা মাধুর্য্য বাড়াতে পারে না, পার্ব্বে না। সংযমের সাধনা তোমার

অন্তরের ঐশ্বর্য্য বাড়াবে, মনকে দেবে প্রচুর মাধুর্য্য এবং স্নিগ্ধতা। দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মাচর্য্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তোমাকে দেবে আত্মবিশ্বাসের মহাবল, যা যন্ত্র থেকে কদাচ কেউ লাভ কত্তে পারে না। দাম্পত্য ব্রহ্মাচর্য্য জগতে আনেকের জীবনে অনুশীলিত হয়েছে এবং তাদের জীবনের সেই সফলতা সূক্ষ্ম ভাবে মানুষের মনকে ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের বংশানুক্রমিকতার দিকে অগ্রসর ক'রে দেবার সহায়তা কচ্ছে, এই কথাটী তোমরা বিশ্বাস ক'রো।

আমি নকল গুরু নহি

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— জীবনব্যাপী উদ্দীপনা যোগাবার জন্য আমি তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে থাক্‌ব, এ কথাটীর উপরে তুমি নির্ভয়ে নির্ভর কত্তে পার, যদি তুমি আমাতে বিশ্বাস ন্যস্ত কত্তে পেরে থাক। তোমার প্রতিটি হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমার সমগ্র শরীরের প্রতিটি শিরায়, উপশিরায়, ধমনীতে রক্তপ্রবাহকে গতিশীল রাখ্‌ব—এই প্রত্যয়ে তুমি অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হতে পার। তোমার শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে, প্রতিটি রোমকূপে, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, প্রতিটি অবয়বে আমি তোমাতে শক্তি-সঞ্চার ক'রে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে দিব, একথা তুমি অভ্রান্ত বেদবাক্য ব'লে জ্ঞান কত্তে পার। তোমার মনের প্রতিটি পরতে, তোমার চিন্তারাজির প্রতিটি তরঙ্গে

মলয়-হিল্লোলের মত মৃদু পরশনে আমি ব্রহ্মবীণার ঝঙ্কার তুল্‌তেই থাক্‌ব, এই আশা তুমি কত্তে পার। কারণ, আমি তোমার সত্যিকারের গুরু, নকল গুরু নই। আমি মেকি মালের কারবার করি না। ভেজালে আমার রুচি নেই।

গুরুশিষ্যে একত্ব, স্বামী-পত্নীতে অভিন্নত্ব

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরু আর শিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক যখন উপাসিত ও উপাসক বা উপাসক ও উপাসিত, তখন তাদের মধ্যে দীর্ঘকাল আর ভেদবুদ্ধি থাকে না। স্বল্প সময়ের মধ্যেই একে অন্যের সঙ্গে অভেদাত্মা হ'য়ে যায়। পতি আর পত্নীর মধ্যেও যখন সম্পর্কটা উপাসিত আর উপাসকের বা উপাসক ও উপাসিতের, তখনও তাদের মধ্য থেকে আভ্যন্তরীণ দ্বিত্ব অতি সহজে লোপ পায় এবং স্বল্পকালমধ্যেই দুজনে একাত্ম ও অভিন্ন সত্তার আস্বাদন পায়। যেখানে গুরু বা শিষ্য পরস্পর পরস্পরের কাছে লাভলোভী বা প্রত্যাশী, সেখানে এই একাত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হয় না। সেখানে দূরত্ব কাটে না, অভিন্নত্ব আসে না। যে যার উপাসনা করে, সে তাই হয়ে যায়। একজন বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে মনে মনে উপাসনা কত্তেন, একথা বিশ্বাস্য। একজন শ্রীরামকৃষ্ণ যে বিবেকানন্দকে

মনে মনে উপাসনা কত্তেন, এই কথাটাও কি একেবারে অবিশ্বাস্য? বিশ্বাস্য যদি হয়, তবে ধ'রে নিতে হবে যে, এঁরা দুজনে পরস্পরের সঙ্গে মিশে অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছিলেন। গুরুর কাছে বিবেকানন্দ কিছুই চান নি। চাইতে পারেন নি। শিষ্যের কাছেও রামকৃষ্ণের পার্থিব কোনও প্রত্যাশা ছিল না। স্বামী ও পত্নীর মধ্যে যখন এই ভাবটা আসে, তখন তারা একজন আর একজনকে এমন ভাবে অনুপূরণ করে যে, দুই জনে মিলে একটী আত্মা হ'য়ে যায়, বাইরে যদিও দেখতে দেখা যায়, দুটা দেহ। এ এক বিচিত্র রহস্য। পাশ্চাত্যের কাম-তাত্ত্বিকেরা এই ব্যাপারটার খোঁজ পান নি, কিন্তু ভারতের প্রাচীন ঋষিরা পেয়েছিলেন।

জনসেবা ও ঈশ্বর-বিশ্বাস

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— লোকসেবায় যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেন, আর্ত্ত মানুষের প্রতি তাঁদের মন এতই সহানুভূতিশীল থাকে যে, তাঁরা সকল সময়ে সকল কাজ ঠিক মাত্রা মেপে কত্তে সমর্থ হন না। আর লোকসেবা অধিকাংশ সময়েই একাকী-সাধ্য নয় ব'লে অন্যের কাজের ফলাফলের উপরেও তাঁদের অনেকটা নির্ভর ক'রে চলতে হয়। এই সব কারণেই প্রয়োজন যে, তাঁরা যেন সহকর্ম্মীদের সম্পর্কে আশাপরায়ণ ও সহনশীল হন। একাই

সব কাজ সমাধা কত্তে পার্ব্ব, এই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে জিদে প'ড়ে দুঃসাহস কত্তে গেলে অনেক সময়ে ঝুঁকিটা এসে প'ড়ে যায় তাঁদের নিজেদের স্বাস্থ্যের উপরে বা নিজ নিজ পরমায়ুর উপরে। এই সকল অবস্থায় সকল দিকের ভারসাম্য যোগ্য ভাবে রাখার প্রয়োজন অফুরন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাসের। আমি যদি অকপট জনসেবক হ'য়েই থাকি, তাহ'লে পরিণামে পরমেশ্বরই আমার সহায়তা করার জন্য আমার পাশে নানা রূপ ধারণ ক'রে দাঁড়াবেন, এই বিশ্বাসটী বড়ই প্রীতিপ্রদ, প্রাণপ্রদ, শান্তিদায়ক। ঈশ্বর-বিশ্বাস মানুষকে ক্ষমাশীল করে, ধৈর্য্যবান্ করে, সবল করে। ঈশ্বরবিশ্বাস নিরর্থক আতঙ্কের আক্রমণ হ'তে রক্ষা করে। ঈশ্বরবিশ্বাস সর্ব্বজীবে ভালবাসা দেয়। সর্ব্বজীবে সমত্ব-বোধের চেয়েও জনসেবকের পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয় হচ্ছে সর্ব্বজীবে মমত্ব। এই দুর্লভ বস্তুটী ঈশ্বর-বিশ্বাসের সদ্যঃ সুফল।

সুবিধাবাদ ও আদর্শবাদ

অপর এক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আদর্শকে সুবিধার ঊর্দ্ধে স্থান দিও। সুবিধা আছে ব'লেই একটা কাজ ক'রে ফেল্লে, এটা সদ্‌যুক্তি নয়। আদর্শপেত ব'লেই কাজটা করেছ, এটাই ভাল কথা, এটাই দামী কথা। আদর্শনিষ্ঠ হ'তে হ'লে অসুবিধাকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা

থাকা চাই। সে ক্ষমতা চরিত্রবল না থাকলে কারো আসে না। এজন্যই আদর্শের প্রকৃত সেবা চরিত্রবানের কাছেই প্রত্যাশা করা যায়। আদর্শ, লক্ষ্য আর উপলক্ষ্য তিনটার মধ্যে যখন থাকে না বিরোধ, জানবে, তখনই পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের পত্তন হ'ল। মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃত মানুষ হওয়াই আমাদের প্রয়োজন। তার জন্য কোনো ত্যাগকেই যথেষ্ট ব'লে মনে করা চল্‌বে না। সুবিধাবাদ ও আদর্শবাদের মধ্যে কলহ চলছে আদিকাল থেকে। মানুষের ধ্যানপ্রশান্ত স্নিগ্ধ মন সন্ধান পেয়েছে আদর্শের আর মানুষের ভোগলুব্ধ ক্ষিপ্ত মন গন্ধ পেয়েছে সুবিধাবাদের। এই দুইটী বস্তুর মধ্যে দূরত্ব সুমেরু থেকে কুমেরুর, ব্যবধান আকাশ আর পাতালের। এই দুইটীর মধ্যে আপোষ চলে না। এই দুইটী বিপরীত-ধর্মী বস্তুর মধ্যে আপোষ চালাবার চেষ্টা কদাচ সফল হয় না। সুবিধা যদি আদর্শের অনুকূল হয়, তবেই তা গ্রাহ্য। তা' যদি না হয়, তবে তা' ত্যাজ্য।

জাতীয় জীবনে শুভ লক্ষণ

অপরাহ্ণে জিরতলীতে ভাষণ হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটা "ইতোনষ্টঃ ততোভ্রষ্টঃ" জাতির ভিতরে হঠাৎ যখন আত্মসম্বিৎ ফিরে আসে, তখন তার ভিতরে নানারূপ চিত্তবৃত্তির খেলা চলতে থাকে। কখনো কখনো সে

তার অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করে যে, অতীতের কি কি গৌরব তার ছিল। কখনো কখনো সে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে যে, অনাগত কালে সে কিরূপ অবস্থায় গিয়ে পৌছুবে। তারপরে সে নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা করে যে, জাগ্রত জীবন্ত বর্ত্তমান-কালে তার করণীয় কি আছে। এই তিনটী অবস্থাই আমাদের দেশের ভিতর দিয়ে যেন যুগপৎ চলছে। কেউ অতীতকে খোঁজবার চেষ্টা কচ্ছেন, কেউ ভবিষ্যৎকে দেখবার চেষ্টা কচ্ছেন, কেউ বর্ত্তমানকে হাতের মুঠিতে ধ'রে ফেলবার চেষ্টা কচ্ছেন। জাতীয় জীবনে এগুলি সবই শুভলক্ষণ।

চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের চিন্তাচর্চ্চার ধারাবাহিকতা কত কালের জন্য স্থায়ী? আর একটী বড় কথা হচ্ছে, চিন্তার চর্চ্চাতেই তো আর কেল্লা ফতে হবে না, সঙ্গে সঙ্গে আমরা কাজও কচ্ছি কিনা? চিন্তা কর্ব্ব সাময়িক উত্তেজনায়, দুদিন পরে ঝিমিয়ে যাব, ঘুমিয়ে পড়ব, পূর্ব্বের ন্যায় অসাড় নিস্পন্দ হ'য়ে পড়ে থাকব,—এটী কখনো শুভলক্ষণ নয়। চিন্তাগুলি আকাশ ভেদ ক'রে মহাশূন্যেরও ঊর্দ্ধদেশে চলে গেল অনায়াসে কিন্তু কর্ম্ম কিছুই কর্ল্লাম না বা যা' কর্ল্লাম, তা' নিতান্তই না

করার মত,—এর মতন সর্ব্বনাশকর দার্শনিকতা আর কিছু নেই। চিন্তাও কর, কাজও কর। চিন্তানুযায়ী কথাও বল, কাজও কর। চিন্তাকে রাখ অবিরল, অবিরাম, অবিচ্ছেদ, অপরিচ্ছিন্ন, অনর্গল ও অবাধ, কর্ম্মও চলুক উদ্দাম, অধীর, অনির্ব্বাণ, অকুণ্ঠ ও অফুরন্ত। জাতীয় জীবনে নবজাগরণের এইটী একটী অলিখিত এবং অলঙ্ঘনীয় সর্ত্ত। একদল লোক হয়ত চিন্তাই ক'রে যাবে, একদল লোক হয়ত কথাই ব'লে যাবে, একদল লোক হয়ত কাজেই ডুবে যাবে,—এমন হ'লে হ'তে পারে, অবশ্য যদি এই তিন দলের ভাব-সমন্বয়ের মত যোগ্য ব্যবস্থা কিছু থাকে। কিন্তু তার উপায়টী সহজ নয় এবং তদুচিত সমন্বয় একটী দুর্ল্লভ ব্যাপার। সুতরাং চিন্তানুশীলনকারীকেই হ'তে হবে কথক, বাক্যানুশীলনকারীকেই হ'তে হবে কর্ম্মশীল, কর্ম্মপরায়ণ, সবল-বাহুধারীকেই হ'তে হবে একাধারে কথক, চিন্তক ও কর্ম্মী। অর্থাৎ একটী দেহেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নিজ নিজ পূর্ণ শক্তি নিয়ে কাজ ক'রে যাবেন,—এইটী চাই। একদল লোক কেবল চিন্তাই উপহার দিয়ে যাবেন, আর কোনো কর্ত্তব্য তাঁদের নেই, একথা আমি মান্‌ব না। চিন্তাবীরকে কর্ম্মবীরও হ'তে হবে, অবশ্য বহুলাংশে হোক আর না হোক, কতকাংশেও ত' বটেই। একদল লোক কেবল ভাল ভাল কথাই বিলিয়ে বিলিয়ে ফতুর হ'য়ে যাবেন, আর কোনো করণীয় তাঁদের নেই, একথা আমি

মান্‌ব না। বাক্যবীর হবার যোগ্যতা যার আছে, সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মবীর হবার চেষ্টাও তিনি কেন কর্ব্বেন না? চিন্তা, বাক্য, কর্ম্ম এই তিনটী কেন একই সুপাত্রের মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রকাশ কর্ব্বে না, যদি জাতীয় জাগরণই আমাদের আবশ্যক হ'য়ে থাকে? চিন্তা বাক্যকে স্ফুরণ দেয়, বাক্য কর্ম্মকে প্রেরণা দেয়, তেমনি আবার কর্ম্ম দেয় বাক্যকে বাস্তবতা আর চিন্তাকে সফলতা। নিষ্ফল চিন্তা আর অবাস্তব বাক্য আমাদিগকে কোন্ কল্যাণ বর্ষণ কর্ব্বে?

জাগরণের প্রধান সর্ত্ত নিরবচ্ছিন্নতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দার্শনিকতা, ব্যাখ্যাপরায়ণতা এবং কর্ম্মশীলতা এই তিনটীর মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক স্থাপিত হ'লেই তিনটীর প্রত্যেকটী সমপরিমাণে সার্থক। একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য আবার এই কথাটী যে, এদের চাই নিরবচ্ছিন্নতা বা অবিরাম গতিতে নিরন্তর প্রবাহমানতা। একটা অতীব মহচ্চিন্তা জগদ্বাসীকে উপহার দিলুম এবং তারপরে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ কল্লুম,—এর দ্বারা কদাচ চিন্তার দীর্ঘায়ুত্ব রক্ষিত হয় না। একটা চিন্তায় সমগ্র জীবন জিদ্ ক'রে লেগে থাকতে পারলে তার বিশ্বতোমুখ প্রসার কি ভাবে যে কত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হ'তে পারে, তা' ক্ষণচিন্তকের কল্পনায়ও কখনো আস্‌তে পারে না। একটা

মাত্র কথাকে সমগ্র জীবন ভ'রে বল্‌তে থাক্‌লে, সেই কথা যে কেমনতর কর্ম্মের পক্ষে প্রেরণাদায়িকা হ'তে পারে, তা' মৌশুমী বক্তাদের পক্ষে ধারণা করাও অসাধ্য। একটা মাত্র কাজে জীবন ভ'রে অবিচল নিষ্ঠায় লেগে থাক্‌লে সেই কাজের ফলে কথার জগতে আর চিন্তার জগতে কি যে নূতন রোমাঞ্চ সৃষ্ট হ'তে পারে, কর্ম্মজগতের মহীয়ান্ পুরুষদের মধ্যেও সে কথা কয় জনে জানেন? ধারাবাহিকতা বা নিরবচ্ছিন্নতা জাগরণের যে একটী প্রধান সর্ত্ত, এই কথাটী কদাচ ভুললে চলবে না।

পল্লীগ্রাম দেশের প্রাণকেন্দ্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ক্ষুদ্র একটা পাড়াগাঁয়ে এসে এই কথাগুলি আমি বল্‌ছি। তোমরা হয়ত কেউ কেউ বলতে পার যে এই কথাগুলি শহর-অঞ্চলে উচ্চশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বললে হয়ত কাজে আসত। কিন্তু আমি বল্‌ব, পল্লীগ্রামই দেশের প্রাণকেন্দ্র। ছোট কথা আর বড় কথা সব কথাই আগে এখানে বলা প্রয়োজন। সোজা কথা বা কঠিন কথা, সব কথাই এখানকার লোককে সর্ব্বাগ্রে শুনানো কর্ত্তব্য। পল্লীগ্রামগুলিকে আমরা নগণ্য মনে করি ব'লেই এখানে জ্ঞানের চর্চ্চা নেই। যে যুগে পল্লীবনের ছায়াতলে ব'সে ঋষিরা উচ্চচিন্তা কত্তেন, যাবতীয় শাস্ত্র-গ্রন্থের

জন্মলাভ ত' সেই যুগেই হয়েছিল। জ্ঞান-চর্চ্চার নিরবচ্ছিন্নতা অটুট না থাকায়, শাস্ত্রগুলি যেন নির্জ্জীব পাথরে পরিণত হ'য়ে যাদুঘরে ঠাঁই পাবার প্রতীক্ষায় দিন গুণ্‌ছে। পল্লীতে পল্লীতে আবার কি বেদমন্ত্রধ্বনি উত্থিত হ'তে পারে না? পল্লীতে পল্লীতে আবার কি ব্রহ্মগায়ত্রী গীত হ'তে পারে না? মানুষে মানুষে ভেদ নাই, সব মানুষই পরমেশ্বরের সৃষ্ট, প্রত্যেকটী মানুষের সম্পর্ক পরমেশ্বরের সঙ্গে এক,—এই একটী কথা কি প্রত্যেকটী পল্লীতে প্রত্যেকটী কর্ণে প্রবেশ করানর প্রয়োজন নেই? পাড়া-গাঁ-গুলিকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি না, এই জন্যই যে-কোনো সাধনায় নিরবচ্ছিন্নতার প্রয়োজনীয়তা বল্‌তে এখানে এসেছি।

ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চিন্তার জগতেই হোক, কথার জগতেই হোক আর কর্ম্মের জগতেই হোক, নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করার জন্য এক অপূর্ব্ব সহায়ক আছে, যাকে আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা আশ্চর্য্যজনক ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন। তার নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যকে আমি সকল তপস্যার মেরুদণ্ড ব'লে জেনেছি। ব্রহ্মচর্য্যকে আমি ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র ব'লে বুঝেছি। এই জন্যই সেই ব্রহ্মচর্য্যের কথাই সবাইকে বারংবার শোনাচ্ছি। সামাজিক মত, আধ্যাত্মিক পথ বা

রাজনৈতিক দল তোমার যাই হোক্ না কেন, আমি তোমাকে নিশ্চয়ই সর্ব্বাগ্রে এই কথাটাই বলব যে, যতটুকু সাধ্যে কুলায়, ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হও। কুমার-জীবন-যাপন কর্ল্লুম, অথচ ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্ল্লুম না। এর মতন দুর্ভাগ্যজনক সর্ব্বনাশ মানুষের আর কিছু হ'তে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য বল দেবে, বীর্য্য দেবে, সাহস দেবে, পুরুষকার দেবে, অকুতোভয় অধ্যবসায় দেবে এবং পরিণামে দেবে দিগ্বিজয়। কিশোর-কিশোরী-জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের চেয়ে বড় অবলম্বন মানুষের আর কিছুই হ'তে পারে না।

দম্পতীর ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কুমার-কুমারী-জীবনে ব্রহ্মচর্য্য ত' অবশ্যই পালনীয়, সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানে কোথাও কোথাও এমন দৃষ্টান্তও দেখা যাচ্ছে যে, বিবাহের পরেই ভোগের স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে নব-বিবাহিত দম্পতী বেশ কয়েক বৎসর নিষ্ঠাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে যাচ্ছেন। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ দৃষ্টান্তের কথা কিম্বদন্তী-রূপেও কখনো শোনা যেত না। কিন্তু এই সব দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাচ্ছি যে, আমরা যে এতগুলি বৎসর ধ'রে ফলাফলের দিকে দৃক্পাত মাত্রও না ক'রে কেবলি ব'লে গিয়েছি,—"ব্রহ্মচর্য্য কর এবং করাও,"—তা' বিফল হয় নি। বিফল

হ'তেও পারে না। মানবদেহের জন্ম কামক্রিয়া থেকে। সুতরাং কামক্রিয়ার প্রতি আসক্তি মানবমাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের ভিতরে ভগবানের দেওয়া আর একটী আশ্চর্য্য শক্তি আছে, যার নাম সংযম, যার প্রভাবে মানুষ কামশক্তিকে দিব্যায়ন প্রদান কত্তে পারে, রতিসম্ভোগের চেয়েও মধুরতর রস দৈহিক ক্রিয়াদি ব্যতীতও আস্বাদন কত্তে পারে। আবার, আর এক শ্রেণীর দম্পতীরও ঝটিতি আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছি, যাদের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই উপদেশটীকে ফলবান হ'তে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে যে, "দুটি তিনটী সন্তান হ'য়ে যাবার পর পরস্পর ভাইবোনের মতন থাকো।" কাম-কাতর শত শত দম্পতী আমাদের কাছে এসেছে উপায় জানতে যে, কি ক'রে দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়-লালসাকে দমন করা যায়, বশীভূত করা যায়। উপায় তার অনেক আছে কিন্তু সব চেয়ে দ্রুত ফলপ্রদ হয়েছে সেই উপদেশ, যাতে আমরা বলেছি,—"অপরের ভিতরে নিজেকে দেখ, নিজের ভিতরে অপরকে দেখ।" স্বামী যদি নিজের শরীরটার ভিতরে স্ত্রীর সমগ্র শরীরটাকে অঙ্গে প্রত্যঙ্গে অভিন্ন-রূপে দেখবার চেষ্টা করে আর স্ত্রী যদি নিজের দেহটার ভিতরে প্রতি অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে স্বামীর সম্পূর্ণ দেহটাকে দেখ্‌তে পায়, তা'হলে অল্পকাল মধ্যে দুজনের মধ্যেকার দুর্নিবার আসঙ্গ-লিপ্সা এবং দৈনন্দিন অভ্যাস থেকে উপজাত রমণ-মোহের দুর্ব্বলতা দূর হ'য়ে যাবেই যাবে, অথচ এর

ফলে প্রেম তাদের প্রগাঢ়তর হবে, গভীরতর হবে। নববিবাহিত দম্পতি যতদিন পর্য্যন্ত নিজেদের শারীরিক আকর্ষণকে কব্জায় এনে সংযম পালন ক'রে চলতে পারেন, ততদিন তেত্রিশ কোটি দেবতারা তাঁদের ঘরের চৌকাঠে এসে ত্রিসন্ধ্যায় তিনটা ক'রে প্রণাম রেখে যান। আর বিবাহিত দম্পতী সুসঙ্গত কাল পর্য্যন্ত ব্যবহারিক গ্রাম্য জীবনযাপন করার পরে যেদিন থেকে সংযম-ব্রত পালন শুরু করেন, সেদিন থেকে তাঁদের ঘরের দরজায় এসে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর করজোড়ে স্তোত্রপাঠ করেন। আলঙ্কারিক ভাষায় বল্লাম, কিন্তু কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

বিবাহের অব্যবহিত পর হইতেই ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিবাহিত হ'লেন অথচ স্বামী-স্ত্রীতে দৈহিক কোনও সম্পর্ক ঐ বিয়ের দিন থেকেই কোনো দিন হ'ল না, এরূপ ব্রহ্মচর্য্যের বা এরূপ দাম্পত্যজীবনের স্বাদ কি, তা' বল্‌তে পার্ব্বেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কারণ, আধুনিক ইতিহাসে ঐরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত সম্ভবতঃ মাত্র ঐ একটীই। যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বে গ্রীসে প্লটিনাসের শিষ্য পরফিরির দাম্পত্য জীবন নাকি এরূপ ছিল ব'লে প্রাচীন কাগজ-পত্রে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু পরফিরিকে প্রায়

দুই হাজার বছর ধ'রে আমরা কেউ দেখিনি। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণকে এই সম্প্রতিকালেরও অনেক লোক দেখেছেন। এই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টান্তে আধুনিক মানুষের উৎসাহিত হওয়ার যথেষ্ট অবসর ছিল। কিন্তু এদেশে অলৌকিক রহস্যগুলি বিকায় তাড়াতাড়ি। ভেল্কিবাজীর দেশে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার এই অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করার জন্য সদ্গৃহস্থদের মধ্যে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায়নি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় নি। এটা দেশের দুর্ভাগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষ ছিলেন। তাঁকে কঠোর সাধনা কত্তে হয়েছে, সাধনা ক'রে তিনি অকল্পনীয় দিব্যাবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন এবং তাঁর এই অসাধারণ তপস্যার দৃষ্টান্ত প্রত্যেক দম্পতীর অনুসরণ করার চেষ্টা করা উচিত,— এই ভাবে তাঁকে ব্যাখ্যা করলে তবে সাধারণ মানুষের মনে যদি এই বিষয়ে সদ্রুচি আসে। দৃষ্টান্তের শক্তি অসাধারণ এবং চখের সামনে অতুলনীয় সদ্দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও দেশবাসী তা' অনুসরণ করা প্রয়োজন মনে কর্ব্বে না,—এটা সত্যই বড়ই পরিতাপের বিষয়।

দুই তিনটী সন্তান-জননের পরে ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দুই তিনটী সন্তানের জন্মলাভের পরে দম্পতীর যে ব্রহ্মচর্য্য, তার স্বাদ নিশ্চয়ই আলাদা।

কারণ, এই দম্পতীর কাছে অজানা রহস্য ব'লে কোনো কিছু আর অনুদ্ঘাটিত থাকে না। ফলে যুদ্ধ তাদের কৌতূহলের বিরুদ্ধে নয়, যুদ্ধ তাদের শুধু অভ্যাসের সঙ্গে। ভাল, মন্দ, সুখ, দুঃখ, ঔচিত্য, অনৌচিত্য, শোভনতা, অশোভনতা, কিসে জয়, কিসে পরাজয় ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের কাছে নিত্য নূতন সমস্যার উদ্ভব কমই হয়। কিন্তু তাদের ব্রহ্মচর্য্য কেবল দৈহিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কারণেই প্রয়োজন নয়, অর্থনৈতিক কারণেও প্রয়োজন। কিন্তু অধিক সন্তানের আবির্ভাব-সম্পর্কিত বিভীষিকা দ্বারা যদি তারা উৎপীড়িত হয়, এবং কেবল তারই জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, তবে সেই ব্রহ্মচর্য্য একেবারেই স্বাদহীন বা আলুনি হ'য়ে যায়। একের সহায়তায় অপরের আধ্যাত্মিক ঊর্দ্ধগতি ত্বরান্বিত হবে, এই ব্রহ্মচর্য্যের এইটীই উদ্দেশ্য হওয়া প্রয়োজন। বৃথাই মনুষ্যজন্মকে বাজে কাজে কাটিয়ে না দিয়ে সত্যিকার কিছু ক'রে যাবার জন্য এই ব্রহ্মচর্য্যের সদ্ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন। বরিশালের অশ্বিনী কুমার দত্ত জীবনের একটা বৃহৎ অংশ দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্যে কাটিয়েছেন এবং তার ফলে তাঁর ভিতরে স্বদেশ-সেবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ও অপরাজেয় অধ্যবসায় জন্ম নিয়েছিল, এটাও একটা প্রসিদ্ধ ঘটনা। ময়মনসিংহের অধ্যাপক অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের একটা সুদীর্ঘ সময় ব্যেপে সস্ত্রীক ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে যাচ্ছেন, একথাও

কম প্রসিদ্ধ নয়। একজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের এবং আর একজন বাবা গম্ভীরনাথের কাছ থেকে এই প্রেরণা পেয়েছিলেন ব'লে আমরা শুনেছি। ঈশ্বর-নিষ্ঠ পুরুষেরা যদি প্রেরণা দেন, তবে অনেক স্থলে সেই প্রেরণা দৃষ্টান্ত-রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

ব্রহ্মচর্য্য, পুরুষকার ও ঈশ্বর-কৃপা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনে রাখ্‌তে হবে যে, ব্রহ্মচর্য্য পালনে সফল হ'তে হ'লে নিজের পুরুষকারটুকুকে সর্ব্বাংশে প্রয়োগ কত্তে হবে। চেষ্টার ত্রুটি থাকলে চল্‌বে না। বারংবার পতন হ'য়ে গেলেও চেষ্টা ছাড়লে চলবে না। অদম্য উৎসাহ আর দুর্ব্বার পুরুষকার নিয়ে চেষ্টার পর চেষ্টা কেবল ক'রে যেতেই হবে। থামাথামি নেই। হার মানা নেই। বলা চলবে না, আর বুঝি পার্‌ব না। পারতেই তোমাকে হবে। অতীতে যদি শতবারও হেরে গিয়ে থাক, তা'হলেও তোমাকে জয়ী হবার জন্যই পুনরায় রণসজ্জা কত্তে হবে। কোনো পরাজয়কেই জীবনের শেষ কথা ব'লে মনে করা চলবে না, চলতে পারে না। হাজার জন যে অবস্থায় অনুত্তীর্ণ হ'তে বাধ্য হয়েছে, তোমাকে সেই অবস্থা সত্ত্বেও জয়ী হতেই হবে। তোমার থাক্‌বে একটী মাত্র পণ,—জয়ী হবই হব। কিন্তু কিসের বলে

সেই পণ কর্ব্বে? ঈশ্বর-কৃপার বলে। নিজের শক্তিতে যে পর্ব্বতপ্রমাণ সংস্কারের জঞ্জাল অপসারিত কত্তে তুমি অক্ষম হচ্ছ, তাও একদা দূর হ'য়ে যাবে একমাত্র ঈশ্বর-কৃপায়। এটা যদি বহু জনের জীবনে প্রত্যক্ষ করা সত্য না হ'ত, তবে কথাটা বলতাম না। ঈশ্বরকৃপা উপলব্ধি কত্তে হ'লে ঈশ্বর-বিশ্বাস নামক জিনিষটীর একান্তই আবশ্যকতা। ঈশ্বর-বিশ্বাস তাদের নিকটে এক অতীব মারাত্মক জিনিষ, যারা নিজেদের নানা পার্থিব-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দারুণ-দুষ্কর্ম্ম-সমূহ কত্তে চায় অথচ বিবেকের দংশন থেকে মুক্ত থাক্‌তে চায়। ঈশ্বর মানলেই মৃত্যুর পরেও একটা পরকালের কথা আপনা আপনি এসে পড়ে এবং যে সব কাজ করার প্রতিফলগুলি এই জীবনে পাওয়া হ'ল না, সেগুলির কথা এসে পড়ে। ঈশ্বর না থাক্‌লে চিন্তা-ভাবনার আর বালাই নাই। ঈশ্বর যখন নাই তখন যতক্ষণ যা' পারি লুটে খাই, মেরে কেটে, নানা হাঙ্গামা ক'রে, নানা উৎপাত সৃষ্টি ক'রে নিরাপদে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিতে পাল্লেই ত' হল। কিন্তু চিন্তাপ্রবাহের এত উগ্রতা যাদের নেই, তারা ঈশ্বর-বিশ্বাসের মধ্যে শান্তি পায়, তৃপ্তি পায়, আশ্বাস পায়, বল পায়। তারা ঈশ্বর-বিশ্বাসের মধ্যে সাহস পায়, ধৈর্য্য পায়, সহিষ্ণুতা পায়, ক্ষমা পায়। তারা ঈশ্বর-বিশ্বাসের মধ্যে উগ্রতা-প্রশমক স্নিগ্ধতা পায়, আনন্দ পায়। তারা ঈশ্বর-নির্ভরের ফলে দাম্পত্য

জীবনের মধ্যেও সংযম-পালনের মতন কঠিন অসিধারা-ব্রতের উদ্‌যাপন-কালে ঈশ্বর-কৃপাকে প্রত্যক্ষ ক'রে পুলকিত-তনু হয়। রোমাঞ্চিত কলেবরে তারা পরমেশ্বরকে বারংবার প্রশংসা কত্তে কত্তে জয়ধ্বনি দিতে থাকে যে,—"হে ভগবান্, তোমারি অপার কৃপাবলে আমরা দুস্তর সাগর-বারি অতিক্রম ক'রে চলেছি, তুমি ধন্য, তুমি ধন্য।"

ঈশ্বর-বিশ্বাস অটুট রাখার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঈশ্বর-বিশ্বাসকে অটুট রাখার জন্য অবিরাম ঈশ্বরের নাম স্মরণ প্রয়োজন। ইশ্বরকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুরূপে তুমি যখন পাচ্ছই না, তখন তাঁকে মনোগ্রাহ্য তত্ত্বরূপে সহজে পেতে পার। নাম তাঁর বাচক। তজ্জপাৎ তদর্থভাবনাৎ—নামজপ ক'রে, নামের তত্ত্ব চিন্তা ক'রে তুমি নিরন্তর তাঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্ককে সন্নিহিত রাখতে পার। দশেন্দ্রিয় যাঁকে ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে পেল না, একাদশ ইন্দ্রিয় মনকে দিয়ে তাঁর খোঁজ করার নামই জপ ও অর্থভাবনা। বিশ্বাস অটুট রাখ্‌তে হ'লে একাজটী কত্তে হয়। ভগবান্ কখনো কখনো ম্যাজিক দেখিয়ে, অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়ে, অপ্রত্যাশিত ঘটনার আয়োজন ক'রে তাঁর প্রতি ভক্তের বিশ্বাস যে আনয়ন করেন না, তা' নয়। কখনো কখনো তিনি আবার একাজটী করেনও না। উভয় অবস্থাতেই তোমার

কর্ত্তব্য হচ্ছে তাঁর নামে লেগে থাকা। কেউ অলৌকিক ব্যাপার দেখে ঈশ্বরে বিশ্বাসকে পাকা করেছে ব'লে তুমিও অলৌকিক ব্যাপারের প্রতীক্ষায় ব'সে থেকো না। তুমি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হও। মনঃপ্রাণ দিয়ে যুক্ত হও। যুক্ত হও সর্ব্বদা এবং সর্ব্বাবস্থায়। তাঁকে ভুলে থাকাই যে মৃত্যু, তাঁকে মনে রাখাই যে জীবন, এই কথাটী নিরন্তর স্মরণ কর। তোমার যা' কিছু মঙ্গলের প্রয়োজন, তা' ঐ নামে লেগে থাকার ফলেই হবে।

নামজপ ও সাম্প্রদায়িকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামে লেগে থাকার অন্য একটী ব্যাপক সুফলও তোমরা প্রত্যাশা কত্তে পার। আমি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার উপশম বিষয়ে বলতে চাচ্ছি। নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম নিয়ে, সমাজ নিয়ে, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও দুরবস্থার কারণ নিয়ে কত যে কলহ, কত যে সংগ্রাম। মানুষ নাম-নিষ্ঠ হ'লে এ ক্ষেত্রেও শান্তির আবহাওয়া আশা করা যেতে পারে। যে যেই নামেই ডাকুক, যে যেই ভাবেই পূজুক, ঈশ্বর কিন্তু কোটি ব্রহ্মাণ্ডে মাত্র একটী, দুইটী নয়, তিনটী নয়, বহু নয়। ঈশ্বরের নামের দোহাই দিয়া যারা ফোঁটা-তিলক কাটে, ওজু-নমাজ করে, তারা যদি নিজ নিজ মনকে পরমোপাস্যের প্রিয় নামটীতে অবিরাম যুক্ত রাখ্‌তে পারে, তা'হ'লে তাদের চিত্তের তিক্ততা, রুচির উগ্রতা ভগবৎ-

প্রেমের স্নিগ্ধতায় অনায়াসে রূপান্তরিত হ'য়ে যেতে পারে। গোলটেবিল বৈঠক বসিয়ে, সভা-সম্মেলন-প্রচার প্রভৃতি ক'রে এই তিক্ততা আর এই উগ্রতা কিছুটা উপশান্ত হ'লে হ'তে পারে কিন্তু আসল প্রতীকার ঐখানে, যেখানে ঈশ্বরভক্ত ঈশ্বরের নামে লগ্ন হ'য়ে নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায়, প্রীতির কারণ ও বিশ্বজনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রকৃত পরিচয় পেয়েছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ-অগ্নিকাণ্ড-অত্যাচার প্রভৃতি যে ধর্ম্মের নামে কেবলই চল্ছে, তার একমাত্র কারণ ত' এই যে, কেউ আজ নিজ স্বধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গেও তার নিজের সম্পর্কটী যে কি, তা' বুঝতে পারে নি, ধরতে পারে নি, জানতে পারে নি। ভগবানের নাম অবিরাম স্মরণ কত্তে কত্তে মানুষ ভগবানের সঙ্গে নিজের সম্পর্কটা সঠিক ভাবে জানতে পার্ব্বে এবং ভগবানের সঙ্গে জগতের অন্যান্য মানুষের কি সম্পর্ক, সেটাও বুঝতে পার্ব্বে। তখনই সে ঠিক ঠিক ধরতে পারবে যে, ঐ মানুষগুলি তার নিজের ধর্ম্মাবলম্বী হ'লেও তার পক্ষে যতটা আপন, ঐ মানুষগুলি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হ'লেও তার পক্ষে ততটা আপন। ভগবানের নাম অবিরাম অবিশ্রাম কত্তে কত্তে সাধকের আত্মপরিচয় লাভ হয়। তখন জগতে কেউ আর তার পর থাকে না। সে নিজেও ভগবানের যা' জগতের অন্যান্যেরাও ভগবানের ঠিক তাই। সুতরাং জগতের প্রত্যেকটী মানুষ তখন তার প্রিয় জন, তার প্রাণের ধন, তার আপনার আপন ও নিকটতম আত্মীয়।

দেড় ঘণ্টাকাল ভাষণ দানের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বিশ্রাম-স্থানে গমন করিলেন।

মাধবসিংহ (নোয়াখালী)
৩রা কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৪২
(২০শে অক্টোবর, ১৯৩৫)

শ্রীশ্রীবাবামণি মাধবসিংহ গ্রামে শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাসগুপ্তের আমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে আসিয়াছেন।

সৎকথা শ্রবণ ও সৎকথা পালন

একটী তরুণ কিশোর বলিল,—স্বামীজী, আপনি আমাকে দু-একটী উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করান। আমি আপনার উপদেশ-শ্রবণে আগ্রহী।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপদেশ শ্রবণে তুমি আগ্রহী, এটা ত' খুব ভাল কথা। কিন্তু শুধু শুনলেই ত' হবে না। পালনও কত্তে হবে। সৎকথা শুনতে আগ্রহ হওয়া শুচিমনের পরিচায়ক কিন্তু সদুপদেশ নিজ জীবনে যে পালন করে, সে কেবল একাই শুচিশুদ্ধ হয় না, সে নিখিল জগৎকে শুচিশুদ্ধ ক'রে তোলে। তুমি তেমন হ'তে চাও কি?

কিশোরটী সানন্দে সম্মতিসূচক উত্তর দিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি ত' তোমাদের কাছে কথা বল্‌বার জন্যই স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম প্রেম নিয়ে আমি কাজ কচ্ছি। প্রকৃত শুশ্রূষু

মানুষ পেলে আমি যে কত খুশী হই, তা' ভাষায় বর্ণনা ক'রে বল্‌তে পারব না। এ কাজে আমি কারো প্রশংসা চাই না, কারো ধন্যবাদের প্রত্যাশা রাখি না। কিন্তু তোমরা শুধু কথাই শোনো, কাজ কিছু কর্ব্বে না, এটা আমি চাই না। আমি চাই, কথাও শোন, কাজও সঙ্গে সঙ্গে ক'রে যাও।

কথার দোষ ও গুণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কথার অনেক দোষ, অনেক গুণ। কথা যখন কথা-মাত্রই থাকে, তখন তো জঞ্জালের স্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়। কথা যখন কাজের হয় প্রেরয়িত্রী, তখন তা' যেন মৃত-সঞ্জীবনী সুধা। কথা অনেক হচ্ছে কিন্তু কাজ হচ্ছে কৈ—এ প্রশ্ন অনেককেই কত্তে দেখা যায়। প্রশ্নটা অবান্তরও নয়, অনাবশ্যকও নয়।

কথা ও চরিত্রবল

শ্রীশীবাবামণি বলিলেন,—কথা তখনই কাজে রূপান্তর লাভ করে, যখন কথার পশ্চাতে থাকে চরিত্রবল। বক্তারও চাই চরিত্রবল, শ্রোতারও চাই চরিত্রবল। চরিত্রবলহীনের চীৎকার অরণ্যে রোদন মাত্র। চরিত্রবলই প্রধান বল, তারপর বাহুবল। কথা যেখানে হুজুগ সৃষ্টি করে, সেখানে কাজ হবে কি ক'রে? চরিত্রের আসল কথা আত্মসংযম, উচ্ছ্বাসবর্জ্জন, ধীর স্থির নেত্রে চতুর্দ্দিকের পরিস্থিতি নিরীক্ষণ ক'রে কর্ত্তব্য-

নির্দ্ধারণ। সবই আসে ব্রহ্মচর্য্য থেকে। তোমরা প্রাণপণে সংযমী হও, ব্রহ্মচারী হও।

অর্থনৈতিক সঙ্কট ও নারীত্বের বিপ্লবাত্মক রূপান্তর

অপর একটী কিশোরের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই মেয়েদিগকে আমরা দিনের পর দিন অধিকতর স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হব। নৈতিক বিচারে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার যাঁরা বরদাস্ত কত্তে পাচ্ছেন না, তাঁরাও অর্থনৈতিক সঙ্কটে প'ড়ে মেয়েদের লেলিয়ে দেবেন এই বলে, যা তোরা ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে, রুজি-রোজগার ক'রে সংসারের দরিদ্রতা ঘুচা, অসহায় মা-বাপের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে ধর্। হা-অন্ন হা-অন্ন ব'লে সারা দেশময় যখন আর্ত্তনাদ উঠবে, তখন ছেলেগুলি হয়ত বেইমানি ক'রে মা বাপকে কলা দেখিয়ে সরে পড়্বে কিন্তু স্নেহমমতার আকর-স্বরূপা-মেয়েগুলি তা' কত্তে পারবে না। তখন আরম্ভ হবে তাদের জীবন সংগ্রাম। তখন দেখ্তে না দেখ্তে সামাজিক মানুষগুলির কত কত চির-সঞ্চিত সংস্কার যে নিমেষের ভূমিকম্পে ধ্বসে খ'সে প'ড়ে হবে ধূলিসাৎ, তা বলা কঠিন। সেই ভয়ঙ্কর দিনটাকে তোমরা হয়ত দেখ্তে পাচ্ছ না, আমি দেখ্তে পাচ্ছি। সেদিনও সম্ভ্রম সহকারে

তোমাদের মনে রাখতে হবে যে, এরা মায়ের জাত, এদের কাউকে ছোট ক'রে দেখার মতন পাপ নেই। সমস্ত পৃথিবী নাস্তিক হ'য়ে গেলেও এদের অন্তরে আস্তিক্যের উজ্জ্বল আলোক অনির্ব্বাণ দীপ্তিতে অনন্ত কাল জেগে থাকবে। এই আশা আমি রাখি ব'লেই সমাজের সবচেয়ে মারাত্মক সঙ্কটগুলির সম্মুখে দাঁড়িয়েও আমার মন অবিচল আশ্বাসে পূর্ণ। স্ত্রীস্বাধীনতা বিপ্লবাত্মক রূপ ধারণ কর্ল্লেও এঁদেরই ত্যাগ-মহিমায় প্রাচীন ভারত নূতন মূর্ত্তিতে এদেশে পুনরায় ফুটে উঠ্‌বে। দারুণ অর্থনীতি সমগ্র পৃথিবীকে ওলট-পালট ক'রে দিচ্ছে ব'লেই ভারতের নারীত্বের মহিমা একদিন লুপ্ত হ'য়ে যাবে, এ কল্পনা কখনো ক'রো না।

নারীর অপবাদ

কিশোরটী আরও কয়েকটী কথা শ্রীশ্রীবাবামণির নিকট সবিস্তারে বলিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাবধান! কখনো কোনও মেয়ের নামে অপবাদ রটনায় সহায়তা কর্ব্বে না। সধবার নামে অপবাদ রটনা হ'লে তার কোনো ক্ষতিই হয় না, তার স্বামী যদি তাকে বিশ্বাস করে। বিধবার নামে অপবাদ হ'লে তার জীবনের শুভ্রতাই তাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রক্ষা করে। কুমারীর নামে অপবাদ ঘটলে সে একেবারে অসহায়া ও অরক্ষণীয়া হ'য়ে পড়ে। ভিত্তি কিছু থাকুক আর না থাকুক, মুখরোচক অপবাদ দেখতে না দেখতে সারা

ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, তার সর্ব্বনাশ ঘটে। এমন ক্ষতি কোনো মানুষেরই কখনো করা উচিত নয়। চরিত্র-বিষয়ে অপবাদ রটনার মতন কুকর্ম্ম জগতে আর কিছু নেই। যারা এমন কুকাজ করে, তাদের ত্রিসীমানার মধ্যেও কখনো যাবে না। তাদের সংস্পর্শ যত্ন সহকারে এড়িয়ে চল্‌বে। পরের চরিত্র নিয়ে যারা অপবাদ রটনা করে, তাদিগকে বিষ্ঠার কীটের মতন জ্ঞান কর্ব্বে। যে যার সম্পর্কে যে অপকথাই বলুক, তা' শোনার আগ্রহ যেন তোমার কখনো না থাকে। দৈবাৎ কারো বিরুদ্ধে কোনো অপবাদ এসে তোমার কর্ণে প্রবেশ কর্ল্লে তুমি তা' বিশ্বাস ক'রো না। তোমার চক্ষে নারী-মাত্রেই হোক দেবীপ্রতিমা। তোমার দৃষ্টিতে নারীমাত্রেই হোক জগজ্জননী। কুৎসিত সাহিত্যের রচয়িতারা নিজের মাকে নিজের ভগিনীকে পর্য্যন্ত পঙ্কিল দৃষ্টিতে দেখ্‌বার কুশিক্ষা দেবার চেষ্টা কর্ব্বে। কিন্তু তাদের দেওয়া কুশিক্ষা তোমরা গলাধঃকরণ কর্ব্বে কেন? আর্টের নাম ক'রে অপাঠ্য কাহিনী সব এরা লিখ্‌ছে ত' সাহিত্যিকতার তাগিদে নয়, স্রেফ টাকার লোভে, লোকখ্যাতির দুর্নিবার তাড়নায়। ঐ দুটি জিনিষ এসব না লিখেও পাওয়ার যদি ফিকির কিছু বেরিয়ে যায়, তবে দেখো, তারা ঠিক এর বিপরীত সাহিত্য রচনায় মন দেবে। এদের উচ্চারিত বাজে কথায় কাণ দিও না।

জীবনের কর্ত্তব্য

একজন প্রশ্ন করিল,—আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে, যতদিন সম্ভব বল, বীর্য্য ও বুদ্ধি নিয়ে বেঁচে থাকা এবং সেই সম্পদগুলি সুপরিচ্ছন্ন বিবেকে দেশ, দশ, জাতি ও জগতের কল্যাণে নিরন্তর প্রতিদান-বুদ্ধিহীন নিষ্কাম চিত্তে নিয়োজিত করা। একা একা বেঁচে থেকে কোনো আনন্দ নেই, আনন্দ হচ্ছে মিলনে। তাই আমাদের প্রতিজনকে বাঁচতে হবে আরও শত শত জীবনার্থীর জীবন-সংগ্রামকে জয়িষ্ণু ক'রে তোলার আয়োজন নিয়ে। আমরা যেন প্রতি জনে এমন এক একটা সেতু হই, যেই সেতুর উপরে পদবিন্যাস ক'রে ক'রে লক্ষ লক্ষ অমৃতপথযাত্রী নিঃসঙ্কোচে বিপদের বৈতরণী অনায়াসে পার হ'য়ে যেতে পারে। পরের কারণে স্বার্থ বলি দিয়ে আমরা যেন সকলের পক্ষে অপরিহার্য্য আপনজন হ'তে পারি,—তার জন্য অবিরাম অবিশ্রাম সাধনা ক'রে যাওয়াই আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য। এই লক্ষ্যটুকু যদি স্থির হ'য়ে যায়, তাহ'লে জীবন-কর্ম্মের উপলক্ষ্যগুলির একটাও কদাচ এই মহদ্ধর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হবে না। কে কোন্ জীবিকা গ্রহণ ক'রে তনুরক্ষা কচ্ছে, এটা একটা প্রশ্নই নয়, কে কি উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকছে, এইটাই জীবনের সব চেয়ে বড় জিজ্ঞাস্য। লক্ষ্য আমাদের এক হোক। কোটি কোটি লোকের

লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন জীবিকার বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য এদের আসল মিলনের কদাচ বিঘ্ন হবে না, যদি সুস্থিরীকৃত লক্ষ্য হয় সকলের এক।

জপ ও ওঙ্কার

একজন প্রশ্ন করিল,—আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। তাঁর নামজপেও আমার শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু কি নামে তাঁকে ডাক্‌ব, তা' স্থির কত্তে পাচ্ছি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানকে যদি ডাকতেই চাও, তাহ'লে এমন নামে ডাকো, যে নাম সকল নামের সমন্বয়, যে নাম অন্য কোনো নামের অর্থের সঙ্গে বিরোধ করে না, যে নাম সকল নামের সত্যতা স্বীকার করে, যে নামে সকল নামই ছিল, আছে এবং থাক্‌বে নিত্যকাল ওতপ্রোত হয়ে, যে নাম থেকে বিশ্বের সকল নামের হয়েছে বিকাশ, বিলাস বা বিবর্ত্তন, যে নাম সকল সত্যকে স্বীকার করে, যে নাম অধিকারী-অনধিকারী ভেদ-বিচার রাখে না। কি সেই নাম? সেই নাম হচ্ছে ওঙ্কার। ওম্—ওম্—ওম্ অবিরাম জ'পে যাও। শুধু মনে রেখো যে, এইটী পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ নাম।

স্ত্রী-শূদ্রের ওঙ্কার উচ্চারণ

প্রশ্নকর্ত্তা।—ওঙ্কারে অধিকারী-অনধিকারীর ভেদ নেই? তবে শূদ্রদের ওঙ্কাব উচ্চারণে এত কড়া নিষেধ কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে যুগে আর্য্যঋষিগণ ওঙ্কার-মন্ত্রের দর্শন পেলেন, সেই যুগে আর্য্য আর অনার্য্যের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, কৃতিত্ব, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতির ব্যাপারে দুই গোষ্ঠির মধ্যে এত পার্থক্য ছিল যে, খুব সম্ভবতঃ অনার্য্যেরাই গরজ ক'রে নিজেদের দলকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। দ্বিতীয় কারণ এই হ'তে পারে যে, কিছু আর্য্য নিজেদের পরমসম্পদকে আর্য্যেতর জাতিগুলির অধিকারে আস্‌তে দিতে কুণ্ঠিত ছিল। প্রকৃত কারণ যাই হোক্, সেটা কিন্তু অতি পুরাতন যুগের কথা। পরবর্ত্তী যুগে আর্য্য-অনার্য্যের মধ্যে যেমন সংঘর্ষ বেঁধেছে, তেমন আবার সংমিশ্রণও ঘটেছে। তার ফলে নূতন ইতিহাসের পটভূমিকা তৈরী হয়েছে। তার স্বাভাবিক পরিণতিতে আর্য্যেতর জাতিসমূহ দলে দলে আর্য্য-গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছে এবং শূদ্ররূপে যারা ঢুকেছে, একদা তারা বৈশ্যত্বে উন্নীত হয়েছে, বৈশ্য-রূপে যারা বাস্তব্য করেছে, একদা তারা ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত হয়েছে এবং ক্ষত্রিয়-রূপে যারা ক্ষাত্রধর্ম্ম-পালনে, দেশ-শাসনে, যুদ্ধ-জয়ে নিরত রয়েছে, তারা একদা ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিতে পরিণত হয়েছে এবং ব্রাহ্মণ-বংশীয়দেরও গুরুর স্থান অধিকার করেছে। এই যে ক্রমবিবর্ত্তনমূলক এক আত্মপ্রকাশ, একে আর্য্য-জাতির আত্ম-প্রসারের এক উজ্জ্বল অধ্যায় ব'লে মনে করা যেতে পারে। বর্ত্তমান ভারতে কে

আর্য্য আর কে অনার্য্য, বিচারের কোনো মাপকাটি আছে? বর্ত্তমান ভারতে কে ব্রাহ্মণ আর কে শূদ্র, তার বিচারেরই বা মাপকাটি কোথায়? হাজার বছরের রাজনৈতিক দাসত্ব ব্রাহ্মণ আর শূদ্রকে প্রায় এক পর্য্যায়ে এনে নামিয়েছে। এই সময়ে শূদ্রকে যদি কেউ রক্তচক্ষু দেখিয়ে গর্জ্জন ক'রেও বলে যে, সাবধান, ওঙ্কার উচ্চারণ কর্ল্লে তোর জিহ্বা কেটে ফেল্‌ব, তবে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার লোক কি কাউকে পাবে? পাবে না। স্ত্রী-শূদ্রের ওঙ্কার-উচ্চারণের বা ওঙ্কার-সাধনের বিরুদ্ধবাদী কুসংস্কারান্ধ অনুদার মানুষদের হাতে এখন আর একটী মাত্র অস্ত্র আছে। সেইটী হচ্ছে, পরকালের ভয় দেখান, 'দেখিস্ বর্ব্বরেরা স্ত্রীলোক হ'য়ে বা শূদ্র হ'য়ে যদি ওঙ্কার উচ্চারণ কর্ব্বি ওঙ্কার জপ কর্ব্বি, তবে নরকে যাবি।" শাস্ত্র-নামধেয় কোনোও কোনোও সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে শ্লোক উদ্ধার ক'রে তাঁরা বড় বড় বক্তৃতা দেবেন বা বিজ্ঞাপন ছাপাবেন,— "সাবধান, ওঙ্কার উচ্চারণ ক'রো না, ওঙ্কার জপ ক'রো না, করলে কিন্তু এমন নরকে যাবে, যেখান থেকে আর কারো উদ্ধার নেই।" ভদ্রলোকদের কাণ্ডজ্ঞান এতই অল্প যে, এমন কথা বল্‌তেও লজ্জা বোধ করেন না যে, ওঙ্কার জপ কর্ল্লে কামোত্তেজনা বাড়ে, ক্রোধোদ্দীপনা বাড়ে, লোভ-মোহ-মাৎসর্য্য বাড়ে। আজগুবি গল্প তৈরী ক'রে বা বস্তাপচা সংস্কৃত গ্রন্থ

থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের মনে এমন ভাবে নানা আতঙ্ক এঁরা সৃষ্টি ক'রে দেন যে বল্‌বার নয়। অথচ এঁরা নিজেরা সব ব্রাহ্মণ-সন্তান হ'য়েও সাধনার্থে ওঙ্কার জপ করেন না, করেন জপ হয় হ্রীং, নয় ক্লীং, নয় ক্রীং, নয় ঐং ইত্যাদি। নিজেরা যারা ওঙ্কার জপ করেন না, তাঁরা যখন অপরের ওঙ্কার-জপের অধিকার সম্পর্কে কথা বলেন, তখন তা জনসাধারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনে না। তুমি কি মনে কর যে, মিথ্যা আতঙ্ক-প্রচারকারীদের এসব বাজে প্রলাপ শুনে তোমাকেও ওঙ্কার জপ ছাড়তে হবে? যে দেশে গুরুদেবরা নিজেদের গুরুত্ব হারিয়েছেন লোভের ক্রীতদাস হয়ে, যে দেশে পুরোহিতেরা নিজেদের যাজনিকতা ব্যবসায় হারিয়েছেন অযোগ্যতার দরুণ, ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কৌলীন্য হারিয়েছেন ব্রাহ্মণের উপযুক্ত যাবতীয় সদাচার ও সদ্‌গুণ বিসর্জ্জন দেওয়ার ফলে, যে দেশের গণ-চেতনা প্রত্যেক মানুষকে সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত দেখ্‌বার জন্য উন্মুখ, উদ্‌গ্রীব ও প্রতিজ্ঞারূঢ়, সেই দেশে একদল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আতঙ্কপ্রচারকারী দণ্ড-কমণ্ডলু আর জটাজাল সম্বল ক'রে শুধু হিং-ছট্ ব'লে ব'লেই লক্ষ লক্ষ সাধনেচ্ছু নরনারীকে ওঙ্কার-মন্ত্রের সাধনা থেকে বঞ্চিত রাখ্‌তে পার্‌বেন,—এটা কি অলীক কল্পনা নয়?

জানকী গুপ্ত

অপরাহ্ণে একটী জনসভা হইল। শ্রীযুক্ত জানকী গুপ্ত সভাপতিত্ব করিলেন। তিনি বলিলেন,—এতজ্জাতীয় ধর্ম্মসভায় আবার সভাপতিত্ব করার জন্য কারো আসার প্রয়োজন করে না। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসের মত ধর্ম্মপ্রবক্তা যেখানে শুনাবেন তাঁর সিদ্ধবাণী। কিন্তু একথা সত্য যে, লোকখ্যাতির বহু উর্দ্ধে এবং একেবারে বাইরে অবস্থান ক'রেও যে একজন এই যুগে শহরের পর শহরে এবং গ্রামের পর গ্রামে তাঁর বজ্রবাণী ছড়িয়ে যাচ্ছেন আর দলে দলে মন্ত্রমুগ্ধ নরনারী তা' তন্ময় হ'য়ে শুনে যাচ্ছেন, ভারতীয় বাগ্মিতার ইতিহাসে এ ঘটনা অত্যাশ্চর্য্য ভাবে অভিনব। আমি শুধু শ্রদ্ধা জানাবার জন্যই দাঁড়িয়েছি, কিছু বলবার জন্য নয়। আমার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে যে, আমি এই মহাপুরুষের পদছায়া-রূপে জীবনের কিছু অংশ ভ্রমণ ক'রে ক'রে তাঁরই মূল্যবান উপদেশ-বাণীর প্রতিধ্বনি ক'রে ক'রে একদা মানুষকে শোনাব।*

শ্রীশ্রীবাবামণি একঘণ্টাকাল সমবেত যুবকগণকে উদ্দেশ্য করিয়া ব্রহ্মচর্য্য-বিষয়ে একটী ভাষণ দিলেন।

---

*শ্রদ্ধেয় জানকী গুপ্ত মহাশয় তাঁহার এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। "শান্তির বারতা" নামক গ্রন্থে যে সকল স্থানে বক্তৃতার উল্লেখ আছে, তাহার প্রায় প্রতিটি স্থানে তিনিও "ত্যাগ, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, সদাচার চরিত্রোন্নতি এবং ভগবৎ সাধনা" সম্পর্কে ভাষণ দিয়াছিলেন।

মাধবসিংহ (নোয়াখালী)
৪ঠা কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৪২
(২১শে অক্টোবর, ১৯৩৫)

অভিক্ষুর প্রকৃতি ও লক্ষ্য

খুলনা জেলান্তর্গত ফুলতলি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অন্যান্য সঙ্ঘের কাজের সহিত আমাদের কাজের প্রকৃতিগত এবং লক্ষ্যগত পার্থক্য রহিয়াছে। প্রকৃতিগত পার্থক্যটুকু এই যে, অন্যান্যদের মতন আমরা দেশ, সমাজ এবং জগতেরই সাধ্যমত সেবা করিতে চাহি কিন্তু ভিক্ষা সংগ্রহের চেষ্টা নাই, দান লাভের আগ্রহ নাই, চাঁদা তোলার ব্যবস্থা নাই, নিজেদের কোথায় কি অভাব, কাজের জন্য কি কি বস্তু বা কত অর্থ আমাদের প্রয়োজন, কিছুই কাহাকেও জানাইবার আমাদের গরজ নাই। এসব নাই বলিয়া আমরা কোনোও গর্ব্ব অনুভব করি না এবং এসব না থাকার দরুণ আমাদের কাজের কাজ যে অত্যন্ত অল্প হইতেছে, তজ্জন্য আমরা লজ্জাও অনুভব করি না। কারণ, আমাদের লক্ষ্য হইতেছে, সর্ব্বসেবার পরিণামে প্রতিটি সেবক ও প্রতিটি সেব্যের মনের ভিতরে স্বাবলম্বনী বৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়া। আলস্যের চেয়ে বড় শত্রু আজ আমাদের আর কিছু

নাই এবং সর্ব্বব্যাপারে পরনির্ভরতাই আমাদের বর্ত্তমান কালের প্রধান বিশেষত্ব। পরনির্ভরশীলতার পরগাছাকে জাতীয় জীবন-রূপ মহাবৃক্ষের অঙ্গ হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া তুলিয়া আনিবার প্রয়োজন যে জরুরী, এই চেতনাটাই নিরন্তর কষাঘাত করিয়া আমাদিগকে অভিক্ষাব্রতে, অযাচক-বৃত্তিতে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। এই যে নানা দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া শহর এবং গ্রামের চরণে বক্তৃতার ফুল-মালা উপঢৌকন দিয়া যাইতেছি, কাহারও নিকটে রেলভাড়াটাও কি কখনো চাহিতেছি? পুস্তক বেচিয়া কিছু টাকা হইতেছে, সেই টাকাগুলি দিয়া ঔষধ তৈরী করিয়া শত শত লোককে বিনামূল্যে দিতেছি, বিনিময়ে কি দান চাহিয়াছি? অবশ্য, ঔষধ বিভাগ যদি আরও বাড়িয়া যায়, তবে ঔষধের মূল্য নিবার ব্যবস্থা একদিন করিতে হইবে। কিন্তু তাহার নাম ভিক্ষা নহে। অশক্তকে বিনামূল্যে দিবার আমার অধিকার আছে কিন্তু ব্যয়-বহনে সমর্থ ব্যক্তিকেও বিনামূল্যে দিলে আবার তাহার মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই একটা ব্যাসকূট ইহার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা যেমনই হউক, সমগ্র জাতির ভিতরে সার্ব্বাঙ্গিক ভাবে স্বাবলম্বন-প্রতিভার প্রস্ফুরণই আমাদের লক্ষ্য। এই কারণেই আমাদের কাজ দ্রুত চলিতে পারিতেছে না। দ্রুত চলিবার জন্য যে সকল আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহা কোনও অযাচক-বৃত্তিধারী কর্ম্মীর পক্ষে সুলভ্য নহে। এজন্যই তোমরা

আমার কোনও কাজ চখে দেখিতে পাইতেছ না। দেখিতে পাইতেছ না বিদ্যালয়, দেখিতে পাইতেছ না হাসপাতাল, দেখিতে পাইতেছ না দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য ব্যাপক কোনও সঙ্কটত্রাণ, দেখিতে পাইতেছ না বিরাট বিরাট সমারোহপূর্ণ মহামহোৎসব। এই সব বস্তুগুলি দেখিতে না পাইলে কেন তোমাদের মন একথা মানিবে যে, আমি অতি ক্ষুদ্র হইলেও একজন দেশসেবক? এই দেশের শস্যে দুগ্ধে জলে আমার শরীর পুষ্ট হইতেছে, এই দেশের বাতাস টানিয়া আমি শ্বাসপ্রশ্বাসকে বজায় রাখিতেছি আর এই দেশেরই কোনও সেবা আমার দ্বারা হইতেছে না দেখিয়া তোমাদের মনে যে আক্ষেপের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা ত' স্বাভাবিক। কিন্তু এই দিকে আমি নিরন্তর কামনা করিতেছি, একটী গ্রাস অন্নও যেন আমি নিজের জন্য গলাধঃকরণ না করি, একটী নিঃশ্বাস-বায়ুও যেন আমি নিজের জন্য না টানি।"

ভাবুকতা ও ভাবালুতা

মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত কান্দি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কেবল সভা-সমিতি করিলেই চলিবে না। সেখান হইতে কে কি শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিলে, তাহার হিসাব নিতে হইবে এবং তদনুযায়ী নিজ নিজ স্থানে সকলে মিলিয়া কাজ করিতে হইবে। সকলকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে যদি

পার, তাহা হইলে আস্তে আস্তে বাস্তব কর্ম্মে হস্তবিনিয়োগ করিবার উপযুক্ত সময় আসিবে। প্রাণটা ভাবময় হইলে শরীরটা কর্ম্মচঞ্চল হইবার জন্য আপনা আপনি ব্যগ্র হয়। প্রত্যেকটী মানুষকে ভাবী কর্ম্মের বিষয়ে আগে ভাল করিয়া ভাবাইয়া তোল। নিদ্রালুতায় যেমন নিদ্রা-জনিত সুখ, স্বস্তি, তৃপ্তি ও প্রশান্তি আসে না, ভাবালুতায় তেমন ভাবুকতা-জনিত সুখ, স্বস্তি, তৃপ্তি ও প্রশান্তি আসে না। প্রশান্ত মনই মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনের যোগ্য সহায়। পদ্ধতিবদ্ধ আলোচনার দ্বারা প্রত্যেকের মনকে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবগুলির দ্বারা এমন ভাবে প্রভাবিত কর, যেন কাজে হাত দিবার পরে মন খেই হারাইয়া না ফেলে। কাজটীর এবং কর্ম্মশৃঙ্খলার স্থায়িত্ব তোমার যতখানি কাম্য, কর্ম্মারম্ভকালীন আড়ম্বরটুকু কদাচ তোমার ততখানি কাম্য হইতে পারে না। হঠাৎ করিয়া নূতন কিছু করিতে গেলে হুজুগ নিশ্চয়ই সাময়িক কিছু সহায়তা করে কিন্তু হুজুগই যাহাদের একমাত্র সম্বল, তাহাদের কর্ম্মের প্রদীপ হঠাৎ একটী দমকা বাতাসে নিবিয়া যাইবে। প্রত্যেকটী সভা-সমিতির আগে ও পরে এই কথাগুলি বারংবার চিন্তা ও আলোচনা করিবে।”

সংগঠন

বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত দাঁইহাট-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংগঠন একটা বিদ্যা, সংগঠন একটা আর্ট। সংগঠনের মস্তিষ্কের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে, তার পরেই প্রয়োজন প্রাণবত্তার। সংগঠনের পটভূমিকায় থাকা চাই অটুট আত্মবিশ্বাস, আর থাকা চাই অনমনীয় চরিত্র-বল। কেবল প্রতিভার উপর ভরসা করিয়া সংগঠনকে কদাচ চলমান রাখিতে পারিবে না। সংগঠনে চাই অফুরন্ত কর্ম্মোদ্যম এবং সহস্র বিফলতা সত্ত্বেও একই স্থানে একই কাজ বারংবার করিয়া যাইবার অপরিসীম ধৈর্য্য। একটা দুইটা সভা করিলে, দুই চারিটা পরামর্শের বৈঠক হইল আর সাংগঠনিক তরণী তর্‌তর্‌ করিয়া জলের ঢেউ কাটিয়া কেবলই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে থাকিল,—ব্যাপারটা অত সোজা নহে। দেখিও, তুমি ত' কাজে ফাঁকি দেও নাই? দেখিও তোমার সহকর্ম্মীরা কাজ না করিয়াই করিয়াছে বলিয়া ত' খবর পাঠায় নাই? দেখিও, যাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া কার্য্যভার দিয়াছ, তাহারা বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করিতেছে কিনা। দেখিও, যাহাদিগকে অবিশ্বাস করা সত্ত্বেও কাজের ভার দিয়াছিলে, তাহারা আবার এমন ভাবেই কাজ করিয়া যাইতেছে কিনা, যাহাতে তাহাদিগকে অবিশ্বাস করা অন্যায় হয়। দেখিও, কর্ম্মিচমূর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে কিনা। দেখিও, নিরুপদ্রব কর্ম্ম-গতি-পথে হঠাৎ একটী শোভন সুন্দর যুবক বা অপরূপা একটী কিশোরীর আবির্ভাব নূতন নূতন গুপ্ত ঘটনা সৃষ্টি

করিয়া কর্ম্মীদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, মিথ্যাচার বা জিঘাংসার সৃষ্টি করিতেছে কিনা। একই মত ও পথের আশ্রিত কর্ম্মীদের মধ্যে হঠাৎ যখন হত্যার পিপাসা প্রবল হইয়া ওঠে, বুঝিতে হইবে, গোড়ায় কোথাও বিরাট গলদ ঢুকিয়াছে।"

পারিবারিক অশান্তিতে ক্ষমা ও সমদর্শিতা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত বায়েক-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পারিবারিক অশান্তি যেখানে প্রবল, সেখানে মানুষ সুস্থ চিত্তে কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারে না বলিয়াই অনেক মানুষের মন সংসারের বাহিরে ছুটিয়া যায়। যাহার কর্ম্মশক্তি একদা একটী আদর্শ পল্লী রচনা করিতে পারিত, এভাবে তাহার প্রতিভা হয় ভিক্ষাটনে, নয় দস্যুবৃত্তিতে, নয় নগণ্য জীবন যাপনে অপব্যয়িত হইয়া যায়। সুতরাং সর্ব্বত্রই তোমাদের প্রতিজনের এই উদ্দেশ্যে সতর্ক হইয়া যাওয়া উচিত যেন নিজ নিজ সংসারের শান্তি তুচ্ছ বা তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে নষ্ট হইতে না পারে। এই ব্যাপারে সমদর্শিতা এবং ক্ষমাশীলতা অনেক কাজে আসিবে। পরিবারের প্রত্যেককে সমদৃষ্টিতে যে দেখে, তাহার পক্ষে সকলকে বাগে রাখা

সহজ। প্রতি জনের অপরাধের প্রতি যাহার দৃষ্টি স্বভাবতই ক্ষমাশীল, সে সকলেরই স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করে। শান্তি আন ক্ষমা ও সমদর্শিতার পথে। সকলকে ক্ষমাশীল ও সমদর্শী করিবার চেষ্টা কর।”

নামে লাগিয়া থাক

“লাগিয়া থাক নিরন্তর ভগবানের নামে। জীবনের অমৃত-রসায়ন হইতেছে পরমেশ্বরের মঙ্গলময় নাম। জীবনের এমন কোনও জটিল সমস্যা থাকিতে পারে না, যাহার সুমীমাংসা, যাহার সুসমাধান ভগবানের নাম করিতে করিতে মিলিবে না। সৈনিকের রণক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিকের রসায়নাগারে, প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণা-মন্দিরে, সমাজ-কর্ম্মীর কর্ম্মচঞ্চল কার্য্যালয়ে এবং অন্যান্য সর্ব্বস্থানে ভগবানের নামের সাধন তাহার অকল্পনীয় মহিমায় দুঃস্থ মানুষকে স্বস্থ ও দুর্ব্বল মনকে সবল করিবে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণয়ে অপারগ হইয়া বিহ্বল হইও না, নামের আশ্রয় নাও। বিপৎপাতে কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইও না, নামের আশ্রয় নাও। নামকে পরম অবলম্বন জানিয়া তাহার শরণ লও। বিজ্ঞান যতই উন্নত হউক, জীবের ঈশ্বর-সাধনের প্রয়োজনকে কখনও লুপ্ত করিয়া দিতে পারিবে না। মানুষের বিজ্ঞানের জ্ঞান যতই বাড়িতে থাকুক, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগের

নিপুণতা মানুষের যতই বর্দ্ধিত হউক, অকল্পনীয় ব্যাপার সমূহ ঘটাইয়া বিজ্ঞান আমাদিগকে যতই তাক্ লাগাইয়া দিক না কেন, ঈশ্বর কদাচ নস্যাৎ হইয়া যাইবেন না এবং তাঁহাকে ডাকিবার প্রয়োজনও ফুরাইবে না। অনাদি কাল হইতে মানুষ ঈশ্বরকে ডাকিয়া আসিয়াছে, অনন্ত কাল পর্য্যন্ত মানুষ ঈশ্বরকে ডাকিবে। ডাকিবে এই জন্য যে, তাঁহাকে ডাকিলে শান্তি মিলে, তৃপ্তি মিলে, আনন্দ মিলে, তাঁহাকে ডাকিলে মিলে অভয় এবং নিশ্চিন্ততা। সুতরাং কাহারও কোনও প্রতিবাদে ভ্রূক্ষেপ করিও না, তুমি নামে লাগিয়া থাক।"

নারীর মহিমা

মাধবসিংহ গ্রামটি বৈদ্যপ্রধান। অধিকাংশ রমণীই কিছু কিছু লেখাপড়া জানেন। আশে-পাশের গ্রামগুলি হইতেও প্রচুর মহিলার সমাগম হইয়াছে। মহিলাদের উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি একটী বক্তৃতা দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারী আমার দৃষ্টিতে এক মহীয়সী মহাশক্তি, সে অবহেলার যোগ্য নয়, অবজ্ঞার পাত্র নয়। জগৎ-সভ্যতায় নারী এক অপরিহার্য্য বস্তু, যাকে কেন্দ্র ক'রে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ঘটেছে বিকাশ। ঋষির দৃষ্টিতে নারী আনন্দ, হর্ষের উৎস, উৎসবের উল্লাস। দার্শনিকের

দৃষ্টিতে নারী সৃজনী প্রতিভার উৎস-স্বরূপা চির-নবায়মান তত্ত্ব, বিশ্বস্রষ্টার আত্মবিশ্বাসের আশ্চর্য্য-জনক বিভূতি। কবির দৃষ্টিতে নারী সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, অনবলোকিত শত সত্যের প্রস্ফুটন তার প্রতি অঙ্গে, অজানার আকর্যণ তার প্রতিটি পদ-সঞ্চালনে। তাই নারী আমার কাছে মা। মা ছাড়া অন্য কোনো দৃষ্টিতে আমি কখনো নারীকে দর্শন করি নাই। এই জন্যই আমি বারংবার উদাত্ত কণ্ঠে ব'লে এসেছি,—শোনো যুবকের দল, শোনো পুরুষের দল জগতের প্রত্যেক রমণী তোমাদের জননী।

নারীর দায়িত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে সময়ে আমি পুরুষদের ডেকে ডেকে বল্‌ছি, জগতের প্রত্যেক রমণী তোমাদের জননী, সেই সময়ে আমি নারীদের ডেকে ডেকে কি কথাটী বল্‌ব, তা কি অনুমান কত্তে পার না মায়েরা? আমি কি বল্‌ব না, হে আমার কুমারী মায়েরা, সধবা মায়েরা, বিধবা মায়েরা, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধনার বলে এমন মহত্ত্ব অর্জ্জন কর, যার মহিমায় বিক্ষুব্ধ সমুদ্রতুল্য বাসনা-চঞ্চল অস্থির পুরুষগুলির মন একটা নিমেষে স্থির হ'য়ে যায় এবং তোমাদের মহত্ত্বকে স্বীকার ক'রে নিয়ে নিজেরাও মহত্ত্ব অর্জ্জনে বদ্ধপরিকর হয়।

নূতন যুগের নব-ভারতের অরুণোদয়-কালে বাঙ্গালী কবি যে গেয়েছিলেন,—

"না জাগিলে যত ভারত-ললনা
এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।"

এই কথা যে বেদ বাক্যের মতন সত্য, সে কথা তোমরা বিশ্বাস কর। দেহের দিক্ দিয়ে মানুষ একটা জন্তু মাত্র কিন্তু মনের দিক্ দিয়ে তার উন্নতি-সম্ভাবনার অন্ত নেই। পুরুষগুলি যে দিগ্‌বিদিগে একেবারে জন্তুর মতই বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে এবং একটা পুরুষ দশটা নারীর কাছে ভীতিপ্রদ আতঙ্কিত বস্তুতে পরিণত হয়েছে, সে ত' জান্তব চেতনার ঊর্দ্ধে কেউ নিজেদের মনকে টেনে নিতে চেষ্টা কর্ল্ল না ব'লেই। পুরুষদের মনোগতির এই অধঃপাত-মুখিতা দূর করার কাজে তোমাদের দৈব-শক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন অতীতেও ছিল, আজ ত' আছেই, ভবিষ্যতেও থাক্‌বে। তোমরাই একদা মানুষকে ঘর বাঁধতে শিখিয়েছিলে, মন বাঁধবার সাধনায়ও পুরুষের সিদ্ধিদাত্রী মা তোমরাই হবে। পুত্র-রূপে, ভ্রাতা-রূপে, পতি-রূপে, বন্ধু-রূপে, আত্মীয়-রূপে, অনাত্মীয়-রূপে যেখানে যে পুরুষ তোমাদের ক্ষণিকের সান্নিধ্যেও আসবে, তোমরা তাকে তোমাদের দেব-দুর্ল্লভ মহত্ত্বের মহিমায় বাসনা-বিজয়ী মহাপুরুষে পরিণত হ'তে প্রেরণা যোগাও।

অতঃপর নারীর স্বাবলম্বন, স্বাধিকার, সমাজে, রাষ্ট্রে ও

গৃহে নারীর বিচিত্র কর্ত্তব্যের দায় এবং তাহা উদ্‌যাপনের উপায় প্রভৃতি সম্পর্কে বহুবিধ কথা বলিয়া দুই ঘণ্টায় শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন।

মাধবসিংহ

৫ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৪২

(২২শে অক্টোবর, ১৯৩৫)

গুরুর গুরুত্ব

একটী জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, গুরু যখন দীক্ষা দেন, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মদান করেন। তিনি তাঁর নিজের শক্তি, সিদ্ধি, আয়ু ও অভিজ্ঞতা সবই শিষ্যের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করেন। তিনি তখন নিজের জন্য কোনো স্বার্থ, কোনো বাসনা, কোনো বিশেষ সুবিধা লাভের অভিপ্রায় মনে মনে পোষণ করেন না। এই জন্যই চিরকাল তিনি ওজনে গুরু, ব্যক্তিত্বে গুরু, আচরণে গুরু থাকেন। এমন নিষ্কাম নিঃস্বার্থ গুরু যদি পাও, নিঃসঙ্কোচে দীক্ষা নিতে পার। গুরুর নিঃস্বার্থপরতায়, নিষ্কামতায়, নিষ্কলুষ জীবন-যাপন-প্রণালীতে যদি বিশ্বাস না কত্তে পার, তবে হাজার লোকে ঘাড়ে ধ'রে তোমাকে দীক্ষার ঘরে নিয়ে যেতে চাইলেও কদাপি দীক্ষা নেবে না। এইটী আমার এক সাবধান-বাণী।

দুঃস্বপ্ন দর্শন

অপর একজন জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দুঃস্বপ্ন দেখেছ ত' কি হয়েছে? স্বপ্ন মাত্রেই ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস নয়। অধিকাংশ স্বপ্নই তোমার অবচেতন মনে গোপনে লুক্কায়িত বাসনার আত্মপ্রকাশ। এটা ত' তাহ'লে ভালই। নিজের যে সুপ্ত বাসনার খোঁজ কোনো প্রকারেই পাচ্ছিলে না ব'লে তার সঙ্গে যুদ্ধ করা যাচ্ছিল না, এবং যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে নিজেকে স্থায়ী ভাবে সুন্দরতার পথে আরূঢ় কত্তে পচ্ছিলে না, স্বপ্নে সেটা ধরা প'ড়ে গেল। দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে যেয়ো না। বরং ঈশ্বরের নাম জপ ক'রে মনকে শান্ত ক'রে নাও। কামমূলক দুঃস্বপ্ন দেখেছ। বেশ ত', নিজ জননাঙ্গের মূলদেশে পরমেশ্বরের বা পরমগুরুর উপস্থিতি চিন্তা কত্তে কত্তে অবিরাম নামজপ কর। আতঙ্ককর ভীতিমূলক দুঃস্বপ্ন দেখেছ? ক্ষতি কি? নিজের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পরমেশ্বরের অবস্থিতি চিন্তা কত্তে কত্তে অবিরাম নামজপ কর। ক্রোধমূলক দুঃস্বপ্ন দেখেছ? পরোয়া ক'রো না। নিজের কণ্ঠমূলে পরমেশ্বরের উপস্থিতি চিন্তা কত্তে কত্তে অবিরাম নামজপ কত্তে থাক। শারীরিক ক্লেশ, ব্যাধি, উৎপীড়ন সম্পর্কিত দুঃস্বপ্ন দেখেছ? ভয় নেই। মেরুদণ্ডের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মনকে কেবল সঞ্চালিত কত্তে থাক আর ভাবো যে, পরমেশ্বর ঐখানে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে

নামজপ কত্তে থাক। এলোমেলো, অর্থহীন, পারম্পর্য্যহীন, বিদ্‌ঘুটে সব স্বপ্ন দেখেছ? ক্ষতি কি? মস্তিষ্কের পিছন দিকে, ঘাড়ের কাছটায় একটুখানি উপরে, পরমেশ্বরের উপস্থিতি চিন্তা কত্তে কত্তে নামজপ ক'রে যাও। দুঃস্বপ্নের কুফল থেকে নিজেকে নির্ম্মুক্ত ও নিরাময় করার পক্ষে এই উপায়গুলিই যথেষ্ট।

নামে রুচি

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— ইষ্টনামে রুচি এলে নাম জপতে আপনা আপনিই ভাল লাগে, নাম যে মিষ্টি, নাম যে মধুর, নামে যে কত আনন্দ, তা' ব'লে ব'লে আর মনকে বুঝ মানাতে হয় না। বাচ্চা শিশু অন্নপ্রাশনের দিনে মিষ্টি পায়সান্নও ফেলে দিতে চায়, অভ্যাস নেই ব'লে সে মিষ্টি রসের আস্বাদ পেয়েও তার প্রতি রুচি বোধ করে না। কিন্তু রুচি এসে গেলে নিমের দাঁতনের তিক্ত রসটাও মানুষের কাছে স্বাদু মনে হয়। বারংবার নাম কত্তে কত্তে, বহুবার নামে বসতে বসতে, অনুক্ষণ নাম স্মরণ কত্তে কত্তে নামের সঙ্গ ক'রে যাবার একটা উন্মাদক অভ্যাস এসে যায়, তখন নাম ছাড়া অন্য কিছুকে আর ভালই লাগে না। তখন বৃথা কথা ক'মে যায়। তখন বাক্‌চপলতা থেমে যায়। তখন চিত্তবৃত্তির চঞ্চলতা উপশান্ত হয়। তখনই বলা চলে যে, নামে রুচি এসেছে। তানসেনের

গানের চেয়েও তখন নামের ধ্বনি অধিকতর মধুর মনে হয়। এই রুচি তোমাদের হোক্, আমি এইটুকুই চাই, এইটুকুই তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি।

রূপ-প্রতীক ও ধ্বনি-প্রতীক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নাম যেমন একটা ধ্বনি, নাম তেমন একটা রূপও। যেমন প্রণব-মন্ত্র। তার রূপটী হচ্ছে ওকারের উপরে একটী চন্দ্রবিন্দু। এই রূপটুকু মানুষের কল্পনা। "ওঁ" বর্ণটী একটা নির্দ্দিষ্ট ধ্বনির স্মারক, চন্দ্রবিন্দু তাতে অনুনাসিকতার স্মারক। প্রণবের কোনো রূপ হ'তে পারে না কিন্তু ওঁ এই রূপটী ঐ অনাহত ধ্বনির একটী স্মারক। এই স্মারক-চিহ্নটী মানুষের কল্পনার মুখে আবিষ্কার। একটা রূপ-প্রতীক দিয়ে একটা ধ্বনি-প্রতীককে বুঝিয়ে দেওয়ার এটা একটা কৌশল। এই কৌশল যাঁরা আবিষ্কার করেছেন, তাঁরাই জানেন এর প্রকৃত রহস্য, তাঁরাই জানেন এর নিগূঢ় মর্ম্ম। কিন্তু আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। প্রতীকী-পন্থা ছাড়া অজানাকে জানার, অধরাকে ধরার উপায় নেই ব'লেই ত' বৈজ্ঞানিক জগতের, কি সাধন-জগতের ধুরন্ধরেরা প্রতীককে সত্যাভিসারী লক্ষ্যে প্রায়োগ বা ব্যবহার করেছেন। এটা যে সভ্য জগতের প্রতি তাঁদের কত বড় অবদান, তা' ভাবতে গেলে অবাক্ হতে হয়। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানীরা যে গ্রহ-সমাবেশ

বা গ্রহাবির্ভাব বা একটী গ্রহের সঙ্গে অপর কোনও গ্রহের সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ব্যাপারে গাণিতিক কতকগুলি অঙ্কের ব্যবহার করেন, তাও প্রতীকী ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওঙ্কারও সেইরূপ একটী প্রতীক। তবে এটী একটী অভাবনীয় প্রতীক। রূপময় প্রতীক হ'য়ে ওঙ্কার তোমার পূজাবিগ্রহ বা ধ্যানের আলম্বন, ধ্বনিময় প্রতীক হ'য়ে ওঙ্কার তোমার নিত্যকাল মননের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম আশ্রয়।

রুচির সার্ব্বাঙ্গিক পরিণতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওঙ্কারে রুচি এলে কেউ কেউ সর্ব্বক্ষণ ওঙ্কারধ্বনি শুনতে পায়। শুনতে পায় নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র। আকশে, বাতাসে, নদীতে, নীরদে, পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গে এমন কি নিজ শরীরের প্রতিটি রোমকূপে এবং অণুপরমাণুতে। ওঙ্কার-রূপে রুচি এলে এই প্রতীক সে দেখ্‌তে পায় ঘরে, বাইরে, মন্দিরে, মাঠে, আকাশে, আঙ্গিনায়, বনে, পর্ব্বতে, সাগরে, মরুভূমিতে। শুধু তাই নয়, সর্ব্বপ্রকার দর্শনে, স্পর্শনে, ঘ্রাণে, শ্রবণে, আস্বাদনে সে ওঙ্কারকেই বারংবার পায় নিকট হ'তে নিকটতর রূপে। প্রশ্ন কত্তে পার, চোখে কিছু দেখ্‌লে বা কাণে কিছু শুন্‌লে জিহ্বায় আবার মধুস্বাদ বোধ হবে কেন? যুক্তি দিয়ে জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, কারণ, এটা প্রত্যক্ষ করা একটা ব্যাপার।

রুচি যখন ঘনীভূত, তখন একটী ইন্দ্রিয়ের সুখাস্বাদনের মধ্য দিয়ে সর্ব্বেন্দ্রিয় যার যার যোগ্য পরিতৃপ্তি অর্জ্জন ক'রে থাকে, একথা উপলব্ধ সত্য।

ধর্ম্ম-প্রচার বনাম ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার

অপর এক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্ম আমার নিকটে কতকগুলি আচারের সমষ্টি নয়, ধর্ম্ম আমার প্রাণসত্তা, ধর্ম্ম আমার জীবন-চেতনা। আমি যে কথা বলি, পত্র লিখি বা যে কাজ করি, তা' আমার প্রাণসত্তার প্রভাবে, আমার জীবন-চেতনার প্রেরণায়। এই জন্যই আমি ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম নিয়ে কোনো বক্তব্য পেশ করি না, আমি মানুষকে শুধু সৎ হ'তে বলি আর সঙ্গে সঙ্গে নিজে যতটা পারি, সৎ হ'য়ে চলবার চেষ্টা করি। ধর্ম্মমতদাতার অভাব পৃথিবীতে কোনও কালেই নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। ধর্ম্মোপদেশের দুর্ভিক্ষ জগতে কখনো হবে না। কিন্তু অপরের অনিষ্ট বর্দ্ধন না ক'রে নিজের জীবনকে কলুষমুক্ত ক'রে চলার আদর্শকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাই বাস্তব পক্ষে প্রকৃত দুর্ল্লভ ব্যাপার। ধর্ম্ম পালনের বহিরঙ্গ লক্ষণগুলিকে কোনও প্রকারে বজায় রেখে চললেই মানুষ তার প্রাপ্য কৃতকৃতার্থতা অর্জ্জন কত্তে পার্ব্বে না, সে তা লাভ কর্ব্বে শুধু আত্মসমাহিত ধ্যান-দৃষ্টির বলে। তা' কত্তে হ'লেই চাই ব্রহ্মচর্য্য, যাকে ঋষিরা নাম দিয়েছেন

'তপোত্তমম্'। তুমি প্রশ্ন কচ্ছ যে, আমি ধর্ম্মের বিষয় নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা না ব'লেই ব্রহ্মচর্য্যকে নিয়ে এত কথা কেন বলছি। আমার ধর্ম্মমত আমি জগৎকে দিয়ে গ্রহণ করাতে আদৌ আগ্রহী বা রুচিসম্পন্ন নই। যাঁর যে ধর্ম্মমত আছে, তিনি তাই নিয়েই এগিয়ে আসুন ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা কত্তে, যার ফলে তিন শতাব্দী পরে বর্ত্তমান মানবের এক নবপ্রজাতির আবির্ভাব সম্ভব হবে। তাঁরা হবেন দেব-মানব।

পরীক্ষা ও নামজপ

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরীক্ষায় ফেল করলে ভগবানকে গালি পাড়বে যে, কেন নির্ব্বংশের বেটা তোমাকে পাশ করিয়ে দিলেন না, এটা আমার মতে একটা পাগলামি। তিনি তোমাকে তোমার সাধনানুযায়ী মেধা, বুদ্ধি, শ্রমশক্তি দিয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার ক'রে তুমি জীবনের প্রত্যেকটী কৃতিত্ব অর্জ্জন কর্ব্বে, তার সৎপ্রয়োগের ফলে তুমি যাবতীয় পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হবে,—এটাই ত' প্রকৃত অভিপ্রায়। মাছ ধরতে হ'লে জাল নিয়ে পুকুরে নামতে হয়। পারে দাঁড়িয়ে হাহুতাশ কর্লে কি ফল হবে? বিদ্যার্জ্জন কত্তে হ'লে এবং বিদ্যাবত্তার পরীক্ষায় পাশ কত্তে হ'লেও তেমন মন দিয়ে পড়াশুনা কত্তে হয়। তুমি পড়াশুনা করো নি কিন্তু অনেক নামজপ করেছ বা হরিনাম-কীর্ত্তন করেছ। তোমার এই গুণের জন্য তোমার ভগবদ্ভক্তি

লাভ হবে, পরীক্ষায় পাশ তুমি তাতে নাও কত্তে পার। ভগবানের নামের গুণ জীবনকে প্রেমময় করা, মোহ থেকে রক্ষা করা, চিত্তকে নিশ্চিন্ত করা। ভগবানের নাম ক'রে ক'রে চিত্তের যে স্থিরতা তোমার এল, তার সদ্ব্যবহার ক'রে যদি পড়াশুনাও মন দিয়ে ক'রে যাও, তবে তার ফলটা পাবে তুমি পরীক্ষার হলে।

ক্ষণিকের ব্রহ্মচর্য্য

জনৈক জিজ্ঞাসুর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্যকে একটা অসম্ভব ব্যাপার ব'লে মনে ক'রো না। বীর্য্যকে ক্ষয়িত করা জীবনের পক্ষে যেমন অনেক সময়ে নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার, বীর্য্যকে স্বেচ্ছায় ক্ষয়িত হ'তে না দেওয়া বা বীর্য্যক্ষয়ের প্ররোচক আচরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখাও তেমনই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস টানা ও ছাড়া যেমন মানুষের পক্ষে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-বিরহিত অবস্থায় কতক কাল অবস্থান করাও মানুষ মাত্রেরই তেমন একটী স্বাভাবিক ব্যাপার। যে ব্যাপারটা স্বল্প সময়ের জন্য মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, সেই ব্যাপারটাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য স্বাভাবিকে পরিণত করাটা অবশ্যই অভ্যাস-সাপেক্ষ। এই অভ্যাস বা অনুশীলনের নামই সাধনা। সীমিত ব্রহ্মচর্য্য পালনে যে সমর্থ, সে ইচ্ছা কর্লে, মানে, সাধন ক'রে গেলে,

সুদীর্ঘায়ত ব্রহ্মচর্য্য নিশ্চয়ই পালন কত্তে পারে। বলের অনুশীলনের ফলে আজকের দুর্ব্বল ব্যক্তি দুচার বৎসর পরে জ্যান্ত বাঘের সঙ্গে লড়াই কত্তে এবং জিতে যেতে সমর্থ হয় অথবা বিরাটকায় হস্তীকে অনায়াসে বক্ষে ধারণ ক'রে সবাইকে অবাক্ ক'রে দিতে পারে। ক্ষণিকের ব্রহ্মচর্য্য যে পালন কত্তে পেরেছে, সে দীর্ঘ কালের জন্যও ব্রহ্মচর্য্য পালন কত্তে পার্ব্বে। এই কথাটী আমি জানি ব'লেই তোমাদের সাময়িক ব্রহ্মচর্য্য পালনের সঙ্কল্পকে নিয়ত অভিনন্দিত করি।

অবিবাহিত যুবকের ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বল্প স্বল্প হ'লেও তোমরা প্রতিজনে ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে যেতে থাক। সীমিত ভাবে হ'লেও সেই ব্রহ্মচর্য্যের কৌলীন্য কদাচ বিস্মৃত হয়ো না। জনে জনে যখন ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য আগ্রহী হবে, তখন তোমাদের সকলের সম্মিলিত আগ্রহ এমন একটী পরিবেশের সৃষ্টি কর্ব্বে, পবিত্রতায় যা' দিব্য, কিন্তু বাইরের লোক তার বিষয়ে কিছুমাত্র জানতে না পেরেও তোমাদের প্রতিটী কার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হবে। ব্রহ্মচর্য্য পালনের কথা বাইরে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করতে নেই। সেই সঙ্কল্পটীকে মনের ভিতরে দৃঢ়-রূপে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হয়। সবাই মিলে কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করেই দেখ না কেন যে এর ফলে তোমাদের

ভিতরে কি অসাধারণ কর্ম্মশক্তির উদ্দীপনা ঘটে। অবিবাহিত যুবকদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্রত রক্ষা সহজতর। এই জন্যই প্রকৃত দেশকল্যাণকামীরা যুবকদের দিকেই নিজেদের প্রত্যাশার দৃষ্টি সঞ্চালিত করেন।

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিবাহিতেরাও সস্ত্রীক ব্রহ্মচর্য্য পালন কত্তে পারে। অনেক স্থানেই বিবাহিত দম্পতীর এই ব্রহ্মচর্য্য দেশকল্যাণের বিরাট মূর্ত্তি পরিগ্রহণ ক'রে আত্মপ্রকাশ করে। তার লক্ষণ আমি স্থানে স্থানে দেখেছি। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য যখন ব্যাপক ভাবে অনুশীলিত হবে, তখন দেশসেবার কাজে ভণ্ডামি করার প্রয়োজন ক'মে যাবে। ভণ্ডদের দৌরাত্ম্যও কমবে। বিশ্বাস ক'রো যে, আমি যা' প্রত্যক্ষ করি নি, তেমন কথাকে সত্য ব'লে কদাচ প্রচার করি নি।

উত্তর কৃষ্ণরামপুর (নোয়াখালী)
৬ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৪২
(২৩শে অক্টোবর, ১৯৩৫)

নিশিকান্ত মজুমদার

প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীবাবামণি উত্তর কৃষ্ণরামপুর আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে একদল ভক্তলোক

কীর্ত্তন করিতে করিতে আগাইতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের পদ হইতেছে,—

"গৌরাঙ্গ নগরে এল
জগদ্‌বাসী হরি বল।"

শ্রীশ্রীবাবামণি আপত্তি করিলেন। বলিলেন,—শ্রীগৌরাঙ্গ ত' এখন এখানে আসেন নি। আপনারা এ কীর্ত্তন কত্তে পারেন না।

একজন বলিলেন,—সে কি কথা! আমরা আপনাকেই শ্রীগৌরাঙ্গ ব'লে জ্ঞান কচ্ছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার আপত্তিটা ত' ঐখানে। আমাকে শ্রীগৌরাঙ্গ ব'লে মনে কত্তে থাক্‌লে তাঁর নিষ্ঠাবান্ ভক্তের প্রাণে বেদনার সঞ্চার হ'তে পারে। কোনও মহাপুরুষের মূর্ত্তিকে যদি আপনারা শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তির সঙ্গে সমান আসনে বসান, নিশ্চয়ই গৌরভক্তরা রুষ্ট হবেন। সবাই না হ'তে পারেন, কেউ কেউ নিশ্চয়ই হবেন। আপত্তি শুধু একাসনে বসবার জন্যই উঠ্‌বে না, কাকে দক্ষিণে আর কাকে বামে বসালেন, একথা নিয়েও তুমুল কলহ উঠ্‌বে। শ্রীগৌরাঙ্গকে আপনারা অবতার ব'লে জ্ঞান করেন। এমন অবস্থায় আমার মতন একটা সামান্য মানুষকে অবতারের প্রতিনিধি-স্থানীয় মনে করা কি ঠিক হবে?

নিশিবাবু বলিলেন,—আপনি ত' সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের

পক্ষপাতী। আমরা যদি আপনার ভিতরে ব্রহ্মদর্শন ক'রে থাকি, তবে আপনার আপত্তিটা টেকে কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাকে যদি ব্রহ্ম ব'লে মানেন, তবে নিজেকেও ব্রহ্ম ব'লে ভাবুন। আর কীর্ত্তন যদি কত্তে হয়, তবে করুন হরিওঁ, যার মানে হচ্ছে,—ঈশ্বর আছেন। তিনি ব্রহ্ম রূপেই থাকুন, জড় বস্তু রূপেই থাকুন, আত্মা রূপেই থাকুন বা অন্য যে-কোন রূপেই থাকুন, হরিওঁ বল্লে তাঁর সব রকমের প্রকাশকে ও সব রকমের সত্তাকে মানা হয়।

নিশিবাবু বলিলেন,—আজ আমরা গৌরাঙ্গ ব'লে কীর্ত্তন শুরু করেছি, আজ তাই ক'রে যাব, যতক্ষণ আপনি গন্তব্য স্থানে না পৌঁছন। কিন্তু কাল থেকে হরিওঁ ধরব।

অবতার-বাদ ও ব্রহ্মবাদ

গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পরে জনতা কমিয়া গেলে একজন প্রশ্ন করিলেন,—অবতার-বাদই বা কি জিনিষ, ব্রহ্মবাদই বা কি জিনিষ। এই দুইটীর মধ্যে পার্থক্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি এই দুইটী তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য কিছু দেখি না কিন্তু ভক্তেরা দেখেন। ব্রহ্মবাদীরা মনে করেন, রামচন্দ্রও ব্রহ্ম, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, বিভীষণ আদিও ব্রহ্ম, এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই। অবতারবাদীরা মনে

করেন, বিষ্ণু—ব্রহ্মা নয়, মহেশ্বর নয়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সম্মিলিত সত্তা নয়,—স্বয়ং বিষ্ণু ধরাতলে নরদেহ ধারণ ক'রে জীবের কল্যাণার্থে আবির্ভূত হয়েছেন এবং যে ভাবে যার কল্যাণ হবে, সে ভাবে তাকে দিয়েছেন অনন্ত কল্যাণ, অফুরন্ত কুশল, তাঁকে ভগবান্ জেনে পূজা করা কর্ত্তব্য, তাঁকে পূজার্চ্চনা, তাঁর ধ্যান-ধারণা, তাঁর লীলা-স্মরণ প্রভৃতি দ্বারা দুঃখের হাত থেকে মুক্তি মিলে, নিত্যানন্দ-ধামে শাশ্বত আশ্রয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মবাদী বিশ্বের পরম ও চরম অবিসংবাদিত সত্যকে ব্রহ্ম ব'লে জানেন এবং সেই অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয়, অপরূপ, অতুলন তত্ত্বের বিকাশকে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি বৈচিত্র্যের মধ্যে দর্শন ক'রে জ্ঞান বা পরমবোধি লাভ করেন, যা' হ'ল অক্ষয় আনন্দের উৎস বা ভাণ্ডার। অবতারবাদী নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন না, কেননা নিজে না থাকলে ভজন-পূজনটুকু করবে কে? ব্রহ্মবাদী সাধনের প্রারম্ভে নিজের অস্তিত্বে আস্থাশীল কিন্তু সাধনের শেষ যামে তাঁর নিজস্ব অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও বোধ বা স্বীকৃতি নেই, কারণ তখন কোটি ব্রহ্মাণ্ড একটী মাত্র পরম তত্ত্ব ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়, দ্বিত্ব বা দ্বিত্ববোধ কোনোটাই থাকে না। মনন-ক্রিয়ার দিক থেকে উভয় বাদই এক রকম। উভয়তই চাই অবিরত স্মরণ, চাই অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা, চাই সুবিপুল ধৈর্য্য, চাই প্রলয়কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করার শক্তি, চাই সংযম, সদাচার, ব্রহ্মচর্য্য।

দুটোরই ব্যবহারিক পরিণতি কিন্তু এক,—সর্ব্বজীবের প্রতি করুণা ও প্রেম, সর্ব্বভূতে সমদর্শন। ব্যবহারিক পরিণতিতে যদি এর ব্যত্যয় দেখা যায়, তবে অনুমান কত্তে হবে যে, তত্ত্ববাদগুলি সব কেবল মুখের বুলি, সাধনের ঘরে দারুণ ফাঁকি হয়ত ঢুকে আছে।

অপরাহ্ণে যাইতে হইল কালীরহাট নামক গ্রামে। পূর্ব্ব বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অনেক শ্রোতা ও শ্রোত্রী সেখানে জড় হইয়াছিলেন। ব্যবস্থাটা কৃষ্ণরামপুরের ভদ্রমহোদয়েরাই গায়ে পায়ে খাটিয়া-খুটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। জনতা প্রত্যাশাতীত অধিক হইয়াছিল। শ্রোতাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ছিল।

হিংসা ও বিদ্বেষ

ভাষণ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দরিদ্র লোকেরা মনে করে,—'আমরা যে চির-দরিদ্র, তার কারণ ঐ অবস্থাপন্ন লোকগুলি, যারা প্রতি পদে আমাদের ধনার্জ্জনের সম্ভাবনাকে কেবল রুখে রুখে দিচ্ছে।' অশিক্ষিত লোকেরা মনে করে,—'আমরা যে নিরক্ষর অজ্ঞান, এর জন্য দায়ী ঐ শিক্ষিত সম্প্রদায়, যারা নিজেদের বিদ্যার বলে সমাজে শ্রেষ্ঠ আসনগুলি অধিকার ক'রে আমাদিগকে কেবল দাবিয়ে রাখবার জন্যই নিজেদের সকল যোগ্যতার অসদ্‌ব্যবহার কচ্ছে।' বিভিন্ন ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা প্রায়ই একথা

আলোচনা করে,—'ঐ দেখ, ওরা আমাদের ধর্ম্মকে কোণঠাসা ক'রে ফেলবার জন্য কত রকমের আয়োজন কচ্ছে, কত প্রকারের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার কচ্ছে। এর ফলে পরিণামে দেশটার ভিতরে আমাদিগকে শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে কাল কাটাতে কি হবে না? অতএব, ভাই সব, ওঠ, জাগ, লাঠি ধর, কিরিচ শানাও, ছুরি ধার কর, তৈরী মশালে আগুন ছোঁয়াও, যেন এক নিমেষে সকলের সকল ষড়যন্ত্রকে পরাহত ক'রে ভস্মস্তূপে পরিণত করা যায়।' হীনমন্যতা মানুষের মনে এই ভাবে নিরন্তর হিংসা, বিদ্বেষ ও অপ্রীতিকে ইন্ধন দিয়ে বেড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতি দেশের পক্ষে মঙ্গলাবহ নয়। পরিণামে যেই দলই বেশী লাভবান হোক্, সংশ্লিষ্ট সকল দলেরই এতে নিদারুণ ক্ষতি। লোকক্ষয়, ধনক্ষয় বা সম্মানে আঘাতই এই ব্যাপারে শেষ কথা নয়। হিংসা-বিদ্বেষ-প্রসূত এই সকল দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ সব চেয়ে বেশী আঘাত করে মানুষের চারিত্রিক শক্তির মূলদেশে।

অসাম্প্রদায়িকতা ও সর্ব্বজনীন সম্প্রীতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঈর্ষ্যাক্লিষ্ট মনে এই সব আলোচনা না ক'রে প্রত্যেক মানুষের মনে এইরূপ বিচার-বুদ্ধির উদ্রেক ঘটা প্রয়োজন যে, অপরেরা যদি পরিশ্রম

ক'রে, খেটে খুটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দারিদ্র্যের সঙ্গে পুরুষাক্রমিক ভাবে সংগ্রাম ক'রে নিজেদের আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি সাধন ক'রে থাকে, তবে সে কাজ সে ভাবে আমরাও কত্তে পারি। আমরা যদি চোখমুখ খোলা রেখে, চারদিকের হালচাল বুঝে, আলস্যহীন ভাবে অবিরাম অধ্যয়নশীল হই, আমরাও নিজেদের দারিদ্র্য নিজেদের শক্তিতেই দূর ক'রে নিতে পার্ব্ব। যাঁরা বিদ্যার্জ্জন ক'রে সমাজের শীর্ষ দেশে উঠেছেন তাঁরা পরিশ্রম ক'রেই বিদ্যার্জ্জন করেছেন। আমাদেরও পরিশ্রম ক'রে বিদ্যার্জ্জন কত্তে হবে। যাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে সাধন-পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তাঁরা নিজ নিজ সমাজের উন্নতির জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন ব'লেই যে তার ফলে আমাদের সমাজের ক্ষতিই হবে, এই অমূলক আশঙ্কা মন থেকে দূর ক'রে দিতে হবে। নির্দ্দিষ্ট কোনও ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদের সংহতি-প্রয়াস মাত্র তখনই অন্যান্য ধর্ম্মালম্বীদের কাছে আশঙ্কার কারণ হতে পারে, যখন কোনও সম্প্রদায় একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস কর্ব্বে যে, তার ধর্ম্মমত তার ধর্ম্মপথ ছাড়া অন্য সকলের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মপথ মিথ্যা। অপরের ধর্ম্মবোধ বা ধর্ম্মাচরণকে আঘাত না ক'রেও নিজেদের ধর্ম্মীয় আচরণবিধি নিষ্ঠার সহিত পালন করা যে যায়, এই কথাটা প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদের বুঝতে হবে। ধর্ম্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং কলহ যদি এই

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাদীপ্ত সূর্য্যালোকেও সম্ভব হয়, তবে বুঝতে হবে যে, শতাব্দীগুলি কেবল বয়সেই বেড়ে যাচ্ছে, মহিমায় হয়ে থাকবে খর্ব্বাকৃতি বামন মাত্র। জগতে ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু জগতে ঈশ্বর কখনো দুই জন নেই। একই ঈশ্বরকে নানা জনে নানা ভাবে ভজনা কত্তে পারে, কিন্তু সকলেই ঈশ্বরকে লক্ষ্য ক'রে চলেছে, শয়তান কারোই লক্ষ্য নয়। আমি একটী ধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে আছি ব'লে অপর এক জনের ধর্ম্মীয় আচরণ আমার পক্ষে পরধর্ম্ম, অতএব অনবলম্বনীয় কিন্তু যার যেটি ধর্ম্মীয় পথ, তাকে তাতেই চল্‌তে হবে। আমি একটী ধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে চলেছি ব'লে অন্য পথাবলম্বীকে আমার দ্বেষ কত্তেই হবে, ঘৃণা কত্তেই হবে, উৎপীড়ন কত্তেই হবে,—এগুলি কদাচ ধার্ম্মিকের মনোভঙ্গী হ'তে পারে না, ধার্ম্মিকের আচরণ হতে পারে না। ধর্ম্ম মানুষকে পৌঁছে দেয় পরমেশ্বরের চরণ-প্রান্তে, যেই পরমেশ্বরের কাছে খ্রীষ্টান আর হিদেন সমান, মুসলিম আর কাফের সমান, হিন্দু আর ম্লেচ্ছ সমান। যাদের কাছে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, ইসলাম ধর্ম্ম বা হিন্দু ধর্ম্ম পৌঁছে নি বা পৌঁছুতে পারে নি, পরমেশ্বর তাঁর নিজের গরজে তাদের ভিতরে নিজেই প্রবেশ করেছেন তাদের প্রতিজনকে তাদের মস্তিষ্কের গঠন এবং মানসিক প্রকৃতির অনুযায়ী ভাবে: পরমেশ্বর ত্রিভুবনে প্রতিজনকে একটা না একটা, এক প্রকারের না এক প্রকারের ধর্ম্মবোধ দিয়ে তা'দিগকে নিজের দিকে

আকর্ষণ করার স্থায়ী ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। পরমেশ্বরের প্রেরিত মহাজনেরা যে বিশেষ বিশেষ যুগে আবির্ভূত হয়ে আদিম-বুদ্ধির মানব-সমাজকে উন্নততর সূক্ষ্মতর সুচারুতর পন্থার নির্দ্দেশ দিয়েছেন, এটাও যেমন ঈশ্বর-করুণা, যেখানে কোনো ধর্ম্মাচার্য্যের, কোনো পীর-পয়গম্বরের, কোনো প্রফেট বা অ্যাপস্লের নিজের বা তৎ-শিষ্যবর্গের কারো প্রবেশাধিকার ঘটে নাই, এমন স্থানগুলিতেও এমন মনগুলিতেও ভগবান্ নিজের গরজে ধর্ম্মবোধের সৃষ্টি ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং যত প্রকারের মানুষ, তত প্রকারের ধর্ম্মমত জগতে থাক্বেই। এই সরল সত্যটি স্বীকার ক'রে নেওয়া প্রত্যেকেরই উচিত এবং এই সত্যটী স্বীকার কর্ল্লেই আর সাম্প্রদায়িকতা রূপ মহাব্যাধির বিস্তারের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। "অসাম্প্রদায়িকতা" একটী এমন শব্দ, যার মর্য্যাদা আকাশস্পর্শী। "সর্ব্বজনসম্প্রীতি", তেমনি আর একটী শব্দ, যার মহিমায় বিশ্বের সমস্ত জাতি একদা এক হবে।

মানুষ হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধনী হও, দরিদ্র হও, বিদ্বান্ হও, মূর্খ হও, হিন্দু হও, মুসলমান হও, খ্রীষ্টান হও, বৌদ্ধ হও, তোমাদের প্রত্যেককে কিন্তু আমি একটী কথা নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারি যে, চরিত্রহীনতা বর্জ্জন কর, খলতা-প্রবঞ্চনা পরিহার কর, পরুষ কর্ম্ম ছেড়ে দাও, মানুষমাত্রের প্রতি

প্রীতিশীল হও, সংযম পালন কর, সাধ্যমত বীর্য্য ধারণ কর, নিজ ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা যাতে অটুট স্বাস্থ্য, অনমনীয় চরিত্রবল ও সর্ব্বজীবে প্রেমবুদ্ধি নিয়ে আবির্ভূত হ'তে পারে, তার অনুকূলে কর জীবনের প্রতিটি কর্ম্ম। তুমি কতখানি হিন্দু, কতখানি মুসলমান, কতখানি খৃষ্টান, কতখানি বৌদ্ধ, ওটা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তুমি কতখানি মানুষ, এইটুকুই আমার বিবেচ্য। তুমি যে ধর্ম্মাবলম্বীই হও, তুমি যদি মানুষ না হ'য়ে একটা পশু হও, তবে তাতে আমার ক্ষতি অপূরণীয়। আমি ভবিষ্যতের দেবমানবদের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ব'সে ব'সে কাল কাটাব। তুমি যদি মানুষ না হও, হও একটা আস্ত জানোয়ার, তবে যে তোমার ঘরে মনুষ্যাকৃতি জানোয়ার সব আবির্ভূত হবে। একদা মানুষ জানোয়ারই ছিল। কত যুগ যুগান্তর ধরে তপস্যা ক'রে ক'রে সে বর্ত্তমানের উন্নত স্তরে পৌঁছেছে। সে যদি তোমার চরিত্রগত অসতর্কতার ফলে, তোমার আচরণগত উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে, তোমার ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টিহীন অন্ধ কামাতুরতার ফলে আবার ফিরে আদিম পশুত্বের দিকে যাত্রা শুরু করে, তবে তাতে তোমারই বা লাভ কি, জগতেরই বা লাভ কি? আমার ত' তাতে হবে সদ্যঃ সদ্যঃ সর্ব্বনাশ। আমার জীবনের সমস্ত কল্পনা, সমস্ত ধ্যান, সমস্ত আরাধনা যে তাতে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারই জন্য আমার একমাত্র আকুতি, মানুষ হও, তোমরা মানুষ হও।

হিংসার শেষ নাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হিংসা এবং বিদ্বেষের বশে, ঈর্ষ্যা এবং পরশ্রীকাতরতার মূলে যখন আত্মোন্নতির প্রয়াস বাড়তে চায়, তখন সে নিয়ত আত্মখণ্ডনের দোষে দুষ্ট হয়। তখন তার প্রতিটি কার্য্যক্রমের ভিতরে সকলের দৃষ্টির অগোচরে সর্ব্বনাশের বীজানু প্রবেশ করে। এই বীজানুটীর নাম চরিত্রহীনতা। ঈশ্বরে অবিশ্বাসের নানা নাম আছে। একটীর নাম বিদ্বেষ, অপরটীর নাম হিংসা। ঈশ্বরে অবিশ্বাসের এরা দুটি উগ্রমূর্ত্তি। বিদ্বেষ নিজেই উগ্র, হিংসা উগ্রতর। যা' চাই ব'লে মনে কচ্ছ, হিংসা ও বিদ্বেষ তা' তোমার করতলগত ক'রে দিলেও দিতে পারে কিন্তু তারপরে সময়মত দেখে অবাক্ হবে যে, পরশুরামের কুঠারের মত চারিত্রিক দুর্ব্বলতা তোমার সারা অঙ্গে সেঁটে বসে আছে। জোঁকের মতই সে তোমাকে ধরে রেখেছে কিন্তু এমন কোনো চূণ তোমার হাতে নেই, অথবা এত চূণ তোমার নেই যে, সর্ব্বাঙ্গব্যাপী এই অনাচারের কৃষ্ণকায় প্রেতগুলিকে অঙ্গ-ছাড়া কত্তে পার। একবিংশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় ক'রে মহাতপস্বী ভার্গব অর্থাৎ পরশুরাম স্থির কর্ল্লেন যে, অত্যাচারী ক্ষত্রিয়-কুলের যথেষ্ট শাস্তি যখন হ'য়ে গিয়েছে, তখন আর হিংসার প্রয়োজন নেই, দেই পরশুখানাকে ফেলে। কিন্তু পরশু আর তাঁর

হস্তচ্যুত হ'ল না। সেই পরশুকে হস্তচ্যুত করার জন্য তাঁকে আবার পরশুরাম-কুণ্ডে বসে বারো বৎসর তপস্যা কত্তে হল।

প্রকৃত মুক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সুতরাং সবে আজ চিন্তা কর যে, কি সেই পথ, যে পথে চললে জাতি, সমাজ, সম্প্রদায় পরিবার ও ব্যক্তি যাবতীয় নিবারণ-যোগ্য দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পায়। সেই মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি, যা' এনে দেবে শান্তি এবং সন্তোষ। ব্রহ্মচর্য্যের সাধনাকে সর্ব্বব্যাপী ক'রে দেবার চেষ্টার মধ্য দিয়েই সেই মুক্তি সহজে করায়ত্ত হবে,— এইটীই আমার মত। পুত্রকে বল সংযমী হও, কন্যাকে বল ব্যভিচারিণী হয়ো না, পত্নীকে বল ধর্ম্ম-কর্ম্মের সহকারিণী হও, হও আমার সর্ব্বপ্রেরণার উৎস-স্বরূপা, স্বামীকে বল হও তুমি আদর্শের মূর্ত্তিমন্ত কল্পপাদপ, যেন তোমার শাখায়, তোমার পত্রে, তোমার ফলে, তোমার মূলে, তোমার বীজনে, তোমার ছায়ায় নিরাপদে এক নূতন সভ্যতা নূতন সংস্কৃতি দিগ্‌বিদিকে জয়ধ্বনি উৎসারিত কত্তে কত্তে জন্মলাভ কত্তে পারে।

বক্তৃতা তিন ঘণ্টাকাল হইল। সর্ব্বশ্রেণীর শ্রোতাদের খুশীতে উজ্জ্বল মুখমণ্ডল বলিতে লাগিল যেন তাহারা সত্যই কিছু অপ্রত্যাশিত সম্পদ লাভ করিয়াছে।

পতি-নির্ব্বাচন ও খামখেয়ালী

দুই তিনটী যুবক এবং একটী কুমারী নোয়াখালী শহর হইতে শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-দর্শনার্থ উত্তর কৃষ্ণরামপুরে আসিয়াছেন। কুমারী মেয়েটীর একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কৈশোরে একটী নবযুবককে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করেছ, এখন পূর্ণ যৌবনে এসে দেখ্‌তে পাচ্ছ, দৃষ্টি তোমার স্বচ্ছতা হারিয়েছে, তার খামখেয়ালিপনার মধ্য দিয়ে তাকে আর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ না, তার উপরে তোমার অবিশ্বাস এসেছে, অথচ দুই পক্ষের অভিভাবকদের আগ্রহ-ক্রমে দুজনের বিবাহ দুচার ছ মাসের মধ্যে হবেই হবে। এমন অবস্থায় তোমার কর্ত্তব্য কি, তা' তুমি জান্‌তে চাচ্ছ। ভাবী বর যদি সত্য সত্যই বিশ্বাসের অযোগ্য হয়, তার অতীতের আবেগ ও উচ্ছ্বাস যদি প্রকৃতই অভিনয় হয়ে থাকে, সে যদি তার জীবনের আর দশটা খামখেয়ালির মতনই তোমার মনকে জয় করার চেষ্টাতে খামখেয়ালিই ক'র্ত্তে থাকে, তার অসততা সম্পর্কে তোমার যদি সন্দেহের লেশমাত্রও না থেকে থাকে, তুমি যদি কল্পনার প্রাবল্যে তাকে ভুল না বুঝে থাক, তাহ'লে তোমার কর্ত্তব্য হবে সবলে নিজেকে এইরূপ বিবাহের সম্ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে আনা এবং নিজের জীবন-পথে নিজে নির্ভয়ে অবিচলিত বিক্রমে চল্‌বার জন্য সাহস ক'রে নেমে পড়া। কিন্তু তোমার

যুক্তিতে, বিচারে, বিশ্লেষণে ও সিদ্ধান্তে যদি কোনো ভুল থেকে থাকে, তবে ত' তুমি একাজ ক'রে নিজের উপরে আর তোমার ভাবী বরের উপরে গুরুতর অপঘাতের সৃষ্টি কর্ব্বে, যা' হ'তে পারে অতীব শোচনীয় এবং চূড়ান্ত ভাবে মারাত্মক। সুতরাং হঠাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চল্‌বে না। ঈশ্বর-সাধনায় মগ্ন হ'য়ে যাও মা। পরমেশ্বর তোমার অন্তরে শুদ্ধ বিবেক-রূপে কি নির্দ্দেশ দেন, সেইটী শোনবার জন্য অহর্নিশ কান পেতে থাক। মন যতই চঞ্চল, অধীর, অস্থির ও ব্যাকুল হবে, ততই বেশী নিষ্ঠা নিয়ে ততই বেশী অভিনিবেশ নিয়ে নামজপ কত্তে থাক।

কুমারীটী বলিল,—আমি শ্রীশ্রীরামঠাকুরের শিষ্যা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—খুব ভাল কথা। যে নাম তিনি দিয়েছেন, সেই নামই জপ করবে। অন্য দিকে মন দেবে না। গুরুকরণের পরে গুরুদত্ত নামকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জেনে তাতে লেগে থাকতে হয়। অন্য সব দিক থেকে মনকে গুটিয়ে আন্‌তে হয়।

স্ত্রীলোকের চরিত্রের নিন্দা শুনিবে না

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীলোকদের চরিত্রের উপরে কটাক্ষ ক'রে কেউ

কোনো মন্তব্য কর্ল্লে সে সব কথাকে একেবারে Summarily dismiss ক'রে দেবে, মানে পত্রপাঠ বিদায় দেবে। স্ত্রীলোকের চরিত্রগত শিথিলতা বা ভ্রষ্টতা সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের আগ্রহ যাদের দেখ্‌বে, তা'দিগকে কদাচ চরিত্রবান্ পুরুষ ব'লে জ্ঞান ক'রো না। স্ত্রীলোকের চরিত্রগত দুর্ব্বলতার সংবাদ শুন্‌তে যদি অন্তরে আগ্রহ অনুভব কর, তাহ'লে জান্‌বে যে, তুমি চরিত্র-স্খলনের দ্বারদেশে এসে উপনীত হয়েছ। নারী মাত্রেই তোমার মাতা বা ভগিনী, এই ভাব রেখে নিয়ত চলবার চেষ্টা ক'রো। মায়ের কুৎসা, বোনের কুৎসা কি কখনো কোনো সৎলোকে শোনে, না এরূপ কুৎসা-রটনাকে প্রশ্রয় দেয়? নারীর মুখে দেখ্‌বে স্বর্গ, নয়নে দেখ্‌বে ব্রহ্মাগ্নি, সর্ব্বাঙ্গে দেখ্‌বে কোটি কোটি তীর্থভূমি, চরণ-ধূলিতে দেখ্‌বে গোলকুণ্ডার স্বর্ণখনি, বাক্যে শুনবে বেদমন্ত্র,—নারী মাত্রেরই প্রতি এইটীই হবে তোমার মনোভঙ্গী। সেই নারীর তুমি শুনবে নিন্দা? নারী-নিন্দাকারীদিগকে এক কথায় ঘরের বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসবে। দুশ্চরিত্র নিন্দকেরা জগতে কত স্বাধ্বী নারীর যে সর্ব্বনাশ যুগে যুগে করেছে, তার কোনো লেখাজোখা নেই।

নারীর পাতিত্যের কারণ

অপর এক যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে সকল নারী নিজেদের রূপ, যৌবন, স্বাস্থ্য,

বিদ্যা, গুণপণা ও বুদ্ধিকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করে এবং ঐ সকলের বিনিময়ে যথেষ্ট অর্থ অর্জ্জন করে, তারা সবাই রমণ-লালসার বশবর্ত্তিনী হ'য়েই এমন কাজ করে, তা' মনে করো না। তাদের অনেকের জীবনে অনেক অবর্ণনীয় দুঃখের ইতিহাসও হয়ত আছে। হয়ত কেউ স্বামীর অকারণ অবিশ্বাসের শিকার হ'য়ে ষড়যন্ত্রে পড়ে গৃহত্যাগ ক'রে পতিতা-পল্লীতে এসে বাসা বেঁধেছে। হয়ত কেউ বা বিমাতার অত্যাচারে কুমারী অবস্থাতেই অনিশ্চিত অন্ধকার-পথে ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছে। হয়ত কেউ সম্পত্তিলোভী প্রতিবেশীর উৎপীড়নে গৃহহীনা হয়ে নোংরা গলির রাস্তায় দাঁড়িয়েছে। হয়ত বা কেউ পরোপকার কত্তে গিয়ে বুদ্ধির অপূর্ণতার দরুণ বিপদে প'ড়ে গেছে আর তারপরে শিকারীর জাল ছিঁড়তে না পেরে কুস্থানেই প'ড়ে রয়েছে গোবর-গাদায় পদ্মফুলের মত। এত সব করুণ ইতিহাস যাদের জীবনে, তাদের প্রতি মানবিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই মনের একটা গোপন সহানুভূতি সর্ব্বসময়েই কাজ ক'রে থাকে। এই সহানুভূতি অতীব গভীর হওয়ারই ফলে কোনো কোনো ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বীর উদার পুরুষ পতিতা-পল্লীতে ভালো মেয়ে কাউকে পেলে নিঃসঙ্কোচে বিবাহিতা স্ত্রী-রূপে এনে গৃহিণী-রূপে স্বগৃহে প্রতিষ্ঠাও করেছেন। তাঁদের সমাজ উদার মনে এই আচরণকে

সমর্থনও করেছেন। তাঁদের ধর্ম্মের বিশ্বালিঙ্গনকারী প্রেম একাজে তাদের বাধা না দিয়ে সাহায্য করেছে।

জালে পড়িও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ত যুবকের পক্ষে এই সহানুভূতি, এই মানবিক বিবেচনা, এই দয়ার্দ্র কোমল মনোভঙ্গী বিপদের কারণ হয়েছে। কু-বন্ধুরা যুবকদিগকে এই সব মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ ক'রে নেবার জন্য অনেক রকম চেষ্টা করে এবং তাতে সব চেয়ে বেশী সফল হয় তখন, যখন নিষ্কলুষ যুবকের মনের স্বাভাবিক সহানুভূতিপ্রবণতাকে তারা বগল-দাবা ক'রে নিতে সমর্থ হয়। কু-বন্ধুরা যে-ভাবে প্ররোচিত করে, তাও বিচিত্র। বলে,—"জানলি ভাই, একটী খুব ভাল মেয়ে আছে, এত মিষ্টি, এত ঠাণ্ডা যে, দেখ্‌লে প্রাণ জুড়ায়।" চমৎকার এক প্রলোভন। বলে,—"দুদিন মেশামেশি কল্লেঁই দেখ্‌বি, মুখশ্রীই কেবল চমৎকার নয়, মনটীও কেমন সুন্দর, কেমন্ন সুরস, কেমন সোহাগমাখা নবনীর মতন মধুর। দৈবাৎ আমি দেখেছি, তুই দেখ্‌তে পেলি না।" প্রলোভন আরো প্রগাঢ় হয়। বলে,—"জানিস, মেয়েটা কত দুঃখী। মা ছিল না, বিমাতার ঘর, বাপও পালিয়েছে, বিপিতার ঘর। বিমাতা আর বিপিতা এমন অত্যাচার শুরু ক'রে দিলে যে, প্রাণভয়ে বেচারী এসে

যেখানে মাথা গুঁজবার ঠাঁই পেল, সেখানেই ঢুকে পড়্ল। সহানুভূতির যোগ্য পাত্রী। কিন্তু দামী জিনিয। একবারটী যদি তাকে দেখ্‌তে পাস, তাহ'লে তুই স্নেহে, আদরে, ভালবাসায় পাগল হ'য়ে যাবি।"—আর যাও কোথা? জালে বাঁধা পড়ে গেলে। একবার জালে আটক পড়েছ ত' তোমারই একদিন, কি শিকারীরই এক দিন। না, তোমাকে সতর্ক থাক্‌তে হবে। জালে তুমি পড়্‌বে না, কিছুতেই পড়্‌বে না।

গণিকার দালাল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কে কোন্ স্বার্থের দায়ে অথবা কে কোন্ পরহিতবুদ্ধির তাড়নায় প'ড়ে উদয়োন্মুখ যুবকদের ডেকে ডেকে নিয়ে গণিকা-পল্লীর মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, সেই বিষয়টা বড়ই রহস্যাবৃত এবং সম্ভবত চিরকালই অনুদ্‌ঘাটিত থাক্‌বে। কিন্তু এদের সংখ্যা যে নগণ্য নয়, বরং অগণ্য, এই কথাটী স্বীকার কত্তেই হবে। কেউ হয়ত একটী নামী সেবা-প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক, কেউ হয়ত কোনো উকিল-সভার একজন সুপ্রতিষ্ঠিত সভ্য, কেউ হয়ত কোনও বিদ্যামন্দিরের সম্মানিত অধ্যাপক, কেউ হয়ত একটী মনোহারী দোকানের মালিক, কেউ হয়ত মদের দোকানের কেরাণী কিন্তু তিনি হয়ত গোপনে অনেক মানুষকে পতিতা-

পল্লীর নোংরা গলিতে নূতন নূতন পুরুষ মানুষের ভিড় বাড়াবার কাজে মদত দিচ্ছেন। কেন দিচ্ছেন, কেউ জানে না, কিন্তু দিচ্ছেন। অবস্থাটা যখন এইরূপ ভয়ানক, তখন তোমাদের পক্ষে সতর্কতার যে কত বেশী প্রয়োজন সে কথা আবার স্পষ্টতর ক'রে বলার কি কোনো আবশ্যকতা আছে? অত্যধিক সতর্কতার প্রয়োজনীয়তাটা কি নিজে নিজেই বুঝতে পার না?

পুরুষত্বের অভিমান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যা' দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাতে মনে হয়, যুবকের পুরুষোচিত সামর্থ্যের অভিমানকে আঘাত ক'রেও অনেক স্থলে নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র ব্যক্তিকে স্ত্রীসম্ভোগের কুপথে পরিচালিত করা হয়। “তুই আবার কি পুরুষ রে, যদি অমুক কাজটা ক'রে না আসতে পারিস?” একথা ব'লে একটী যুবককে ক্ষেপিয়ে তোলা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। “নিশ্চয়ই তুই হিজ্‌ড়ে বা নপুংসক, নইলে অমুক মেয়েটাকে একবার শিখিয়ে দিয়ে আসতে পরলি না যে, তুই কেমন বাপের কেমন বেটা?”—এই জাতীয় কথায় অনেক সরল যুবক সদ্‌বুদ্ধির খেই হারিয়ে ফেলতে পারে এবং হারায়ও। বিবাহ কর্ল্লে নিজ দাম্পত্য জীবনের নানা অনুশীলনে নিজের ঘরে ব'সে নিজের স্ত্রীর কাছে তুমি যে যথেষ্ট পুরুষত্বের

পরিচয় দেবার অবাধ স্বাধীনতা ও অবিরাম অবকাশ পাবে, এই সার কথাটী এরা কথার দাপটে তোমাকে ভুলিয়ে দেবে। তোমাকে উত্তেজিত ক'রে তুলবে অকালে সম্ভোগাসক্ত হ'তে, অপাত্রে অধ্যবসায় নিয়োগ কত্তে। তুমি যদি দুর্ব্বল হও, তবে তোমাকে কাণে ধ'রে বা চুলে ধ'রে টেনে এনে যে-কোনো একটা মেয়ের ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বল্‌বে, "এই ত' সুযোগ পেলি, এখন যা কর্ব্বার তা ক'রে নে। তুই পয়সা দিতে পার্ব্বি নে, ত' দ্যাখ, এই আমরাই দিয়ে দিলুম।" তারপরে কি হবে? তুমি দুচার দিন পরে ডাক্তারের বাড়ী এসে ফি তাঁর হাতে দিয়ে বল্‌বে, "মশায় রক্ষে করুন, ব্যাধিতে ধরেছে।" ডাক্তার মাথা নেড়ে বল্‌বে,—"নাঃ, এ রোগ সহজে সারবে না, অনক সময় লাগবে আর অনেক কড়ি ঢালতে হবে।" ব্যাপারখানা বুঝ্‌লে ত'?

পশুমানব ও দেবমানব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাচীন কালে মানুষ ছিল যাযাবর। তারপরে মানুষ বসতি শিখ্‌ল, বাণিজ্য শিখ্‌ল, শুরু করল বাণিজ্য-ভ্রমণ। এই ভ্রমণ স্থলপথেও হ'ত, জলপথেও হ'ত। যুদ্ধ উপলক্ষ্যেও এক দেশের মানুষ ভিন্ন দেশে যেত। কিন্তু যুদ্ধের পর্য্যটকরা অস্থায়ী পর্য্যটক, বাণিজ্য একটা স্থায়ী ব্যাপার। বাণিজ্যের পর্য্যটকেরা হ'ত স্থায়ী পর্য্যটক। পুরুষ-

পর্য্যটকদের নারীসঙ্গ কখনো কখনো স্পৃহনীয় হত। চাহিদা অনুযায়ী নারীর যোগানও স্বাভাবিক ভাবেই হ'তে থাক্‌ত। ভূমধ্যসাগরীয় নানা অঞ্চলের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, শুধু পোতাশ্রয় আর সরাইখানাগুলির সান্নিধ্যেই এই সব নারীর আশ্রয়স্থল ছিল না, এমনকি দেব মন্দিরের বারান্দাগুলিতেও এই সব নারীরা ভীড় জমাত। বিদেশী পথিক যার যার ইচ্ছামত বা রুচিমত যার যার সাময়িক সঙ্গিনীকে বেছে নিত। যাত্রাকাল সমাগত হ'লে পথিকেরা যার যার গন্তব্য স্থানে চ'লে যেত। এই নারীদের সঙ্গে তাদের আর কোনো বাধ্য-বাধকতা থাকত না। কুমারী মেয়েরা লাজ ভাঙ্গবার গরজে এই সব দেবমন্দিরের চত্বরে অপেক্ষমাণা হ'য়ে থাক্‌ত এবং অপরিচিত পথিকের সংস্পর্শে লাজ ভাঙ্গার কাজ হ'য়ে গেলে ঘরে ফিরে এসে মনোমত স্বামীকে বিয়ে ক'রে সুখে সংসার জীবন-যাপন কত্ত। নারী থাক্‌লে পুরুষ তার সংসর্গ চাইবেই, পুরুষ থাকলে নারী তার সংসর্গ পাবার জন্য লালায়িত হবেই,—এটা একটা স্বভাবিক নিয়ম। কিন্তু মানুষেরা সমাজ গড়েছেই এই জন্য যে, আজকের মানুষ কালকে যেন একটু অগ্রগতি পায়, কালকের মানুষ পরশু যেন আরো এগিয়ে যেতে পারে। মানুষের ভিতরের পশুত্ব আস্তে আস্তে সংশোধিত হ'য়ে মানুষকে দেবত্বের দিকে ক্রমশঃ যেন অগ্রসর ক'রে দিতে পারে, তারই দিকে

অলক্ষ্যে একটী লক্ষ্য রেখে মানুষের জীবনে সমাজ নামে একটী অত্যাবশ্যকীয় উপসর্গের সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ যে ব্যবস্থাকে সাধু-সম্মত ব'লে মনে করে, সাধারণ ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থাকে মেনে চলাই ব্যক্তি-মানুষটীর পক্ষে শুভদায়ক। কুকুর-কুক্কুরীর মত বিচার-বিবেচনাহীন হ'য়ে রমণ-কার্য্য কর্ল্লে পশু-মানবের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই কিন্তু দেব-মানবের বিকাশ তাতে ব্যাহত হবে।

কেন ব্রহ্মচর্য্য প্রচার করিতেছি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একদা আমরা একেবারেই পশু ছিলাম। আজ আমরা অর্দ্ধ-পশু, অর্দ্ধ-মানব। কিন্তু কাল আমরা দেব-মানব হব, দেব-মানব আমাদের হওয়াই চাই। যতটা আমরা দেবত্বের দিকে এগুব, ততটা আমাদের পশুত্ব কমে যাবে। যতটা আমাদের পশুত্ব হ্রাস পাবে, ততটা আমরা দেবত্ব-লাভের দিকে অগ্রসর হ'তে পার্ব্ব। রমণ-কার্য্য জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। রমণ-কার্য্য সেই জীবের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয়, যার ভবিষ্যৎ বংশধর প্রয়োজন। যা' স্বাভাবিক, যা' দিয়ে প্রয়োজন আছে, তাতে কারো পাতিত্য আসে না। পাতিত্য আসে অবৈধ রমণে। চিরকাল যদি পশুই থাকতে চাও, তবে তোমার পাতিত্যের ভয় থাকা অর্থহীন।

কিন্তু পশু আমরা থাক্‌ব না, দেবত্ব লাভ আমাদের নিশ্চয়ই চাই,—এই যদি হয় জীবন-লক্ষ্য তাহ'লে নিজেকে পাতিত্য থেকে বাঁচিয়ে চলতেই হবে। মানুষ-দেহ পাবার পরেও লক্ষ লক্ষ প্রজন্ম ধ'রে আমরা পুরুযানুক্রমিক ভাবে এই চেষ্টাই ক'রে এসেছি যে, আমাদের যেন পশুত্বের গ্লানি থেকে, পশুত্বের অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্তি ঘটে। আজ যখন আমাদের ক্রমিক বিবর্ত্তনের এই ইতিহাসের ধারাকে স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছি, তখন ইচ্ছা ক'রে বা অসতর্কতা বশতঃ পশুবৎ আচরণ করার মত ভ্রম আর কি আছে? এই জন্যই আমরা দিকে দিকে চিন্তাশীল মানুষগুলিকে বুঝিয়ে বল্‌বার চেষ্টা কচ্ছি যে, ব্রহ্মচর্য্যকে মনুষ্য-সভ্যতার ভিত্তিমূলে এনে প্রতিষ্ঠা কর। কেননা, তাতেই মানুষের পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ, তাতেই মানুষের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বিকাশ, তাতেই মানুষের মনুষ্য-জন্ম গ্রহণের প্রকৃত সার্থকতা।

আমি নিয়ত তোমাদের সঙ্গী

লাকসাম হইতে একটী যুবক আসিয়াছে, বিশেষ কিছু কথা বলিতে। তাহাকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি আমার প্রতিটি সন্তানকে আমার প্রাণের অধিক ব'লে জ্ঞান করি। তারই জন্য তাদের কাউকে ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারি না। তাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে বাস কত্তে হ'লে আমার

প্রাণে অপরিসীম ক্লেশের উদয় হয়। আমি জানি যে, আমি শোক-তাপ, দুঃখ-ক্লেশ, সুখ-সোহাগ, আহ্লাদ-আমোদের ঊর্দ্ধে অবস্থিত এক পরম সত্তা, তথাপি নিজ সন্তান সম্পর্কে আমার এই দুর্ব্বলতা চিরন্তন এবং শাশ্বত। আমি নিজে যতটুকু সত্য, আমার এই সন্তান-স্নেহও ততটুকু সত্য। সত্য-মিথ্যার অতীত হ'য়েও এই বিষয়ে আমি পূর্ণ সত্য। তাই নিয়ত আমি তোদের সঙ্গে থাকি, একটী মুহূর্ত্তের জন্যও দূরে চ'লে যাই না। নিদ্রায় আমি তোর সঙ্গে আছি, জাগ্রতে আমি তোর সঙ্গে আছি, কর্ম্মে আর বিশ্রামে, শ্রমে আর আরামে, দুঃখে আর সুখে, উন্নতি আর অবনতিতে সব সময়ে আমি তোর সঙ্গে থেকে তোর কল্যাণ সাধনে ব্রতী হ'য়ে আছি। আমার ঐ একটী মাত্রই কাজ, ত্রিজগতে আমার অন্য কোনো কর্ত্তব্য নেই। আমি তোদের সঙ্গে আছি ব'লেই আমাকে বিশ্বাস কত্তে আমি তোদের কখনো বলি না। আমাকে অবিশ্বাস কর্ল্লেও আমি তোর সঙ্গে সঙ্গেই থাক্‌বো। সবাই কি জগতে সমান বিশ্বাসশীল হয় বা হ'তে পারে? বিশ্বাস ত' কতকটা আন্দাজী ব্যাপার। অন্তরে কতকটা আশা পোষণ ক'রে মানুষ সেই আশার লতায় জলসিঞ্চন করার জন্যই বিশ্বাস করে। কিন্তু অবিশ্বাস ক'রেও যদি কেউ আঙ্গুরের লতায় জলসিঞ্চন করে, সে একদা দ্রাক্ষাফল দর্শন করে, দ্রাক্ষার রস আস্বাদন ক'রে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে লাভ করে।

জ্ঞান লাভের জন্য বিশ্বাসের প্রয়োজন। এই বিশ্বাসের আর এক নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা না থাক্‌লে প্রত্যক্ষ হয় না, প্রত্যক্ষ না হ'লে জ্ঞানও হয় না। জ্ঞানরূপে আমি তোদের নিয়ত সঙ্গী, প্রত্যক্ষ-রূপে আমি তোদের নিয়ত সঙ্গী, শ্রদ্ধা-রূপে আমি তোদের নিয়ত সঙ্গী, বিশ্বাস-রূপে আমি তোদের নিয়ত সঙ্গী। আরও শত শত রূপে আমি তোদের নিয়ত সঙ্গী। আমি সাকার-রূপে তোদের সঙ্গী, আমি আকারহীন হ'য়ে তোদের সঙ্গী, আমি নাম-রূপে তোদের সঙ্গী, আমি নামহীন-রূপেও তোদের সঙ্গী। তোদের যখন আমি সঙ্গী, তখনি আমি জীবিত। যখন আমি তোদের সঙ্গ ছাড়া, তখন আমি মৃত বা অবর্ত্তমান। তোরা আছিস ব'লেই আমি আছি। তোরা না থাক্‌লে আমার থাকা আর না-থাকা সমান হত।

উত্তরকৃষ্ণরামপুর

৭ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২

(২৪শে অক্টোবর, ১৯৩৫)

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনী। সন্ধ্যার পরে পত্র লিখিতে বসিলেন। এই দিকে স্থানীয় ধর্ম্মানুরাগী সজ্জনেরা হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন।

শান্তির পথ

বরিশাল জেলান্তর্গত রহমতপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ত্যাগ ও সংযমের পথই শান্তির পথ, আনন্দের পথ। দেশের যত অধিক লোক এই পথে চলিবে, দেশের তত অধিক কল্যাণ হইবে, জগতের তত শুভ-সম্ভাবনা বাড়িবে। তোমরা ত্যাগে ও সংযমে বিশ্বাসী হও। কথাটী এদেশের বহু পুরাতন একটী অভ্রান্ত ও নির্ভেজাল সত্য। এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই মানুষের শান্তি আসিবে, নিরুদ্বেগতা আসিবে। লোভ ও লালসা জগতে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে বলিয়াই ত' লোভকে খর্ব্ব ও লালসাকে বন্ধ্যা করিয়া দিবার জন্য মহাজনেরা যুগের পর যুগ মানুষকে বলিয়া আসিয়াছেন, ঈশ্বর-পরায়ণ হও, ঈশ্বরের নামে মজ, ঈশ্বরকে ভালবাস, ঈশ্বরে দেহ, মন, আত্মা, প্রাণ এবং সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর। অসংযম ও সম্ভোগেচ্ছা মানুষকে পাগল করিয়া তুলিয়া মাত্রাহীন অমিতাচারে আসক্ত ও নির্জ্জীব করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের সর্ব্বসম্পদ অপহরণ করে বলিয়াই ত' তাঁহারা উপদেশ করিয়াছেন, মহতের বাণী পাঠ কর, মহতের নির্দ্দেশ পালন কর, নিজেকে সর্ব্বপ্রকার ভোগাকাঙ্ক্ষার উপরে পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপনের যোগ্য করিয়া গড়িয়া তোল এবং তাহার প্রথম ও প্রধান উপায়-স্বরূপে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হও। নিজেকে একান্ত ভাবে তাঁহার হাতের যন্ত্র কর। কারণ, ইহাই শান্তির পথ। ধর্ম্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে নানা দেশে নানা সময়ে বা বহু দেশে বর্ত্তমান সময়ে শক্তিশালী যুক্তিবাদী চিন্তাবীরেরা

যতই প্রতিকূল অভিমত প্রকাশ ও প্রচার করিয়া থাকুন, তোমার, আমার এবং আরও লক্ষ কোটি জনের প্রাণে কিন্তু শান্তির প্লাবন আনিবে পরমেশ্বরে ঐকান্তিকী রতি। ত্যাগ ও সংযমের সহিত পরমেশ্বরের নাম এবং পরমেশ্বরের নামের সহিত ত্যাগ ও সংযমের সাধনা সংযুক্ত হইলে একটী অপরটীর অনুপূরক হইয়া বহুযুগসাধ্য তপস্যাকে ক্ষণকাল মধ্যে ফলপ্রসূ করিয়া দিতে পারে। অবিচল বিশ্বাস রাখিয়া আমার এই কথাগুলি শোন এবং সাধ্যমত নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা কর। তোমার শান্তি একা তোমাকেই শান্তি দিবে না, দিবে তোমার প্রতিটি প্রতিবেশীর প্রাণে, তোমার দেশবাসীর প্রাণে, তোমার দ্বারা জগতের যে গ্রহটী অধ্যুষিত, পৃথিবী নামক সেই গ্রহটীর সর্ব্বত্র সকলের প্রাণে। জগতে কোনও সত্যিকার পরম লাভ কদাচ একজনের জন্য 'মনোপলি' করা থাকে না। সে লাভের অংশ স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সকলেই পায়, একটী প্রাণীও তাহা হইতে বঞ্চিত হয় না।"

কাজ, কাজিয়া ও কীর্ত্তন

ঢাকা জেলান্তর্গত মধ্যপাড়া নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একদিকে ভক্তদের পবিত্র কণ্ঠোচ্চারিত সুমধুর হরিনাম শ্রবণ করিতেছি, অন্য দিকে আবার তোমাদের পারস্পরিক

নানাবিধ কলহের বিচিত্র ইতিহাস সাধ্যাতীত ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করিয়া যাইতেছি। কীর্ত্তন এবং কলহ নিশ্চয়ই সমজাতীয় বস্তু নহে যে, একটার সঙ্গে অপরটার তাল মিলাইয়া উপভোগ করা যাইবে।*** যেই সময়ে তোমরা মনে করিতেছ যে, তোমাদের মধ্যেকার সমস্ত কলহের মূল কারণটীর সৃষ্টি করিয়াছে তোমাদের সহিত বিবদমান প্রতিপক্ষের একটী অসহনীয় ও ক্ষমার অযোগ্য আচরণ, সেই সময়েই তোমাদের আবার আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন আছে যে, বাস্তবপক্ষে তোমাদেরই কোনও আচরণ হইতে হয়ত যাবতীয় অনর্থের উৎপত্তি ঘটিয়াছে এবং তোমরা নিজেদের দোষ, নিজেদের ত্রুটি দেখিতে পাও না বা ধরিতে পার নাই বলিয়া বিক্ষুব্ধ অন্যতর একদল লোককে সকল সমস্যার মূল বলিয়া অনুচিত ভাবে দোষী করিতেছ কিনা। অনন্ত কাল কলহ চালাইয়া যাওয়াই যাহাদের লক্ষ, তাহারা কদাচ এভাবে বিচার করিবে না। তাহাদের কাছে তাহারাই জগতে একমাত্র নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, অপাপবিদ্ধ মানুষ, অন্যান্য সকলে দুষ্ট, ঘৃণ্য ও হেয়। কাজ করিবার যাহাদের ইচ্ছা আছে, তাহাদের মনোভঙ্গী এইরূপ হইতে পারে না। আগে ঠিক করিয়া বুঝিয়া নাও যে, তোমরা 'কাজ' করিতেই চাহ, না 'কাজিয়া' করিতে চাহ। 'কাজিয়া'তে আর 'কাজে' আকাশ পাতাল দূরত্ব। ঝগড়া-কলহ কাজের কেবল গতি হ্রাসই ঘটায় না,

কাজের রুচিও নষ্ট করে। কলহ বাড়ে বেশী কথাতে আর একজনের কথার অন্যের দ্বারা ভুল অর্থ করাতে। কলহের উপক্রম দেখিলেই তোমরা কথা কমাইয়া দিও। মিত্রামিত্র-নির্ব্বিশেষে সকলকে ডাকিয়া বলিও,—এস ভাই, কলহ করিয়া কাজ নাই, আমরা হরিনাম-কীর্ত্তনে বসিয়া যাই। যার যার ইষ্টে মনের অভিনিবেশ সাধনের মধ্য দিয়া এস ভাই ঝগড়া-কলহের উষ্ণ আবহাওয়াটাকে স্নিগ্ধ, শীতল, শান্ত করিয়া লই, এস কীর্ত্তনানন্দে মনের উগ্রতা ভুলি, ভাষার বল্গাবিহীনতাকে শাসন করি, অন্যের উপরে মিথ্যাকে আরোপ করার প্রবণতা দূর করি। এস কীর্ত্তনের মাধ্যমে আমরা আত্মশোধন করি, মিলনানন্দ উপভোগ করি।”

আমি চিরকাল তোমার সঙ্গে আছি

ব্রহ্মদেশান্তর্গত মৌলমীন-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“তোমার সরলবিশ্বাসে পূর্ণ, কোমল আবেগে স্নিগ্ধ, সুভাষিত পত্রখানা পাইয়া খুবই সুখী হইলাম। আমি যে তোমার সঙ্গে আছি, একথা সত্য। আমি যে আমার সন্তানের সাথে অনন্তকাল যুক্ত হইয়া থাকিব, ইহাও সত্য। আমি আমার সন্তানকে কদাচ কোনও কারণেই পরিত্যাগ করিব

না। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, উত্থানে, পতনে, কর্ম্মে, বিশ্রামে, সর্ব্বদা আমি তোমার সাথী। দুর্গম গহন অরণ্যে, দুস্তর মরুভূমিতে, উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গ-বিক্ষোভে, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শৃঙ্গের তুষার-স্তূপে, জীবনের আনন্দে, মরণের হাহাকারে সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় আমি তোমার সঙ্গে থাকিব। ভগবান্ যখন এই বিশ্বাসটীকে নিজের কৃপায় তোমার অন্তরে স্বয়ংই স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, তখন ইহা হইতে আর ক্ষণকালের জন্যও স্খলিত হইও না।"

নাম-সুধা-রস

মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত বালিয়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অন্তর ভরিয়া লও নাম-সুধা-রসে,
সকল ইন্দ্রিয়গণে আন তব বশে।
নিজেরে জানিয়া শুধু একের অধীন
অশুভ প্রভাব যত কর পরিক্ষীণ।
নামে যে নির্ভর করে, তার প্রাণে হয়,
নিত্যসুখ নিত্যানন্দ শান্তির উদয়।
জরা ও মরণে ভয় যায় তার দূরে,
অমৃতত্ব বিরাজিত রহে প্রাণ-পুরে।
ঈশ্বর-ভজনে যার চিত্ত সমাহিত,
হৃদয় সমুদ্রে তার শুধুই অমৃত।"

ছাত্রের পক্ষে মৌনব্রত

নোয়াখালী অরুণ চন্দ্র হাইস্কুলের একটী ছাত্র মৌনব্রত অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক। তাহার মৌন-সাধনা সম্পর্কে সে উপদেশ চাহিলে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিয়া দিলেন,—

"তুমি ছাত্র। তোমার পক্ষে মৌনব্রত-পালন সহজ কথা নয়। তোমাকে বিদ্যাভ্যাস কত্তেই হবে এবং অনেক পাঠ্য-বিষয় আছে, যা আয়ত্ত কত্তে হ'লে বা ভালরূপে শিখ্‌তে হ'লে উচ্চারণ ক'রে পড়্‌তে হয়। যার উচ্চারণ যত স্পষ্ট, তার মনের ভিতরে পাঠ্য-বিষয় তত সুন্দর ভাবে লগ্ন হয়। তাই স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ ক'রে পাঠাভ্যাস করা অনেকের পক্ষেই প্রশস্ত। তুমি যদি মৌনব্রত নাও, তা' হ'লেও পড়ার সময় পড়ার জন্য শব্দোচ্চারণকে বাদ দিতে যেও না। তবে, পড়ার সময়-নির্দ্ধারণ ক'রে নেবে। প্রত্যহ ঠিক্ একই সময়ে পড়তে বস্‌বে এবং একই সময়ে পড়া সাঙ্গ কর্ব্বে।

সমবেত উপাসনা ও মৌন

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"তুমি যখন আমার কাছে দীক্ষিত, তখন তোমাকে সপ্তাহে একদিন সমবেত উপাসনায় যোগদান কত্তেই হবে। গুরুতর কারণে পারলে না, তার কথা আলাদা। কিন্তু সাধারণতঃ তোমাকে প্রতি সপ্তাহের সমবেত উপাসনাতেই যোগ দিতে

চেষ্টা কত্তে হবে। ব্যক্তিগত উপাসনা তুমি মৌনী ভাবেই কত্তে পার কিন্তু সমবেত উপাসনায় কণ্ঠ-সংযোগ প্রয়োজন। সুতরাং ঐ সময়টুকু তোমার মৌনী অবস্থাটী থাক্‌ছে না। তবে, ঐ সময়েও একমাত্র উপাসনার উপাঙ্গ-স্বরূপ স্তোত্র-কীর্ত্তনাদি ছাড়া অন্য কোনও শব্দ উচ্চারণ কর্ব্বে না। তবে, তুমি যদি সেই সময়েও শব্দোচ্চারণ না ক'রে কেবল মনে মনে অপরের মুখনিঃসৃত স্তোত্রকীর্ত্তনের সুরলহরীতে অভিনিবেশ দাও, তবে তাতে দোষ হবে না, গুণই হবে।

মৌনকালে ক্ষমাশীল থাকিও

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"মৌনব্রত অবলম্বন কর্ল্লে প্রথম প্রথম তোমার সমবয়সী ছোক্‌রারা ঠাট্টা বিদ্রূপ ত' কর্ব্বেই। এটা জানা কথা। কারণ, তারা মৌন-ব্রতের মহিমা জানে না। তারা বল্‌বে, তুমি বোধ হয় বিড়াল মেরেছ, তাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কচ্ছ মৌনব্রত দ্বারা। কেউ বল্‌বে, না, না, ও বেটা গরু মেরেছে। তাই মৌনী হ'য়ে গোহত্যার পাপ ক্ষালন কচ্ছে। কেউ বা তৈরী ক'রে অন্য কোনও অপবাদ দেবে, যা শুন্‌লে তোমার হাড়ে জ্বালা ধ'রে যাবে। কিন্তু মৌনাবস্থায় কদাচ কারো উপরে ক্রুদ্ধ, রুষ্ট, বিরক্ত বা অপ্রসন্ন হ'তে নেই। তাতে তোমারই ক্ষতি।

মৌনকালে দুষ্টলোকের কুকীর্ত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"তোমার মৌনব্রত ভাঙ্গবার জন্য অনেক দুষ্ট লোক নানা ভাবে চেষ্টা কত্তে পারে। আমার বিভিন্ন সময়ের মৌনব্রত-কালে আমি দেখেছি, কেউ হঠাৎ এসে ঘুমন্ত অবস্থায় পায়ের তলায় ছুঁচ ফুটিয়ে দিল। কেউ বা অন্য স্থান থেকে কতকগুলি মশা ধ'রে এনে আমার মশারির ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল, যেন দংশনের জ্বালায় উঃ আঃ ক'রে উঠি। একবার একজন একটা সাপ এনে বিছানার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। মহাভাগ্য যে, সে সাপ আমাকে দংশন করে নি। এক জায়গায় কোনো দুষ্ট লোক আমার খাবার অন্নের সঙ্গে কাঁচের টুকরা মিশিয়ে দিয়েছিল। চূড়ান্ত ব্যাপার ঘটেছিল আর একটা গ্রামে। একটী যুবতী রমণী উলঙ্গিণী অবস্থায় এসে আমার বিছানায় শুয়ে পড়্ল গভীর রাত্রিতে ঠিক্ তখন, যখন আমি নিদ্রার ঘোরে অচেতন। এমন অত্যাশ্চর্য্য বিপদ আমার জীবনে কল্পনাও করা যায় না। হয়ত আমি আতঙ্কে বা ক্রোধে চীৎকার ক'রে উঠ্‌তে পারতাম, ফলে মৌনভঙ্গ হ'য়ে যেতে পার্ত্ত। কিন্তু হঠাৎ জেগে উঠে ব্যাপারখানা দেখে সঙ্গে সঙ্গে আত্মদমন ক'রে নিলাম এবং মেয়েটীর পায়ে প'ড়ে প্রণাম ক'রে মনে মনে বললাম,—

"জননী ছলনা ক'রো না, আমি বিশ্বাত্মার সঙ্গে অভেদ, আমাকে পরীক্ষা-নিরর্থক।" মনের ভাব মুখে প্রকাশ না ক'রে সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে লম্ফ দিয়ে বাইরে এলাম এবং এত জোরে হাটলাম যে, দশ বারোমাইল দূরের আর এক গ্রামে চলে এলাম ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে। ভেবে দেখ, মৌনব্রতাবলম্বীর সঙ্গে মানুষ কত রকম শত্রুতা কত্তে পারে। অথচ এই শত্রুতার কোনো হেতু নেই। অকারণ তামাসা করার কুবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হ'য়ে লোকেরা এসব করে। এরা দুষ্ট লোক, কিন্তু তোমার রুষ্ট হলে চলবে না। রুষ্ট হ'তে গেলেই মৌনের মহাফল ক'মে যাবে।

মৌনে প্রসিদ্ধি লাভের কুফল

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মৌনে যখন তুমি প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেলে, অর্থাৎ দুষ্টামি ক'রে কেউ তোমার মৌনব্রতকে ভগ্ন কত্তে পার্ল্লে না, তখন আস্তে আস্তে শুরু হবে লোকমান লাভ। তোমাকে লোকে কৃষ্ণ-বিষ্ণু-মহেশ্বর গোছের লোক মনে ক'রে সম্মান দিতে আরম্ভ কর্ব্বে। এটাই তোমার পক্ষে সব চেয়ে বিপজ্জনক কাল। যে সময়ে সকল লোক তোমাকে সাধুদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে কচ্ছে, সেই সময়েই তোমার সব চেয়ে গুরুতর বিপদগুলি আস্‌তে পারে। কি পাপই যে এই সময়ে

তুমি কত্তে পার আর কত্তে পার না, তার কোনো হিসাব লেখা সম্ভব নয়। যতক্ষণ জীবনে থাকে সংগ্রাম, ততক্ষণ মানুষ সতর্ক থাকে, যেন কোনো প্রকারে তার বলহানি না ঘ'টে যায়। ব্রতভ্রংশতা এক বিরাট বলহানি। কিন্তু লোভ এলে, লালসা এলে, ঈর্ষ্যা এলে, ভোগকামনা এলে তাদের কাছে নতি স্বীকারও এক একটা বিরাট বলহানি। যতক্ষণ তুমি সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত নও, ততক্ষণ বলহানিকে স্বভাবতই ত' এড়িয়ে চলবে কিন্তু যখন তুমি সুপ্রতিষ্ঠিত, যখন তোমাকে প্রতি পদে বিরুদ্ধতার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে এগুতে হচ্ছে না, তখন তোমার ঘোড়ার বল্‌গা ঢিল হ'য়ে যেতে পারে। তখন তুমি লোক-প্রসিদ্ধির আড়ালে থেকে, সাধুত্বের খ্যাতির পিছনে দাঁড়িয়ে, লোককে না দেখিয়ে এবং গোপনে অনেক পাপে আসক্ত হ'য়ে যেতে পার, যার সদ্যঃফল অধোগতি, দূরবর্ত্তী ফল নিদারুণ দুঃখ, ক্লেশ ও মনস্তাপ। সুতরাং এমন ভাবে চলো, যেন যশোলোভে চালিত হ'য়ে ব্রতের আসল উদ্দেশ্য ভুলে না যাও। যে-কোনও মহাব্রত পালন-কালে প্রলোভন থেকে দূরে থাক্‌তে হবে।

সুদীর্ঘ মৌনকালে পালনীয় নিয়ম

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"যে কথা কয়টা লিখে দিলাম, তা' মাঝে মাঝে পড়্‌বে,

তাহ'লেই আর ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাক্‌বে না। মৌনব্রত যদি কখনো দীর্ঘকালের জন্য নাও, যেমন, ছমাস, এক বছর বা পাঁচ বছর, তাহ'লে অনেকগুলি শক্ত নিয়ম দৃঢ়তার সঙ্গে পালন কর্ব্বে। মৌনাবস্থায় কুদৃশ্য কখনো চোখে দেখ্‌বে না, চক্ষুকে লালসাবর্দ্ধক দৃশ্য দেখতে বারণ কর্ব্বে। সে বারণ না যদি মানে, তবে স্থান ত্যাগ কর্ব্বে। মৌনী অবস্থায় যা' দেখ্‌বে, যা' শুনবে, যা' ভাব্‌বে, তা' দীর্ঘকাল মনের উপরে ক্রিয়াশীল থাকে। কারণ মৌনের ফলে মন একাগ্র হয়। মৌনাবস্থায় কোনো ঝগড়া ঝাটির ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাবেই না। মৌনাবস্থায় কোনো গৃহস্থের বাড়ীতে বেশী দিন থাক্‌বে না। সাধু-সন্তের আশ্রমে বা তীর্থস্থানে যত দীর্ঘকাল থাকা যায়, ততই ভাল। নিজ গৃহে ব'সেও দীর্ঘকাল মৌন পালন কর্ল্লে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়, পরগৃহে ত' নিশ্চিতই। তোমার মৌনাবস্থায় তোমাকে কোনো রমণী আদর ক'রে 'খাও যাদু, খাও মণি, খাও আমার গোপাল আদি ব'লে নিজ হাতে খাইয়ে দিতে এলে সে খাবার খাবে না। কোনও রমণী অতিরিক্ত কুটুম্বিতা ক'রে গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়ালে সঙ্গে সঙ্গে শত হস্ত দূরে স'রে যাবে। কাপুরুষ ব'লে কেউ গাল দিলে তা' গ্রাহ্য করবে না। কারো সঙ্গে অতিরিক্ত আত্মীয়তা হ'য়ে যাচ্ছে দেখ্‌লে সেই গৃহস্থের বাড়ী মৌনকালে ত্যাগ করবে। মৌনকালে মনকে অনাসক্ত রাখার জন্য প্রাণপণ

চেষ্টা কর্ব্বে। আসক্তি-বর্দ্ধক লালসার ইন্ধন-দায়ক পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ এই সময়ে একেবারেই বর্জ্জন কত্তে হবে। উলঙ্গ পুরুষ বা নারীর মূর্ত্তি কিম্বা প্রতিচিত্র দর্শন থেকে এ সময়ে একেবারে মুক্ত থাকতে হবে। এ সময়ে কোনো কুকথা কাণে ঢুকতে দিও না। কিছুকাল মৌন-সাধনের পরে মনের এমন একটা অবস্থা হয়, যখন স্বভাবই দঁড়িয়ে যায় একটী কথাকে বারংবার জপ করে যাওয়ার। মনের জপন-শীলতা এই সময়ে আপনা আপনি বেড়ে যায় ব'লেই যা' তা' শব্দ বা কথা এই সময়ে শোনা এক মারাত্মক ব্যাপার। ভালকথা শুন্‌লে, মনে বারংবার সেই ভালকথাটীই আলোড়িত হ'তে থাকে। মন্দকথা শুনলেও মনে বারংবার সেই মন্দ, কুৎসিত, কলুষিত কথাটীরই আলোড়ন চলতে থাকে। এই আলোড়নকে থামানো এক বিষম ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। লালসা-বর্দ্ধক গল্প-উপন্যাসাদি পাঠ কর্ল্লে তারও কুফল মৌনকালে এভাবেই অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। মৌন ব্রতই নেওয়া হয়েছে মনকে যাবতীয় কুবিষয় থেকে প্রত্যাহার ক'রে নেওয়ার জন্য। সে স্থলে তুমি যদি মৌনকালেই কুবিষয়ের চর্চ্চা কর, তবে ত' মৌনের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'য়ে যায়। মৌনকালে নিজের মনের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করার জন্য দিস্তার পর দিস্তা কাগজ খরচ করাও এক হয়রানি। এটাও এক প্রকারের বহির্ম্মুখ চর্চ্চা। তবে এই চর্চ্চাটা যদি সৎ বিষয়ের মধ্যে

আবদ্ধ থাকে, তবে তাতে দোষ কম। কিন্তু লেখনী একবার লাগাম-ছাড়া হ'লে একটা দরকারী কথা লিখতে গিয়ে তুমি যে পঞ্চাশটা অদরকারী কথা লিখবে না, তার নিশ্চয়তা কি আছে?"

বড়কৃষ্ণরামপুর
৮ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৪২
(২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৫)

কীর্ত্তন করিতে করিতে সারা পথ নামে মুখরিত ও প্রেমে প্লাবিত করিয়া ভক্তগণ শ্রীশ্রীবাবামণিকে উত্তরকৃষ্ণরামপুর হইতে বড়কৃষ্ণরামপুরে শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ভৌমিকের গৃহে নিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী হর কুমারী ভৌমিক গদগদ ভাবে প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন,—বাবামণি, বোধ হয় আমাদের কোটি জন্মের পুণ্যফলে আপনি এই পর্ণকুটীরে পদধূলি দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিলেন।

বৈষ্ণব ও মানুষ

একজন পণ্ডিতলোক, বয়সে খুবই প্রবীণ, বংশে ব্রাহ্মণ, কৌতূহলী হইয়া সাধু-দর্শনে আসিয়া হঠাৎ যেন অভিভূতের মত কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন,—আপনাকে দর্শনে পুণ্য, আপনাকে স্মরণেও পুণ্য। চৈতন্য-ভাগবতে আছে,—

"ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য হেন মানে,
তাহা পায় বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে।"—আপনার দাসদাসীগণকেও আমার প্রণাম কত্তে ইচ্ছে কচ্ছে।

হরকুমারী হা-হা করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—বলেন কি আপনি? আপনি তন্ত্রশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। আপনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও পরমপূজ্য। আপনি আমাদের মত নগণ্য দাসদাসীগণকে প্রণাম কত্তে চাচ্ছেন? এতে আমাদের যে সর্ব্বনাশ হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তোমাদের কিছু হবে না মা। উনি বৈষ্ণব-শাস্ত্র থেকে বাণী উদ্ধার কচ্ছেন। প্রকৃত যে বৈষ্ণব, তাঁর দাসদাসীরাও পূজ্যাতিপূজ্য। কিন্তু আমি ত' বৈষ্ণব নই। আমি মানুষ, অতি সাধারণ মানুষ, তোমাদের সকলের মতন নিতান্তই একটা মানুষ। মানুষের অতিরিক্ত আমাতে অন্য কিছুই নেই।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ঐ এক কথাই হ'ল। ভক্ত চণ্ডীদাস বলেছেন,—

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
ইহার উপরে নাই।—আপনি আমার কাছে ঠিক সেই মানুষটী। যাকে চিনি না, জানি না, কখনো দেখি নি, কখনো যার নাম শুনিনি, হঠাৎ তাকে দেখে আমার মনে হ'ল আমি যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ দেখাটা আজ

দেখ্‌লাম। তাই আপনাকে বৈষ্ণব ব'লে অভিনন্দিত করেছি। কিন্তু আপনি বল্‌ছেন, আপনি শুধু মানুষ। আমি সেই শুদ্ধ মানুষটীকেই জানাচ্ছি অন্তরের ভক্তি, জানাচ্ছি অভিনন্দন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেই মানুষটী আপনার ভিতরেও বিরাজ করেন। তাকেই আপনি শিব আর শক্তি, এই দুইটী রূপে বিভক্ত ক'রে নিয়ে নিরন্তর ধ্যান করেন। তাই, আমি আপনাকে জানাচ্ছি আমার অকুণ্ঠ প্রণাম।

চতুর্দ্দিকে উঠিল তুমুল হরিধ্বনি, দুই জনে হইলেন আলিঙ্গনাবদ্ধ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই পুণ্যবান্ বৃদ্ধের নামটী টুকিয়া রাখা হয় নাই।

অদ্য এই বাড়ীতে বিরাট এক মহোৎসব হইল। সুতরাং শ্রীশ্রীবাবামণির আনন্দ সহকারে উৎসব দর্শন ব্যতীত অন্য কিছু করিবার রহিল না।

গ্রামে গ্রামে জাতি নিয়া কিছু মন কষাকষি ছিল। আপনা-আপনি সেই সব যাদুমন্ত্রে দূর হইয়া গেল।

রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবামণি অনেকগুলি পত্র লিখিলেন। একটা মাত্র পত্রের অনুলিপি রক্ষিত আছে।

গুরু, পতি ও পরমেশ্বর

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্গত রাঙ্গামাটী-নিবাসিনী জনৈকা পত্র-লেখিকাকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি তোমার গুরুকে জীবনের এক পরম আশ্রয় বলিয়া ভাবিবে, ইহা আশ্চর্য্যের কিছু নহে, অস্বাভাবিকও নহে। কিন্তু তুমি বিবাহিতা মহিলা। তোমাকে জীবন-নাথ বলিয়া জানিতে হইবে তোমার স্বামীকে,—পতি দেবতা বলিয়াই নহে, পরন্তু তোমার সংসার-জীবনের পূর্ণতা বিধানের জন্যও। স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ পরস্পর পরস্পরের অভাবের পরিপূরক হিসাবে বিশেষ সম্মানিত হইয়া রহিয়াছে। বিবাহিতা নারী যদি পতি-ভাব গুরুতে সমর্পণ করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহার ফলে সমাজে, সংসারে ও মানসিক জগতে বিষম অনর্থের বা জটিলতার সৃষ্টি হইতে পারে। প্রধানতঃ এই কারণেই গুরুতে মানুষ-বুদ্ধি পরিত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন শাস্ত্রকর্ত্তারা। গুরুতে মানুষ-বুদ্ধি পরিহার করিতে পারিলে তাঁহাতে-দেহেন্দ্রিয়াদির সমাবেশ-কল্পনা অনায়াসে দূর হইয়া যাইতে পারে। গুরুকে একটী ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট পুরুষ মানুষ বলিয়া করিবে চিন্তা আর অন্তরের পতি-ভাব নিরন্তর তাঁহাতে ঢালিতে থাকিবে, ব্যাপার ইহা হইলে, গুরু তাঁহার গুরুত্ব হইতে চ্যুত হইয়া হঠাৎ একদিন তোমার শয্যা-সঙ্গী হইয়া পড়িবেন এবং বিষম অনর্থের কারণ হইবেন। গুরুকে সর্ব্বপবিত্রতার আকর এবং সর্ব্বকলঙ্কমুক্ত নিষ্কলুষ পরমাত্মা বলিয়া জানিতে পারিলে, বুঝিতে পারিলে, ভাবিতে শিখিলে এই সব উৎপাত বা বিপৎ-পাতের কোনও সম্ভাবনা থাকে

না। কুমারী, সধবা, বিধবা প্রভৃতি যে-কোনও নারীর পক্ষে পরমপ্রেমময় পরমেশ্বর পতির আসন গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে নারীর যাবতীয় ইন্দ্রিয়-ব্যবহার চিরতরে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। গ্রাম্য গোঁসাইদের প্ররোচনায় পড়িয়া ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ অসিদ্ধ গুরু-চিন্তায় নিজেকে নিপীড়িতা করিও না মা, পরমেশ্বর পবিত্রতা-স্বরূপ, সদ্‌গুরুও পবিত্রতা-স্বরূপ। গুরুর চিন্তার সহিত পঙ্কিল ভাবনার কোনও সংশ্রব নাই।

বড়কৃষ্ণরামপুর
৯ই কার্ত্তিক, শনিবার ১৩৪২
(২৬শে অক্টোবর, ১৯৩৫)

দেশকল্যাণ-কর্ম্ম ও চরিত্র

একটী উৎসাহী যুবক প্রশ্ন করিল,—দেশকল্যাণ-কর্ম্মে আত্মনিয়োগে সফলতা অর্জ্জন কত্তে হ'লে কর্ম্মীদের কোন্ গুণটীর সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট গুণের কথা এই প্রসঙ্গে বল্‌তে পাচ্ছি না। কারণ, দেশকল্যাণকর্ম্মে আত্মনিয়োগে সফলতা বা সার্থকতা অর্জ্জন কত্তে হ'লে অনেকগুলি সদ্‌গুণের সমাবেশ একটী কর্ম্মীর জীবনে প্রয়োজন। এমন সব সদ্‌গুণ, যেগুলি থাক্‌লে পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ

রূপে বিশ্বাস কত্তে পারে এবং একে অন্যকে বিশ্বাস করার ফলে কোনও মারাত্মক বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং চরিত্রবলই যে সব চেয়ে জরুরী সদ্‌গুণ, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু চরিত্র কথাটা একটা বিরাট ব্যাপক অর্থ বহন করে। সত্যবাদিতা, সত্যশীলতা, সংযম-সামর্থ্য, আত্মদমনে রুচি ও চেষ্টা, পরানিষ্ট-প্রবৃত্তির অভাব এবং সৎসাহস,—এইগুলি চরিত্রের অঙ্গ এবং উপাঙ্গ। এত সব ব'লেও চরিত্রকে পূরাপূরি বলা হ'ল না। চরিত্রের মেরুদণ্ড হচ্ছে কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং সমলক্ষ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সহযোগিতা রেখে কাজ ক'রে যাওয়ার সামর্থ্য।

ভগবৎ-সাধন ও চরিত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই সামর্থ্য লাভ কত্তে হ'লে অন্যান্য দশটা ভালো জিনিষের সঙ্গে ভগবৎ-সাধনের রুচি এবং অভ্যাসও একটা বড় প্রয়োজনীয় জিনিষ। ভগবৎ-সাধনের নাম ক'রে অনেকে ভণ্ডামি করেছে, এই যুক্তিতে ভগবৎ-সাধন বর্জ্জনীয় হ'তে পারে না। দেশসেবার নাম ক'রেও ত' কত নেতা নিদারুণ ভণ্ডামি কচ্ছেন, তাই ব'লে কি দেশসেবাকে কেউ হেয় জ্ঞান কত্তে পারে? পরদুঃখে কাতরতার দোহাই দিয়ে কত জন কত অন্যায় এবং স্বেচ্ছাচার কচ্ছে, তাই ব'লে কি পরদুঃখকাতরতা একটা দোষ ব'লে গণ্য হবে? নিশ্চয়ই না।

বিভিন্ন ধর্ম্মমতের প্রচারে এবং তাহাতে বাধা

কোন একটী ধর্ম্মীয় উপসম্প্রদায়ের প্রচারকগণ এই অঞ্চলে খুব আনাগোনা করিতেছেন। তাঁহাদের প্রতি এক শ্রেণীর লোকের আস্তে আস্তে আনুগত্য সৃষ্টি হইতেছে, আর এক শ্রেণীর মনে জাগিতেছে প্রতিরোধ-চিন্তা। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া জনৈক জিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন,—এই যে নানা জনে নানা ধর্ম্মমত প্রচার করে যাচ্ছে, তদ্বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাঁরা নিজেদিগকে ধর্ম্মপ্রচারের যোগ্য ব'লে মনে কর্ব্বেন, তাঁরা নিজ নিজ ধর্ম্মমত প্রচার কর্ব্বেন, এটা ত' স্বাভাবিক। আমি কোনো সভাস্থলে দাঁড়িয়ে আমার নিজের ধর্ম্মমত প্রচারের চেষ্টা করি না। তার কারণ এই যে, আমার ধর্ম্মমত আমার আচার ও আচরণের মধ্য দিয়ে আপনিই ত' প্রতিফলিত হবে। ওটাকে আর প্রচারের প্রয়োজনীয়তা কি? আমি সভাস্থলে বলি, চরিত্রবান্ হও, সংযত হও, শক্তি অর্জ্জন কর, পরোপকারী হও, জীবহিতার্থে স্বার্থ বলি দাও,—এক কথায় প্রকৃত মানুষ হও। মনুষ্যত্বের সাধনাই আমার একমাত্র প্রচারিতব্য বিষয়। যা' পেলে, যা' কর্ল্লে মানুষ প্রকৃত মানুষ হবে, আমি মানুষকে তাই পাবার জন্য চেষ্টিত হতে এবং তা' কত্তে প্রেরণা দেই। ধর্ম্ম-সাধন

সম্পর্কে যদি কারো কিছু প্রয়োজন থাকে, সে আমার কাছে এসে নিভৃতে তা' জেনে যাবে, ওটা প্রচারের বস্তু নয়। কিন্তু নিজেদের ধর্ম্মমত প্রচারের আবশ্যকতা যাঁরা বোধ করেন, তাঁদের প্রচারের স্বাধীনতা স্বীকার কর্ত্তেই হবে। পৃথিবীর সবাই যদি নিজ নিজ ধর্ম্মমত এমন ভাবে প্রচার কর্ত্তে পারেন, যার ফলে অন্যমতাবলম্বীদের নিষ্ঠায় বা বিশ্বাসে আঘাত লাগবে না, তাহ'লে ত' হাজার জনের হাজার মত অবিরাম প্রচারে জগতের লাভই কিছু হবে, ক্ষতি হবে না। কিন্তু ধর্ম্মমতপ্রচারকারীরা অনেক সময়ে মানুষের স্বাধীন বিবেককে অর্থহীন অন্ধ আচরণের দাসত্ব স্বীকার কর্ত্তে যে বাধ্য করেন, চিন্তাশীল মানুষদের দ্বিধা বা আপত্তি ত' ঠিক সেইখানটায়। কেউ যদি নিজ ধর্ম্মমত প্রচারের সাহসিক কর্ম্মটীতে নামেন, তা হ'লে তাঁকে সেই সকল লোকের যুক্তি, তর্ক, সমালোচনা এবং বাধার জন্য প্রস্তুত থাক্‌তে হবে, যাঁরা জোর গলায় বা চোস্ত ভাষায় বা সুললিত ছন্দে কেউ কোনো কথা বলেছে ব'লেই তাকে নির্ব্বিচারে সত্য কথা বা শেষ কথা ব'লে মেনে নিতে পারেন না।

কর্ম্মি-সাধক ও সাধক-কর্ম্মী

একটী যুবক প্রশ্ন করিল,—দেশের সামূহিক অভ্যুদয় সাধনের জন্য কি ভাবে কাজ কর্ব্ব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেশ ও জাতির সামূহিক অভ্যুদয় সাধন কত্তে হ'লে, সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন প্রতি কার্য্যে সামূহিক দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করা। তারপরে বিচার ক'রে বের কত্তে হবে যে, সামূহিক অবনতি কি কারণে এসেছে এবং এই অধঃপাত-দশার গভীরতা কত, ব্যাপকতা কত। তারপরে একটী সুচিন্তিত কর্ম্মপন্থা বের ক'রে নিয়ে প্রত্যেক কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে কর্ম্মরুচিসম্পন্ন করার কত্তে হবে চেষ্টা। তারপরেই কত্তে হবে কর্ম্মরুচিসম্পন্ন বা কর্ম্মঠ ব্যক্তিকে সাধনশীল হ'তে প্রেরণা দেওয়া। সাধনশীল লোক কর্ম্মে নামলে কর্ম্ম নির্ভুল হয়, নিষ্কলঙ্ক হয়। সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞানের অনুশীলন আর চরিত্রকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। একজন অতীব দুষ্ট চরিত্রের লম্পটের সাধারণ ভদ্রতাচরণ মানুষকে ধোকা দিতে পারে। একজন লোক ভদ্র, এই কথাটাই শেষ কথা নয়। সে যে আবার চরিত্রবান্, সে যে ভদ্রতার মুখস প'রে অন্যকে প্রতারিত করে না, এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া প্রয়োজন। কর্ম্মক্ষেত্রে হুট্ ক'রে নেমে প'ড়ে শেষে কত জন হঠাৎ গুরুতর সব অপরাধের অনুষ্ঠান ক'রে ফেলেছে, এরূপ উদাহরণের অভাব নেই। সুতরাং কর্ম্মীকে সাধক করার দিকে এবং সাধককে কর্ম্মী করার দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। চাই আমাদের সাধক-

কর্ম্মী, চাই আমাদের কর্ম্মী-সাধক। এঁদের যদি পাই, তবে দেশমাতার বন্ধন-দশা নিবারণ অতি সহজ কাজ হ'য়ে পড়্‌বে।

শান্তি লাভের উপায়

একজন প্রশ্ন করিল,—শান্তি লাভের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অশান্তি অকারণে আসে না। সব অশান্তিই একটা না একটা কারণে ভর ক'রেই আসে। কারো অশান্তি আসে লোভের দরুণ। শান্তি লাভের জন্য তাকে লোভ জয় কত্তে হয়। কারো বা অশান্তি আসে ক্রোধের দরুণ। শান্তি লাভের জন্য তাকে অনুশীলন কত্তে হবে অক্রোধের। কারো কারো বা জগতের প্রায় প্রত্যেকেরই অশান্তি আসে কামের পীড়নে। এই অবস্থায় কামকে জয় করাই হচ্ছে শান্তি লাভের পথ। কিন্তু ঈশ্বরে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের অভাব এবং তাঁর চরণে অকপট আত্ম-সমর্পণের অক্ষমতাই সব অশান্তির আসল মূল। এমতাবস্থায় ঈশ্বরে বিশ্বাসকে দৃঢ় করার চেষ্টা করা এবং তাঁতে আত্মসমর্পণের সাধনা অবিরাম করে যেতে থাকাই শান্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

বিশ্বাস কিসে আসে

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—বিশ্বাস কিসে আসে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অকপট বিশ্বাসীর সঙ্গ পেলে অন্তরে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়।

আত্মসমর্পণ কিসে আসে ও তাহার ফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজের সসীম ক্ষমতাকে নগণ্য জ্ঞান ক'রে নিজেকে নিঃস্ব অনাথ জেনে ভগবানের নামাশ্রয় নিলে আপনা আপনি আত্মসমর্পণ আসে। ভগবানকে পরমপ্রেমময় এবং প্রাণপ্রিয়তম জেনে তাঁর নাম লক্ষ লক্ষ বার স্মরণ কত্তে থাক্‌লে বিনা চেষ্টায় তাঁতে আত্মসমর্পণ আসে। আত্মসমর্পণ এল ত' তোমার সকল শঙ্কা, আতঙ্ক, বিভীষিকা চিরতরে দূর হ'য়ে গেল, জান্‌বে।

আশীর্ব্বাদ

একজন বলিল,—কিছু আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিশ্চয়ই আশীর্ব্বাদ কর্ব্ব। আশীর্ব্বাদ কর্ব্ব, তোমার ভিতরে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ দীপ্তির প্রকাশ ঘটুক, তোমার প্রসিদ্ধি ও সমৃদ্ধি সর্ব্বজীবের কুশলে প্রয়োজিত হোক্। আশীর্ব্বাদ কর্ব্ব, জীবনের গতিপথ তোমার সরল হোক্, স্বচ্ছ হোক্, সুন্দর হোক্, নিষ্পাপ হোক্ আর

মানুষের কল্পনায় যা' শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠতর, তেমন সদ্‌গুণ-সমূহে যেন তুমি বিমণ্ডিত হও নিজ পৌরুষের বলে আর তপস্যার প্রভাবে।

নামাশ্রয়ী হও

অপর একজন বলিলেন,—সংসারে বড় অশান্তি। মেয়েতে মেয়েতে কলহ, ছেলেতে ছেলেতে লাঠালাঠি। একদিকে কর্ণপটহ হ'চ্ছে বিদীর্ণ, অন্য দিকে রক্তারক্তি দেখে হৃদয়ে জাগছে আতঙ্ক। কি করি? উপায় কি? বলুন দয়া ক'রে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এসব বাহ্য ব্যাপারকে অনাসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা কর। কলহের আওয়াজ কাণেই শুধু প্রবেশ করুক, প্রাণে প্রবেশ করিতে দিও না। সংসারের নানা বিচিত্র খেলায় উদ্বিগ্ন হ'য়ো না। তুমি নিশ্চিন্তে ভগবানের নাম ক'রে যাও। সকলের শান্তি তিনিই দেবেন। কোটি ব্রহ্মাণ্ডে তিনিই ত' বাবা একমাত্র দাতা। আর কে কি কাকে দিতে পারে? শান্তি চাও ত' তাঁরই কাছে চাও। চাইতে না পার ত' তাঁর উপরে নির্ভর ক'রে কেবল নাম ক'রে যাও। নামের গুণে সব হবে। বিপদ কাট্‌বে, কলহ থাম্‌বে, অজ্ঞানের অন্তরে জ্ঞানের আলো জ্বল্‌বে। নামকে কখনো তুচ্ছ জ্ঞান ক'রো না। সর্ব্বতোভাবে নামাশ্রয়ী হও।

পুত্রকে মানুষ করা

একজন দর্শনার্থী বলিলেন,—দয়া ক'রে আশীর্ব্বাদ করুন, আমার এই পুত্রদ্বয় যেন মানুষের মত মানুষ হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই আশীর্ব্বাদ আমি নিশ্চয়ই কর্ব্ব। অকপট আশীর্ব্বাদ অংশতঃ হ'লেও ফল্‌বেই ফল্‌বে। কিন্তু শুধু আমি আশীর্ব্বাদ কর্ল্লেই ত' হবে না। পুত্রদ্বয়কে আদর্শ দেখাবে তোমরা স্বামিস্ত্রী দুজনে, উপদেশ দেবে একটী উৎকৃষ্ট আদর্শের অনুসরণ ক'রে আদর্শবান্ পুরুষ ও মহিলাদের জীবনের দৃষ্টান্ত-সমূহ তাদের চোখের সামনে দেদীপ্যমান ক'রে ধর্‌বে, এইরূপ মহনীয়-চরিত্রের মানুষই যে প্রকৃত মানুষ, এই কথাটী তাদের মনের পরতে ক্ষোদাই ক'রে দেবে, তবে ত' এই আশা কত্তে পার। মা-বাপ ছেলের মানসিক গঠনটীকে মহজ্জীবন যাপনের উপযোগী ক'রে দেবার জন্য কিছুই কর্ব্বেন না, আর মনে মনে কেবল আশা কর্ব্বেন যে, হয় স্কুলের মাষ্টার মশায়রা গাধা পিটিয়ে ঘোড়া কর্‌বেন, নয় সাধু-মহাপুরুষেরা আশীর্ব্বাদের জোরে তোমাদের কুলতিলকদিগকে ইন্দ্রজয়ী মহাপুরুষে পরিণত ক'রে দেবেন, এটা কিন্তু হয় না। বীর্য্যে, সাহসে, কর্ম্মঠতায় আর বিচিত্র জীবন-প্রতিভায় দীপ্ত পুরুষ বোধ হয় শঙ্করাচার্য্যের পরে স্বামী বিবেকানন্দের মতন আজ তক্ আর কেউ এদেশে আবির্ভূত হন নি, কিন্তু পিতামাতারা তাঁর নামে জয়ধ্বনিই

দিলেন, তাঁর অলোক-সামান্য চরিত্রের অনুসরণে জীবন-গঠন কত্তে পুত্রদের প্রেরণা দিলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় পুরুষসিংহ এই ত' সেদিন জন্মেছিলেন, কিন্তু কয় জন পিতা নিজ নিজ পুত্রকে বিদ্যাসাগর-জীবনের বিশেষত্বগুলির দিকে অঙ্গুলী হেলন ক'রে জীবন-গঠনের পথ চিনিয়ে দিয়েছেন? তোমার পুত্রদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ আমি নিশ্চয়ই কর্ব্ব এবং কচ্ছি কিন্তু ঘরে ব'সে তাদের প্রতি তোমাদের যে কর্ত্তব্য, সেইটুকুতে অবহেলা ক'রো না।

দার্শনিক, কবি ও কর্ম্মী

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—কেমন মানুষের জীবন প্রেরণার উৎস হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কর্ম্মীর, কবিরও নয়, দার্শনিকেরও নয়। দার্শনিক নূতন চিন্তার নবারুণ প্রকাশমান কত্তে পারেন, কিন্তু তাও তিনি করেন কথার মধ্য দিয়ে, শব্দোচ্চারণ ক'রে। কবি অজ্ঞাত সৌন্দর্য্যকে সুন্দরতম সুষমায় মণ্ডিত ক'রে লোকের রোমাঞ্চ সৃষ্টি কত্তে পারেন কিন্তু প্রেরণা দিতে অক্ষম হতেও পারেন। Thrill (উল্লাস) আর inspiration (প্রেরণা) দুটা একেবারে আলাদা জিনিষ। কর্ম্মী কথা কন কর্ম্মের ভাষায়। তাঁর কর্ম্মই তাঁর কবিত্ব প্রকাশ করে, তাঁর কর্ম্মই মুখর হ'য়ে সঙ্গীতে রূপ পায়,

কর্ম্মের ভাষ্যতেই তিনি কথা কন। দার্শনিক কথা কন যুক্তির ভাষায়, যা' নির্ভরশীল তথ্যের উপর। কবি কথা কন সৌন্দর্য্যের ভাষায়, যা' নির্ভরশীল রসানুভূতির উপর। কর্ম্মী কথা কন কর্ম্মের ভাষায়, যা' নির্ভরশীল নিত্য-উপচীয়মান অত্মোৎসর্গের উপর। এই জন্যই কর্ম্মীর জীবন মানুষের প্রেরণার মহত্তম উৎস।

নামের সেবার ফল কি

আর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার প্রকৃত কর্ত্তব্যটি কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার প্রকৃত কর্ত্তব্য হচ্ছে ভগবানের নামের সেবায় মন দেওয়া।

প্রশ্ন হইল,—নামের সেবায় কি লাভ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নাম কর্ল্লে বিশ্বাস আসে। বিশ্বাসের ফলে শান্তি আসে। জীবনে শান্তির চেয়ে বৃহত্তর আর মহত্তর কাম্য মানুষের আর কিছু নেই।

সংসার-কারাগারে দুঃখমুক্তির উপায়

একজন জিজ্ঞাসু তাঁহার সংসারের সহস্র অশান্তির কথা ব্যক্ত করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে সান্ত্বনা যাচ্ঞা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংসার এমন এক রুদ্ধদ্বার কারাগার, যার ভিতরে যে কেউ প্রবেশ করুক, পেতে হবে তাকে দুঃখ, তাপ আর অশান্তি। এখানে এলে সবাইকে ব্যথা, বেদনা, লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ সারা জীবন ভ'রেই ভুগতে হয়। এই নিয়তির হাত থেকে কারো নিস্তার নেই। রামই হোন আর কৃষ্ণই হোন, প্রত্যেককেই আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথা, অপ্রত্যাশিত উৎপাতের উপদ্রব সইতে হবে, অকারণ অশান্তি ও অনর্থক সংগ্রামে রত হ'তে হয়। তবে জীবের উপায় কি? উপায় নিরন্তর ভগবৎ-স্মরণ। ভগবানের সঙ্গে কি সম্বন্ধ, সেটা তত বড় কথা নয়, যে-কোনও সম্বন্ধে সম্বন্ধায়িত হ'য়ে তুমি নিরন্তর ভগবৎ-স্মরণ কচ্ছ কিনা, এটাই আসল কথা। স্মরণ যদি কর, দুঃখ তোমার দূরে যাবে, দুঃখের হাত থেকে তোমার মুক্তি ঘট্‌বে। পরমেশ্বরের সঙ্গে অভেদ-সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে তুমি সোhহং জপতে পার, ভগবানকে প্রভু জেনে, পতি জেনে, বন্ধু জেনে, পিতা জেনে, পুত্র জেনে, মা জেনে বা কন্যা জেনে তুমি তাঁকে স্মরণ কত্তে পার। মোট কথা, নিরন্তর স্মরণ করা চাই। সংসার-কারাগারের নিত্য দুঃখ—ক্ষুধার, তৃষ্ণার, বাসনার, লালসার, যশস্পৃহার, কর্ত্তৃত্বলোভের। অনুক্ষণ ভগবৎ-স্মরণের দ্বারা এই সব দুঃখ থেকে নিশ্চিত পরিত্রাণ সম্ভব। তারই জন্য যুগে যুগে মহাজনেরা আবির্ভূত হ'য়ে জীবকে বলেছেন, তোরা নাম কর, তোরা নাম কর।

তারই জন্য যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভগবানের নাম ক'রে গেছে আর শান্তিও পেয়েছে।

চরিত্রবত্তা বনাম মদ্যপান

একটী তরুণকে শ্রীশ্রীবাবামণি উপদেশ করিলেন,— সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা কর্ব্বে চরিত্রবান্ থাক্‌বার জন্য। এজন্য তোমাকে প্রথমেই পরিহার কত্তে হবে কুসঙ্গ। ছেড়ে দিতে হবে কুৎসিত বিষয়ে আলাপ, আলোচনা, চিন্তা ও কল্পনা। অতিভাষী মানুষেরা প্রায়ই এমন আলোচনায় মত্ত হয়, যার ভিতরে সার থাকে কম, অসার বস্তুই থাকে বেশী। এই অসার বস্তুগুলি হজম না কত্তে পেরে যুবক-মন নানা কলুষিত ইঙ্গিত সংগ্রহ করে নিজের তারুণ্যের স্বভাবেই। নিষিদ্ধ খাদ্য-পানীয় স্পর্শ মাত্রও কর্ব্বে না। ইংরিজি শিক্ষা প্রথম প্রচলনের পরে বাংলার অধিকাংশ কৃতবিদ্য তরুণ মদ্য-মাংসকে জীবন-সঙ্গী ক'রে তুলেছিল। তার ফল ভাল হয় নি। দেশের বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যগুলি দূর হ'য়ে যাবার পরে যখন সুদিন আসবে, তখন আবার হয়ত পাড়ায় পাড়ায় অলিতে-গলিতে নূতন ক'রে শরাবিদের আড্ডা বস্‌বে, মদের ভাঁটিগুলি পূরাদমে কাজ শুরু কর্ব্বে। সুদূর ভবিষ্যতের সেই বিপজ্জনক দিনগুলির দিকে তাকিয়ে তোমাদের এখনই কৃতসঙ্কল্প হ'তে হবে যে, এমন কিছু কাজ আমাদের ক'রে রাখা চাই, যাতে মাদক

দ্রব্য এই দেশের যুবক-যুবতীদের কাছে কখনো সমাদর না পায়। যতই সভ্য হও আর ভব্য হও, মদ একবার যদি ধরেছ ত' তোমার চরিত্রের টুঁটি ধ'রে চেপে বস্‌বে ইন্দ্রিয়-লালসা মাত্র দুচার দশ সেকেণ্ডের মধ্যে। তান্ত্রিকেরা ভৈরবী-চক্রে ব'সে মদ্যপান করেন ব'লে চোস্ত ভাষায় তোমরা তাঁদের কত গাল দাও। ভেবে দে'খো দেশের আশা-ভরসার মাণিকেরা যখন দেশসেবার নাম ক'রে মদ্যপান শুরু করবে পাইকারী হারে, তখন তা' আরো কত অধিক নিন্দনীয় হবে। শীত-প্রধান পাশ্চাত্য দেশের খবর বল্‌তে পার্ব্ব না, কিন্তু আমাদের এই নাতিশীতল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মদ্যপান কদাচ চারিত্রিক শক্তি রক্ষার সহায়ক নয়।

পরের মনের কথা জানা

একজন প্রশ্ন করিল,—বাবামণি, আপনি কি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যিনি যার অন্তরে বাস করেন, তিনি তার মনের কথা জান্‌তে পারেন। অন্যের জানার উপায় নেই, তবে অনুমান করার বহু উপায় আছে। যেমন, অসদ্‌ব্যবসায়ী জ্যোতিষীরা তাদের শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী যা বুঝতে বা জানতে পারে না, তা অনুমান-শক্তির সাহায্যে ঠিক ক'রে নেয় এবং আন্দাজে আন্দাজে সুকৌশলে এমন

কতকগুলি কথা ব'লে দেয়, যা' শুনে মক্কেলের চক্ষু হয় চড়কগাছ। সে আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবে, এমন সব খবর লোকটী জান্‌ল কি ক'রে? তখন তার জ্যোতিষীর উপরে খুব বিশ্বাস এসে যায় এবং তার পরে ঐ ভদ্রলোকের আবোল-তাবোল সব কথাই বেদবাক্য জ্ঞান ক'রে পালন করার চেষ্টা হয়। কারো মনের কথা জানতে হ'লে আমাকে তার মনের ভিতরে গিয়ে বাস কত্তে হবে। তবে ত' আমি তার মনের কথাটী ঠিক্ ঠিক্ ভাবে এবং সম্যক্ বুঝতে পার্ব্ব। অপরের মনের খবর জানার এই যে সামর্থ্য, তা' অল্প-বিস্তর প্রত্যেকটী মানুষের আছে। তবে তা' এমন সূক্ষ্মভাবে আছে, যাতে সে তার অস্তিত্বের খবরটা আর পায়ই না। মহাপুরুষদের কারো কারো এই শক্তি খুব বেশীই থাকে এবং এর দৌলতে পার্থিব প্রতিষ্ঠা হয়ই কল্পনাতীত ভাবে প্রচুর। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সর্ব্বজীবে প্রেম আসাটাই মহাপুরুষের সব চেয়ে বড় লক্ষণ, পরের মনের কথা তিনি বুঝতে পারেন, কি না পারেন ওটা নিতান্ত গৌণ ব্যাপার। আমি পরের মনের গহন গভীর গুপ্ত কথা জান্‌বার জন্য জীবনে কখনো আগ্রহ অনুভব করিনি, এজন্য আমার এই বিষয়ে কোনো অনুশীলনও নেই। ফলতঃ এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধিও আমি অর্জ্জন করি নি। যার মনে যাই থাকুক, নিঃসঙ্কোচে আমার নিকটে আসতে পার, কারণ, আমি সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র প্রেমেই

তোমাকে দিতে চাই, অন্য বস্তুর ভাণ্ডার আমার একেবারেই খালি।

ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসীর জগজ্জনসেবার পদ্ধতি

জনৈক যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— জগতের মঙ্গলসাধন কত্তে চাও? এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হ'তে পারে? সবাই ত' দেখছি নিজ নিজ স্বার্থ-সাধনের দুশ্চিন্তাতেই মগ্ন। তার মাঝেও মধ্যে মধ্যে তোমরা যে কেউ কেউ জগতের মঙ্গলসাধনের জন্য আগ্রহ অনুভব কর, এর চাইতে গৌরবের বিষয় আর কি হ'তে পারে? তবে, একটী কথা মনে রেখো যে, ঈশ্বর-পরায়ণ হ'তে পার্লে জগতের কল্যাণ করার শক্তি সহজে অতি দ্রুত বাড়ে। কারণ, ঈশ্বর-পরায়ণতা মানুষের চরিত্রকে নির্ম্মল করে, চিত্তকে লালসামুক্ত করে, মনকে প্রলোভন জয় করার ক্ষমতা দেয়। কেউ যদি বলে, সে ঈশ্বর মানে না কিন্তু জগতের কল্যাণ কত্তে চায়, তবে তার সঙ্গে আমার বিরোধ নেই। নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জগৎ-কল্যাণ কথাটীকে ব্যবহার না ক'রে যদি কেউ সত্য সত্য জগদ্বাসীর কুশলের জন্য আগ্রহী হয়, তবে সে আস্তিক, না নাস্তিক, এই বিচারে আমার কোনো লাভ নেই। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাননি

ব'লে অনেকে তাঁকে মানেন না, কিন্তু জগৎ-জোড়া লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরনারীর দুঃখদুর্দ্দশা দেখে ব্যথিত-হৃদয় হ'য়ে তাঁদের দুঃখবিদূরণের জন্য আপ্রাণ সেবা দিতে প্রস্তুত হন। এঁরা হেয় নন, এঁরাও নমস্য। তবে, ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোকের অন্তরে সর্ব্বদা বিরাজ করে এমন এক শান্তি, যার অমৃত-প্রবাহে সর্ব্বাঙ্গ ঢেলে দিয়ে সেবা-কার্য্য কত্তে আত্মপ্রসাদ মেলে অফুরন্ত। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী লোকেরা জনসেবার পথে প্রতিবন্ধক দেখ্‌তে পেলে নিজেদের হাতে বিচার তুলে নিয়ে বাধাদানকারীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করেন, কোটি কোটি মানবের রক্তে আর মেদে মেদিনীকে আপ্লুত ক'রে দেন। বিশ্বাসীর জগৎ-সেবা আর ঈশ্বরে অবিশ্বাসীর জগৎ-সেবায় এই পার্থক্যটুকু থেকে যায়।

শিক্ষিতা বয়স্কা কন্যার বর-নির্ব্বাচনে

শহর হইতে আগত একজন ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন,— শিক্ষিতা মেয়ে যদি বিপথে যায় বা এমন পরিবারে গিয়ে বিবাহ কত্তে ব্যাকুল হয়, যেখানে গেলে তার মাতৃকুল-পিতৃকুলের সম্মান নষ্ট হয়, তবে পিতামাতার এক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মেয়ে বিপথে গেলেই

পিতামাতার এক রকম কর্ত্তব্য। বিবাহিতা হ'তে গেলেই অন্যরূপ কর্ত্তব্য। বিপথগামিনী কন্যা শিক্ষিতাই হোক্ আর অশিক্ষিতাই হোক্ তাকে ফিরাবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সদুপায় অবলম্বন করা যেতে পারে কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কা সুশিক্ষিতা মেয়ে যদি নিজের বর নিজেই পছন্দ ক'রে থাকে আর এই বিষয়ে বাপ-মায়ের মতামতের কোনো তোয়াক্কাই না রাখে, তবে তার ভবিষ্যৎ জীবন যাতে দুঃখময় না হয়, তার দিকে তাকিয়ে পিতামাতা বা গুরুজনেরা তাকে হিতোপদেশ দিতে পারেন। যুগ যে ভাবে পালটাচ্ছে, তাতে পিতামাতার অভিমতের প্রতি পুত্রকন্যাদের ভাব, ভক্তি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতাবোধ হয়ত বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে লুপ্তপ্রায় হ'য়ে যাবে। তবু সন্তানের ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখের সম্ভাবনাগুলি বিচার ক'রে দেখে পিতামাতার দিক থেকে বাধা দেবার জন্য বা কুণ্ঠাহীন সহযোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

নাম-মাহাত্ম্য

অপরাহ্নে বক্তৃতারম্ভ হইল। পর পর দুই জন স্থানীয় বক্তা কিছু বলিবার পরে খিলপাড়া হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দত্ত কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে একজন আসিয়া কাণে কাণে

শ্রীশ্রীবাবামণিকে একটী দুঃসংবাদ জানাইলেন যে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এক উচ্চকুলসম্ভূতা মহিলা আত্মহত্যার জন্য গলায় দড়ি দিয়াছেন। ব্যাপার কি? না গতকল্যে তাঁহাকে ভৌমিক-বাড়ীতে গুরুর প্রসাদ পাইবার জন্য আসিতে দেওয়া হয় নাই। জাতি বিচারে বাঁধে।

শ্রীশ্রীবাবামণি উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন,—মুস্কিল হ'ল।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবন্ধু গোস্বামী ও শ্রীমান্ জগদিন্দু নারায়ণ শর্ম্মাকে শ্রীশ্রীবাবামণি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন,—কারো আয়ুস্কাল পূর্ণ হ'য়ে গেলে তাকে আর ধ'রে রাখা যায় না। তবু তোরা যা। যে অবস্থায় মেয়েটীকে পাস্, কেবল হরিওঁ নাম-কীর্ত্তন শোনা।

উল্লিখিত ভক্তেরা ছুটিয়া যথাস্থানে গেলেন এবং শায়িতাবস্থায় মহিলাটীকে পাইলেন। আত্মীয়েরা উদ্বন্ধনের দড়ি কাটিয়া তাঁহাকে নামাইয়াছেন। শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুই নাই।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবন্ধু বলিলেন,—প্রাণ থাকুক আর না থাকুক, আমরা ইহাকে নাম শুনাইব।

নাম শুনাইতে শুনাইতে কিছুকাল পরে সকলে লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন যে, শরীরে প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়া আসিতেছে। সুদীর্ঘ দুই ঘণ্টা কাল নামকীর্ত্তন করিয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবন্ধু ফিরিয়া আসিলে শ্রীশ্রীবাবামণির চরণে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এটা আমার

কোনও বিভূতি নয়। এটা নামের মাহাত্ম্য। সব চেয়ে বড় কথা, মেয়েটীর প্রাণ ছিল। তার কারণ, ভগবানের কৃপা তার উপরে ছিল। এই ঘটনা উপলক্ষ্য ক'রে তোমরা কোথাও আমার মহিমা বাড়াবার চেষ্টা ক'রো না। নামের মহিমাতে জীবনে অনেক অসাধ্য সাধিত হয়, সরল-বিশ্বাসী আমরা একথা অকপটে এবং বিনা তর্কে বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসটুকুই আমাদের অন্তরের বল, ভরসা ও আশ্বাস। মানুষের কঠোর তর্ক আর ধারালো যুক্তি আমাদের এই বিশ্বাসটুকুকে যেন কখনো খণ্ডিত কত্তে না পারে। তবে জানো? অবতারবাদের দাপটে সরল স্বাভাবিক সব ব্যাপারও অলৌকিক হ'য়ে দাঁড়ায় এবং মানুষকে ভ্রান্তিতে বেড়ে ধরে। নামের মহিমাতে জগতে যেখানে যা-কিছু ঘট্‌বে, তার জন্য নামকেই তার প্রাপ্য পূজা পেতে দিও। নামকে উপলক্ষ্য ক'রে আমাদের মত ক্ষণভঙ্গুর দেহধারী মানুষকে পূজা করার প্রবৃত্তি সৃষ্টি ক'রো না।

রাজগঞ্জ (নোয়াখালী)
১০ই কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৪২
(২৭শে অক্টোবর ১৯৩৫)

সাম্প্রদায়িকতা

রাজগঞ্জে ভাষণ হইতেছে। একজন বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোকের অনুরোধে শ্রীশ্রীবাবামণি সর্ব্বপ্রথমে সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে আলোচনা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—খোলা একটা ময়দানে মানুষ স্ত্রীপুত্র-পরিজন নিয়ে বাস কত্তে পারে না, নানা অসুবিধা ঘটে। এই জন্যই তারা একটা বেড়া দিয়ে কতকটা জায়গা ঘিরে নিয়ে সেই সীমানার মধ্যেই ঘর-দুয়ার তৈরী ক'রে বাস করে। এর নাম হচ্ছে সম্প্রদায় গড়া। কিন্তু নিজের ঘরের মধ্যে বা শুধু নিজের আঙ্গিনাটুকুতে বিচরণ কর্ল্লেই মানুষের চলে না। তাকে বাইরেও যেতে হয়। বাইরের মানুষের সঙ্গে নানাবিধ আদান-প্রদান কত্তে হয়। এই যে তার বাইরে আনাগোনা, এই যে তার সীমানার বহির্ভূত লোক, পরিবার বা সমাজের সঙ্গে যোগাযোগের আবশ্যকতা,—এইটুকুরই নাম অসাম্প্রদায়িকতা। আমি আমার গৃহ-সীমানার মধ্যে থেকে এমন অনেক কাজ কত্তে পারি, যা' সীমানার বাইরে গিয়ে করায় আমার অসুবিধা বা অন্যের অসুবিধা। আমি গৃহসীমানার বাইরে গিয়ে আবার এমন অনেক কাজ কত্তে পারি, যা' আমার গৃহ ও সীমানা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও ছোট ব'লে সেখানে কত্তে পারি না। এই সকল কারণ থেকে অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক বিধি-নিষেধের উৎপত্তি ঘটেছে। একজনের সীমানা যত দিন আর এক জনের সীমানা থেকে আলাদা থাক্‌বে, ততদিন জগতে নানারূপ সাম্প্রদায়িক বিধিনিষেধ থাক্‌বেই। এ নিয়ে বিতর্ক, বিতণ্ডা, কলহ বা সংঘর্ষের কোনো যুক্তি নেই।

ঈশ্বর এক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সম্প্রদায় জগতে যতই সৃষ্ট হউক না কেন, ঈশ্বর কিন্তু অনেক নন, তিনি এক, তিনি অদ্বিতীয়। তাঁকে কেউ এক প্রকারে কেউ বা অন্য প্রকারে ভজনা কচ্ছে ব'লেই তিনি তাঁর নিজস্বতা অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব হারান না। তাঁকে কে যে কি ভাবে দেখ্‌ছে বা বুঝতে পাচ্ছে, তার রকমারি-পার্থক্য থেকে এই ধারণা করা উচিত নয় যে, তিনি নানা জনের জন্য নানা। তিনি সকলের জন্যই এক। সকলে একমাত্র তাঁকেই চায়, চেয়েছে এবং চাইবে। সকলে একমাত্র তাঁকেই পায়, পেয়েছে এবং পাবে। সিদ্ধ সাধকেরা সকলে একমাত্র তাঁকেই জানে, জেনেছে এবং জান্‌বে। কে ভুল পথে চলেছে, তা নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি না ক'রে আমরা যে যার বুঝ অনুযায়ী সরল অন্তঃকরণে নিজ নিজ পথ চল্‌তে নিশ্চয় পারি। আর, তাই যদি পারি, তা হ'লে আর পরধর্ম্মদ্বেষের প্রশ্নই উঠ্‌তে পারে না। ধর্ম্মের নামে কারো অনৈতিক আচরণ দেখ্‌লে সমাজ তার প্রতিবাদ কর্ব্বেই। কিন্তু কার ধর্ম্ম বড়, কার ধর্ম্ম ছোট, কার ধর্ম্ম খাঁটি আর কার ধর্ম্ম ভেজাল, এই বিতর্কে প্রবেশ ক'রে কারো কোনো লাভ হবার উপায় নেই। যে কাজে লাভ নেই, সে কাজে পণ্ডশ্রম কর্ব্বে শুধু মূর্খেরা। ভগবান্ করুন আমরা যেন তেমন মূর্খ কখনো না হই।

নিষ্কলঙ্ক চরিত্র

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্র নিয়ে যে যেই পথেই চলুক, তার চরিত্রবল তাকে সুনিশ্চিত সৎপথে, সত্যপথে, নিত্যানন্দের পথে পরিচালিত কর্ব্বে। এই জন্যই প্রতিটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মননশীল লোকদের কর্ত্তব্য হচ্ছে নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের মনে চরিত্রের মহিমা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা ও প্রবল আবেগ সৃষ্টি করার অনুকূলে কাজ ক'রে যাওয়া। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সময়ে অনেক স্থানে যে উন্মত্ত জনতার মধ্যে লজ্জাকর দুশ্চরিত্রতার উদ্দাম উন্মাদনা দেখা দেয়, তা' হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে জনসাধারণের মধ্যে চরিত্রগত শিক্ষাকে ও নির্ম্মল জীবন যাপনের আগ্রহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টার অভাবজনিত এক দুর্লক্ষণ। পৃথিবীপতি পরমেশ্বর তাঁর সৃষ্ট এই ধরিত্রীতে সুন্দর চরিত্রের নিষ্কলঙ্ক মানুষই দেখিতে চাহেন। দানব আর রাক্ষস, প্রেতিনী আর রাক্ষসী দিয়ে তিনি এই ধরণী পূর্ণ কত্তে চাইলে আমাদের আকৃতি কদাচ মানুষের মতন হ'ত না। মানুষের মগজ তিনি আমাদের দিয়েছেন, আমাদের চলা প্রয়োজন মানুষের মত হ'য়ে। "ইন্‌সান" কত সুন্দর একটী শব্দ। "ইন্‌সানিয়ৎ" নেই ত' সে আবার ইন্‌সান হ'ল কি ক'রে? মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সে সুন্দর তার চরিত্রে।

চরিত্রের মাধুর্য্যে যে মণ্ডিত, সে জগতের সকল রমণীকে নিজের মায়ের মত দেখে। চরিত্রের ঐশ্বর্য্যে যে সমৃদ্ধ, সে পরধনে লোভকে গর্হিত ব'লে বিবেচনা করে। চরিত্রের কোমলতায় যে পেলব, সে পরের দুঃখে, পরের বিপদে, পরের ক্লেশে নিজেকে দুঃখিত, বিপন্ন ও ক্লিষ্ট ব'লে অনুভব করে। এমন যে মানুষ, সেই ত' পূর্ণ মানুষ।

নিজ সম্প্রদায়ে চরিত্র-শোধন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে আশ্রিত মানুষেরই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের ভিতরে চরিত্রবান্ পুরুষ ও চরিত্রবতী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে প্রাণপণে মনযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, এর ফলে সম্প্রদায় প্রকৃত শক্তির অধিকারী হয়। দ্বিতীয় কারণ এই যে, একটী সম্প্রদায়ের লোকেরা সচ্চরিত্র, নীতিবান্, ন্যায়পরায়ণ ও সত্যশীল হ'লে প্রতিবেশী অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের উপরেও তার শুভময়-প্রভাব পতিত হয় এবং এভাবে নিখিল ভুবনে পবিত্রতার বাতাবরণ বর্দ্ধিত হয়। মানুষ যতই সৎ ও পবিত্র হবে, বর্ত্তমানের এই সাধারণ মনুষ্য-সমাজে উন্নতির সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে ততই ভাবী কালের অসাধারণ মহামানবদের আবির্ভাবের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরী হ'তে থাক্‌বে।

আমরা যে মানুষ হয়েছি, তা' কেবল মানুষ থাক্‌বার জন্য নয়। আমাদের বংশাবলীর মধ্যে নরদেবতার আবির্ভাব ঘট্‌বে, তারই জন্য। এক কালের মানুষ চিরকালই একই রূপ মানুষ থেকে যাবে, পরবর্ত্তী কালে বংশানুক্রমে তার কোনো অভ্যুন্নতি হবে না ত'! এটা কদাচ ঈশ্বরাভিপ্রায় হ'তে পার না। পরমেশ্বর চান যে, আমরা সাধারণ মানুষ থেকে যেন অসাধারণ মানুষ হ'তে পারি আর অসাধারণ মানুষ থেকে যেন দেব-মানবে বা নরদেবে পরিণত হ'তে পারি। তারই জন্য ত' তিনি কত সাধক, সিদ্ধ, মহাপুরুষ, অবতার, পয়গম্বর আদির দ্বারা মানুষের উন্নতি-সাধক উপদেশাবলি প্রদান করিয়েছেন। এই কথা মনে রেখে, ছোটবড় সব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক যদি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের আশ্রিত প্রতিটি মানুষকে সৎপথে পরিচালিত কর্ব্বার জন্য চারিত্রিক শিক্ষা ও নিষ্কলঙ্ক জীবনের প্রেরণা দেন, তবে সমগ্র জগৎ লাভবান্ হবে।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ, ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপায় এবং ব্রহ্মচর্য্যের প্রণালী ও সুফল প্রভৃতি সম্পর্কে বলিয়া পূর্ণ আড়াই ঘণ্টাতে বক্তৃতা সমাপন করিলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেই শত শত ধন্যবাদ জানাইতে জানাইতে এবং সাধুবাদ উচ্চারণ করিতে করিতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

টঙ্গিরপাড় (নোয়াখালী)
১২ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৪২
(২৯শে অক্টোবর, ১৯৩৫)

শ্রীশ্রীবাবামণি টঙ্গিরপাড় শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ভৌমিকের বাড়ী আসিয়াছেন।

মিলনের মহিমা

হুগলী জেলান্তর্গত বলাগড়-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যেখানে একাই তুমি একটী বিরাট কাজ সুসম্পন্ন করিতে পার, গুরুতর কার্য্যহানির সঙ্গত সম্ভাবনা না থাকিলে, তাহাতে তুমি অপর দশ জনকে কর্ম্মের অংশ বা ভার ভাগ করিয়া নিবার জন্য সদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া নিশ্চয়ই সসম্মানে সসম্ভ্রমে ডাকিতে পার। ইহাতে তোমার মহত্ত্ব ও চিত্তৌদার্য্য প্রমাণিত হইবে। দশ জনকে লইয়া কাজ করার ভিতরে যে আনন্দ আছে, একাকী সে কাজ করার ভিতরে সে আনন্দ নাই। মানুষ যেখানে মিলিতে পারিয়াছে, সেখানেই তাহার দেবত্ব প্রকাশের সুযোগ বাড়িয়াছে। এই জন্যই অতি প্রাচীনেরা একাকী তপস্যা না করিয়া দশ জনকে সঙ্গে লইয়া তপস্যায় বসিতেন। একাকী যজ্ঞ না করিয়া দশজনকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞারম্ভ করিতেন। আজকালও মহোৎসব বা মহাসঙ্কীর্ত্তন

একাকী একাকী হয় না, তাহাতে দশ, বিশ, শত বা সহস্র জনের সমাগম, সহযোগ ও সমপ্রাণতার প্রয়োজন হয়। যত পার, মানুষে মানুষে মিলনের সুযোগ বর্দ্ধিত কর। কারণ, মিলনের মহিমা অনির্ব্বচনীয়।”

সমবেত উপাসনা

জলপাইগুড়ি জেলান্তর্গত দোমোহনী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“একদা সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়াই বিচ্ছিন্ন পৃথিবী এক হইবে, এই স্বপ্ন অভাবনীয় হইলেও দুঃস্বপ্ন নহে। ব্যক্তিপূজার মাধ্যমে নহে, পরমেশ্বরের পূজার মাধ্যমেই মানুষ একমন একপ্রাণ হইবে। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির বিরোধ ঘটিতে পারে কিন্তু আমরা নিরেট মূর্খ, অজ্ঞান ও উন্মাদ না হইলে ঈশ্বরের সহিত ঈশ্বরের বিরোধের কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

“বহুজনের পূর্ণ সহযোগের মধ্য দিয়াই মহৎ ভবিষ্যতের রচনাকার্য্য সহজতর, এই কথা একজনেও ভুলিও না। আত্মিক একতা ব্যতীত কেবল মৌখিক একতা বা রাজনৈতিক চুক্তির একতা দ্বারা সে কাজ সহজ হয় না। সম্প্রদায়-বুদ্ধিহীন অবাধ উদার দৃষ্টির সৃষ্টি একমাত্র আত্মায় আত্মায় আত্মীয়তা দ্বারাই সম্ভব। বিশ্বের সকলকে এক করিবার জন্য আমার

কল্পনা, জল্পনা, পরিকল্পনা ও সমুদ্রমন্থন। সমবেত উপাসনা তাহারই অমৃতময় ফল।

"সমবেত উপাসনাকে লোকপ্রিয় করিতে হইবে। তাহার উপায় হইতেছে, আগে মন প্রাণ দিয়া নিঃশেষে মানুষকে ভালবাসা। তোমার ভালবাসা যদি খাঁটি হয়, তুমি অনায়াসে মানুষ মাত্রকেই সমবেত উপাসনার প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারিবে।

"কোনও প্রকার স্বার্থবোধ নিয়া কোনও মানুষকে সমবেত উপাসনায় ডাকিও না। নিঃস্বার্থ প্রেমের আহ্বানে সকলকে টানিয়া আন। যাহাদিগকে আজ বধির মনে করিতেছ, কাল হয়ত তাহারা তোমার অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত প্রাণের কথাটীকেও শুনিতে পাইবে। সুতরাং আশা ছাড়িয়া দিও না।

"তোমাদের যখন নিত্য নুতন স্থানে বদলীর চাকুরী, তখন জানিও ইহা নিত্য নূতন স্থানে সমবেত উপাসনাকে প্রচলিত করিবার চেষ্টার পক্ষে এক সুবর্ণ সুযোগ। তুমি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিও।

"সমবেত উপাসনা আমার প্রাণপ্রিয় অনুষ্ঠান। কিন্তু আমি একটী বক্তৃতামঞ্চ হইতেও এই বিষয়ে কোনও বাণী উচ্চারণ করিয়া কাহাকেও শুনাই নাই। আমার যাহারা অন্তরঙ্গ বন্ধু, সমবেত উপাসনাকে প্রচারিত, প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবে তাহারা। তাহারা প্রাণবান্ হইলে সকলই তাহারা করিতে পারিবে।"

ভগবানের নাম মহৌষধ

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কি বিবাহিত ব্যক্তি, কি অবিবাহিত ব্যক্তি, প্রত্যেক মানুষেরই মনের জোর থাকা চাই। মনের জোর না থাক্‌লে শুধু শুধু মানুষ নিজেকে রুগ্ন মনে করে এবং যে রোগ দেহে নেই, মনে নেই, যার অস্তিত্বই নেই, তাকেও "আছে আছে" মনে ক'রে কেবল সন্তাপ ভোগ কত্তে থাকে। মনের এই সদা-সন্তপ্ত ভাবকে জোর ক'রে দূর ক'রে দাও। অবশ্য, সত্য সত্য অসুখ হ'লে তার সুচিকিৎসা দরকার। অঙ্কুরেই রোগকে ধ্বংস কত্তে না পারলে তা' ক্রমশঃ বাড়্‌তে বাড়্‌তে অতি ভীষণ আকার ধারণ কত্তে পারে। কিন্তু নিজেকে সর্ব্বদাই রোগাতুর জ্ঞান ক'রে ক'রে কেবলি আতঙ্ক সঞ্চয় করার মত পাপ আর কিছু নেই। কথায় বলে, রোগ, ঋণ আর অগ্নিকে বাড়তে ত' দিতেই নেই, তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত ক'রে দেওয়ার চেষ্টা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে কোনো রোগই নেই, সেখানে রোগের চিন্তা ক'রে ক'রে উৎকট আতঙ্কে দিন কাটানোর কোনো মানে হয় না। মানুষের অধিকাংশ রোগ, তা' দেহেরই হোক আর মনেরই হোক্, একমাত্র মনের বলে নিরাময় হ'তে পারে। ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোকের এই জন্যই রোগ কম হয় এবং রোগ সহজে নির্ম্মূল হয়। তোমরা রোগের চিকিৎসার জন্য যেমন বৈদ্যের শরণাপন্ন হও, তেমন

ভগবানেরও শরণাপন্ন হ'য়ো। বৈদ্য তাঁর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী চিকিৎসা ক'রে তোমাকে নীরোগ কর্ব্বেন, ভগবানের নাম তোমার ভিতরে অফুরন্ত আশা, উদ্দীপনা, উৎসাহ এবং বিশ্বাস জুগিয়ে তোমার রোগারোগ্যকে সহজতর ক'রে দেবে। নামাশ্রয়ী পুরুষের মন সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে ব'লেই রোগ তাঁকে সহজে কাবু কত্তে পারে না। এই জন্যই ভগবানের নামকে মহৌষধ বলা হ'য়ে থাকে।

সংসার-ত্যাগ বনাম পিতৃমাতৃসেবা

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার আশ্রমে এসে তুমি সারা জীবন বাস কত্তে চাচ্ছ। চিরদিনের মত তুমি ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ ক'রে চলে যেতে চাচ্ছ। আমি কিন্তু চাচ্ছি তার বিপরীত কিছু। আমি চাই যে, তোমার সংসারটী আমার আশ্রমে পরিণত হোক্, তোমার মাতা-পিতা আমারও মাতা-পিতা হোন্, তোমার ভাইবোন আমার ভাই-বোন হোক্, তুমি যদি বিবাহ কর, তবে তোমার সহধর্ম্মিণী আমার গর্ভধারিণী মাতা হোন্। তুমি চাচ্ছ সংসার ফেলে এসে, সংসারের কর্ত্তব্য উপেক্ষা ক'রে আশ্রমে বাস কত্তে আর আমি চাচ্ছি তোমার সংসারটাকে আমার আশ্রমে পরিণত কত্তে। দেখ দেখি, কি বিচিত্র রুচি-পার্থক্য। তোমার পিতামাতার প্রতি তুমি কর্ত্তব্য

পালন কর্ব্বে না, তবে কি পরের ছেলেরা এসে তোমার মা-বাপকে দেখ্‌বে? বল্‌তে পার,—"আমি যদি ম'রে যেতাম, তবে মা-বাবা কি কত্তেন?" কথাটা বলা সহজ কিন্তু তুমি যতক্ষণ মরনি, ততক্ষণ একথা বলা অর্থহীন। আর, মরবেই বা কেন? কর্ত্তব্যের কঠোরতা দেখে মরতে চাও? তুমি ত' তা'হলে এক নম্বরের একটী কাপুরুষ। জীবনে কখনো কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দিও না। দিনের পর দিন অর্থনৈতিক অবস্থা দেশের খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে ব'লেই মানুষের কর্ত্তব্য পালন অতি কঠিন ব্যাপার হ'য়েছে। কিন্তু আরও গুরুতর দিন সম্মুখে আসছে, যেদিন অন্নাভাবে মঠ, মন্দির, আশ্রম, সাধুর আড্ডা প্রভৃতি সব একটার পর একটা পটল তুলতে আরম্ভ কর্ব্বে। সেদিন বাপ-মাকে ফেলে বাছাধনেরা কোথায় যাবে? সুতরাং ঘরে ফিরে যাও, প্রাণপণে পিতৃমাতৃসেবা কর। এর চেয়ে বড় পুণ্য পুত্রের পক্ষে আর কিছু নেই।

অনুরাগ, না চখের ভ্রম

জনৈক যুবক তাহার জীবনের কিছু বিবরণ বলিয়া সমস্যার সমাধান জানিতে চাহিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যুবক বা যুবতীরা যাকে অনুরাগ ব'লে মনে ক'রে থাকে, অনেক সময়েই তা' চখের ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। ভিন্ন একটী পরিবারের লোকের সঙ্গে তোমাদের পরিবারের সকলে

একদা একই ভাড়াটে বাড়ীর দুই অংশে ভাড়ায় বাস কত্তে। সেই সময়ে তুমি দেখ্‌তে পেতে যেন সদাহাস্যময়ী একটী বালিকা প্রায় সব সময়ই তোমার কাছে কাছে থাকতে ভালবাসত। তুমি ধ'রে নিলে যে, সে তোমাকে ভালবাসে। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে একদিন তারা গেল ছিটকে অনেক দূরের এক দেশে, তোমরা গেলে ছড়িয়ে অনেক দূরে অন্য এক দেশে। দেখা-সাক্ষাৎ নেই, যোগাযোগ নেই, চিঠিপত্র নেই, বাস্তব বা ভাষার আদান-প্রদান নেই, তবু তুমি ভাবছ যে, সে তোমাকে ভালবাসে। অনেক বছর তুমি তার প্রতীক্ষা ক'রে এসেছ কিন্তু তুমি সংসারে অপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং খোঁজে বের হবার কোনো সুযোগই তোমার ছিল না। যথাকালে বিদ্যার্জ্জন ক'রে ভালো কাজে বা উত্তম ব্যবসায়ে লেগে গেলে। অতি গোপনে শুরু করলে অন্বেষণ। বালিকাটীর ঠিকানাটীও পেয়ে গেলে। কাউকে কিছু না ব'লে সোজা চলে গেলে তাদের নূতন বাসস্থানে। দেখ্‌লে, তারা তোমাকে চিন্‌তে পেরেও কোনো আদর দেখাল না, তুমি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছ জেনেও কোনো আনন্দ প্রকাশ কর্ল্ল না। বরং তোমার জেলাবাসী লোকেরা যে কপট এবং প্রতারক, এই সব কথা ব'লে তোমাকে অপমান ক'রেই দিল, যার ফলে তুমি মনের কথাটী তাদের কারো কাছে প্রকাশ মাত্রও না ক'রে নিজের স্থানে ফিরে এলে। তবু তোমার মায়ামুগ্ধ

মন তোমাকে বল্‌ছে, "না, ঐ মেয়েটা আমাকে ভালবাসে।" তার ফলে তোমার সঙ্কল্প আরো প্রবল হচ্ছে,—"ঐ মেয়েটীকে আমার চাই, তাকে ছাড়া আর কাউকে আমি জীবন-সঙ্গিনী কর্ব্ব না।" এটা ভাল, কি মন্দ, তার উপরে রায় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে, এইটুকু বলতে পারি, একটী মেয়েকে একটী ছেলে ভালবেসে ফেলবে বা একটী ছেলেকে একটী মেয়ে ভালবেসে ফেল্‌বে, এটা স্বাভাবিক। এই ভালবাসা তার নিতান্তই ক্ষণিকের হবে, এটাও স্বাভাবিক। এই ভালবাসা হয়ত অনন্ত অক্ষয় শাশ্বত ও অপরিবর্ত্তনীয় হবে, এটাও স্বাভাবিক। কিন্তু এটাও স্বাভাবিক যে, যাকে ভালবাসা ব'লে মনে ক'রে সমস্ত জীবনটা উজাড় ক'রে ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, শতকরা নিরানব্বইটী স্থলে তা' ভ্রম, অথবা কারো একটু মুখের হাসি, কারো মেজাজের একখানি খুশীখুশী ভাব, কারো কথাবার্ত্তার একটুখানি কমনীয়তা, কারো ভদ্রতা-শিষ্টতার যৎসামান্য বাড়াবাড়ি বা কারো একখানা অচিন্তিত ভাষায় লিখিত কয়েকটী কোমল কথা, কারো বেশভূষার কিঞ্চিৎ পেলব প্রতিমা কখনো প্রকৃত অনুরাগের নিশ্চয়াত্মক লক্ষণ হ'তে পারে না। তাই, নিজের মনের কোনও ভাবকে ভালবাসা ব'লে মনে হ'লে তোমার নিজেরই সাবধান হ'য়ে যাওয়া উচিত যেন ভেজাল জিনিষকে কখনো আসল ব'লে কল্পনা ক'রে আকাশকুসুম রচনার

অবশ্যাম্ভাবী ব্যর্থতা-জনিত দুঃখে না পড়্‌তে হয়। মানুষের যখন জীবন, তখন এতে ভালবাসা থাক্‌বেই, বিরহও তেমন থাক্‌বে, ভালবাসার ছদ্মবেশে নিদারুণ শঠতা এবং ষড়যন্ত্রও থাক্‌বে, আশা থাক্‌বে, আশাভঙ্গও থাক্‌বে, লাভও থাক্‌বে, লোকসানও থাক্‌বে। জীবনকে পূর্ণতঃ আস্বাদ করার সাহস নিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে কিন্তু ব্যাধের মায়া-জালে জড়িয়ে না অকালেই সর্ব্বনাশ হ'য়ে যায়, এজন্য সতর্ক থাকতে হবে। শত যোজন বিস্তৃত মরুভূমির বালুকা-রাশির মধ্যে শত শত চরণের চিহ্ন দেখেই ভেবে বসো না যে, এই দিকেই পথ, অন্য দিকে নয়। এই মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকায় প্রলুব্ধ হ'য়ে কত শত জন যে চিরতরে নিখোঁজ হয়ে গেছে, তার কোনো ঠিকানাই নেই।

আত্মসমর্পণ ও সমস্যা-সমাধান

একজন প্রশ্ন করিলেন,—আমার জীবনের সমস্যার অন্ত-অবধি নাই। জীবন ভ'রেই কেবল সমস্যা আর সমস্যা। একটা দিনও নিশ্চিন্তে থাক্‌তে পাচ্ছি না। বলুন, আমার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাজার সমস্যার হাজার রকমের সমাধান। কিন্তু সর্ব্ব-সমস্যারও একটী সর্ব্ব-সামান্য সমাধান আছে। সেই সমাধানটী হ'ল নিরন্তর পরমেশ্বরে

আত্মসমর্পণ। তরঙ্গহীন সমুদ্র যেমন কল্পনা করা যায় না, সমস্যাহীন জীবন তেমন কল্পনা করা যায় না, মেঘহীন আকাশ যেমন অসম্ভব, সমস্যাহীন জীবন তেমন অসম্ভব। জগতের যত সমস্যা, বিপদ, বিঘ্ন এবং উৎপাত, সবই জীবিত মানুষের জন্য, মৃতের জন্য কোনো সমস্যা আর থাকে না। যতক্ষণ জীবিত আছ, সমস্যা থাক্‌বেই এবং তার সমাধানও তোমার কত্তেই হবে। নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাক্‌তে পার না। প্রত্যেকের জীবনেই সমস্যা আছে এবং প্রত্যেককেই নিজ নিজ শক্তিতে সমস্যার সমাধান ক'রে নিতে হবে। তোমার আত্মশক্তি যাতে অবশ, বিবশ, পঙ্গু ও অকর্ম্মণ্য না হ'য়ে প'ড়ে, তারই জন্য চাই তোমার পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ। পরমেশ্বরের সঙ্গে তোমার এমন একটা নিত্য-সম্বন্ধ বিরাজমান, যার দরুণ তাঁতে আত্মসমর্পণের চেষ্টা-মাত্রই তোমার ভিতরে অপরিসীম শক্তির উদয় হবে। আমরা আত্মসমর্পণ কত্তে পারি নে ব'লেই ত' নানা সমস্যার উৎপীড়নে কাতর হই। জীবনের কোনো সমস্যাকেই চূড়ান্ত ব'লে কদাচ মেনে নিও না। নিরন্তর পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে প্রতিটি সমস্যাকেই মিটিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য অর্জ্জনে চেষ্টা কর। জীবনে দশবার, বিশবার, পঞ্চাশ বারও হেরে যেতে পার, কিন্তু চূড়ান্ত জয় যে তোমারই হবে, এই বিশ্বাস রেখে অগ্রসর হও।

ঈশ্বর-বিশ্বাসের দ্বিবিধ সুফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঈশ্বরে বিশ্বাসের চূড়ান্ত সুফলটুকু হচ্ছে এই যে, এই বিশ্বাস তোমাকে নিয়ত সৎকর্ম্মে যুক্ত হ'য়ে থাক্‌তে প্রেরণা দেয়, এই বিশ্বাস তোমাকে প্রতিনিয়ত অসৎ কর্ম্ম হইতে দূরে থাক্‌বার প্রেরণা জোগায়। এই দুই শুভফলকে যদি তুমি তর্কস্থলে নিজের কোনো হিত ব'লে নাও মান্য কর, তথাপি এই দুইটী শুভফল যে ব্যাপক সমাজের বিস্তৃত জীবনে শুভফলদায়ক, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কোনো দুর্ভাগা ব্যক্তি তর্ক কত্তে পারে যে, সৎকর্ম্মে-রুচিসম্পন্ন হওয়াতে তার নিজের কোনো লাভ নেই। সেই দুর্ভাগা লোকটা এরূপ তর্কও কত্তে পারে, অসৎ-কর্ম্ম হ'তে প্রতিনিবৃত্ত থাকার দরুণ তার ত' কোনো লাভ হচ্ছে না। অন্য লোকেরা অসৎ-কর্ম্মে লিপ্ত থেকেও যদি নানাবিধ সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে থাকে, তবে তার পক্ষে অসৎ-কর্ম্ম থেকে দূরে থাকায় কি আর লাভ হ'ল? কিন্তু এর ফলে সমাজের অন্যান্য সহস্র নরনারী যে উপকৃত হ'ল এটা কি একটা কম কথা?

ঈশ্বর-স্মরণ জীবনের স্বর্ণযুগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগতে প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হ'লে জগদ্‌বাসী নানা ভাবে লাভবান্ হবে।

অধিকাংশ লোক ঈশ্বর-বিশ্বাসী হ'লে জগৎ থেকে অধিকাংশ পাপ দূর হয়ে যাবে। ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা পরের দুঃখে কাঁদে, নিজের দুঃখে হাসে। দণ্ড, উৎপীড়ন, অপমান ও মৃত্যুকে হেলায় তুচ্ছ ক'রে চ'লে যায়। যে কোনো ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে তোমার ভিতরে যদি ঈশ্বর-স্মরণ জাগে, তবে জান্‌বে, ঐ জাগরণটুকু তোমার জীবনের স্বর্ণযুগ।

ধিক্কৃত বন্ধুত্ব

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বন্ধুত্বের বড়াই ক'রে কোনো লাভ নেই, যদি উভয় পক্ষ স্বার্থপরতা পরিহার কত্তে না পার। কত লোক ত' কত লোকের বন্ধু ব'লে বর্ণনা কচ্ছে, কিন্তু সুদীর্ঘকাল একত্র ব্যবসায় ক'রেও স্বার্থের ব্যাপারে একজন আর একজনকে ঠকায়নি, এমন দৃষ্টান্ত কয়টা দিতে পারবে? অনেক স্থলে দেখা যাচ্ছে, যার ভিতরে সহজ-বিশ্বাস-পরায়ণতা যত বেশী, সে তত তাড়াতাড়ি ঠক্‌ছে। নির্ব্বিচারে তুমি তোমার বন্ধুর প্রত্যেকটী কথা মেনে নিচ্ছ, আর একদা দেখা গেল, সেই বন্ধুই কাজ-কারবারের গণেশটীকে উল্টে দিয়ে চম্পট দিল, এরূপ ঘটনা অবিরাম ঘটে যাচ্ছে। বন্ধুর জন্য বন্ধু প্রাণ দেয়, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর লোক মাঝে মাঝে দুচারবার দেখেছে। কিন্তু বন্ধুর সর্ব্বনাশ ক'রে বন্ধু নিজের আখের

গুছিয়ে নিচ্ছে, এ দৃষ্টান্ত দেখছে শত শত, সহস্র সহস্র, এ দৃষ্টান্ত দেখছে প্রায় প্রত্যহ। ধর্ম্ম-সূত্রেই বন্ধু হও বা বিবাহ-সূত্রেই বন্ধু হও অথবা ব্যবসায়-সূত্রেই বন্ধু হও, বন্ধুর প্রতি বন্ধু যদি সৎ না থাক্‌তে পারে, তবে এমন বন্ধুত্বে শত ধিক্। অন্যায় পথে ধন অর্জ্জনের জন্য যদি কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করে থাক, তবে জেনে রেখো, তুমি খুব সতর্ক না থাক্‌লে তোমার বন্ধুই তোমাকে সর্ব্বপ্রথমে তরবারির আঘাতটী কর্ব্বে। রাজনীতিওয়ালাদের বন্ধুত্ব অধিকাংশ সময়ে এই রকম। তারা নিত্য নূতন সুযোগের সন্ধানে থাকে, এবং প্রয়োজন মত রং-পরিবর্ত্তন করে। এসব অসৎ লোকেরা দেশের কুলাঙ্গার। সাধারণ মানুষগুলি জয়ধ্বনি দিয়ে দিয়ে এদের বল যোগায় আর এরাই প্রথম সুযোগে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে নিজেদের মত, পথ, দল ও কর্ম্মনীতির ওলট-পালট ঘটায়। এদের কাউকে বিশ্বাস ক'রে ঠকো না।

ভগবানের কাজ

একটী যুবক প্রশ্ন করিল,—আপনারা যত সব সাধু-মহাত্মারা কেবলি উপদেশ দেন, ভগবানের কাজ কর, ভগবানের কাজ কর। কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমরা ভগবানের কিই বা কাজ কর্ব্ব আর কিই বা আমাদের আছে যে তাঁকে দেব?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—প্রশ্নটী যে করলে, তুমি ত' বাবা জান না যে, এতেও ভগবানের কাজই কিছুটা করা হ'ল। তোমার সদ্‌গুণ, অসদ্‌গুণ, সবই ত' ভগবানের দেওয়া। চর্চ্চা ক'রে কোনোটা তুমি কিছু বাড়িয়েছ, কোনোটা তুমি কিছু কমিয়েছ। তোমার সম্পদ বিপদ সবই ত' ভগবানেরই দেওয়া। চেষ্টা দ্বারা কোনোটা কিছু বাড়িয়েছ, কোনোটা কিছু কমিয়েছ। তোমার যা-কিছু সম্বল, তার সবই ভগবান তোমাকে দিয়েছেন,—নিজে যত্ন চেষ্টা ক'রে কখনো তাকে বাড়িয়েছ, নিজের অবহেলার দরুণ কখনো তাকে কমিয়েছ। তোমার এই বাড়ানো কমানোর তরঙ্গায়িত খেলার মাঝেও নিয়ত মনে রাখ যে, ভগবানেরই দেওয়া সুখ, ভগবানেরই দেওয়া দুঃখ, সব-কিছুকে তুমি ভগবৎ-প্রীত্যর্থে প্রয়োগ ক'রে তবে ছাড়বে। ভগবান্ কিসে খুশী হন? ভগবানের সৃষ্ট এই সুন্দরী পৃথিবীকে তুমি যদি শান্তি দিতে পার, তৃপ্তি দিতে পার, গৌরব দিতে পার, মহিমোজ্জ্বল ক'রে তুলতে পার, তা'হলে ভগবানের নিশ্চয়ই খুশী হওয়া উচিত। এটা একটা সাধারণ বুদ্ধির কথা। তোমার যাবতীয় বল, বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা, কর্ম্মশক্তি, একাগ্রতা, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা সব-কিছু তুমি এই উদ্দেশ্যে নিয়োগ কর্ল্লে তিনি নিমেষের মধ্যে তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন যে, আকারে তুমি হিমালয় না হ'লেও প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি ক্ষুদ্র নও। তুমি নিজের শরীরকে পালনের জন্য স্নান কর, আহার কর, ব্যায়াম কর, বিশ্রাম নাও, তাও যে

ভগবানের এই সৃষ্টির মহিমা ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য, এই কথাটুকু মনে রেখে যদি এই সব কর, তাহ'লেই জানবে, এসব কাজ আর ছোট কাজ বা তুচ্ছ কাজ রইল না। এসব কাজ তখন ভগবানের কাজে পরিণত হ'য়ে গেল। ভগবানের কাজের মধ্যে আর ছোট-বড়র বিচার নেই। ভগবানের সব কাজই বড় কাজ, অসাধারণ রূপে মহৎ কাজ। অশ্বমেধ-যজ্ঞ ক'রে যে ফল, একজন যদি একবিন্দু জল ছুঁয়ে ওঁ-ব্রহ্ম শব্দটী উচ্চারণ ক'রে জগদ্বাসীর মঙ্গলার্থে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়, তবে জানবে, তারও সেই ফল বা তার সহস্র গুণ ফল। ভগবানের কাজ কত্তে হবে ব'লেই কাউকে জটাবল্‌কলাদি ধারণ কত্তে হবে না। অথবা অরণ্যবাসে যেতে হবে না, কিম্বা সপ্তাহব্যাপী নিরম্বু উপবাস কত্তে হবে না। সরল সহজ স্বাভাবিক জীবন-যাপন কত্তে কত্তে মনে মনে কেবল এই ধ্যানটুকুকে জীয়িয়ে রাখ্‌তে হবে যে, তোমার দেহ তোমার নয়, ভগবানের, তোমার মন তোমার নয়, ভগবানের, তোমার প্রাণ তোমার নয়, ভগবানের, তোমার আত্মা তোমার নয়, ভগবানের, তোমার সুখ তোমার নয়, ভগবানের, তোমার দুঃখ তোমার নয়, ভগবানের। আর মনে রাখতে হবে, বিশ্বের সমস্ত প্রাণী ভগবানের এবং তুমি নিজেও ভগবানেরই ব'লে সকলে তোমার পরমাত্মীয় আপন-জন। বাইরের কার্য্যক্রম তোমার যখন যাই থাকুক না কেন, অন্তরের নিভৃত প্রদেশে এই ভাবটীকে উজ্জ্বল ভাবে ধ'রে রেখে এই ভাবের

সঙ্গে অবিরোধী ভাবে জীবনের প্রতিটি কৃত্য ক'রে যাওয়ার নাম হচ্ছে ভগবানের কাজ করা।

নাম ভুলিও না

অপর এক যুবকের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিঘ্ন-বিপদে লাঞ্ছিত হ'য়ে চিরবাঞ্ছিতকে ভুলে যেও না। বিপদের সমুদ্র-তরঙ্গ যতই অধিক উত্তুঙ্গ হবে, তোমাকে তোমার আশার শক্তি আর দুঃসাহসের সামর্থ্যকে তত বাড়িয়ে যেতে হবে। বাঁচবার যেখানে সম্ভাবনা কম, সেখানেও তোমাকে তোমার অমৃতত্বের ধ্যান জমিয়ে যেতে হবে। শরীর তার নিজ প্রকৃতি-বশে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়লেও মনকে কদাচ দুর্ব্বল হ'তে দিও না। মনকে লগ্ন কর ভগবানের সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন পরমমঙ্গলময় নামে। পরশমাণিক নামের স্পর্শ পেয়ে মন-লোহা দেখ্‌তে না দেখ্‌তে সোণায় পরিণত হবে। অজ্ঞান জীবকে কে যে সর্ব্বপ্রথম ভগবানের নামটী শেখালেন, আমি জানি না। কিন্তু তিনি সমগ্র মানবকুলের যে অমানব-সেবা ক'রে গেলেন, তার কখনো তুলনা হ'বে না, ওজনও হবে না। সুখি-দুঃখি-নির্ব্বিশেষে নাম সর্ব্বজনের পরম-অভয়দাতা আশ্রয়। আকাশ থেকে বজ্র যদি ভেঙ্গে পড়ে তোমার মাথায়, ঈশ্বরের নামটী ছেড়ো না। পদতল থেকে ধরণী যদি

লুপ্ত হ'য়ে গিয়ে তোমাকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে, তথাপি নাম কদাচ ভুলো না।

সুধন্য পুরুষ ও মহিমান্বিতা নারী

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় টঙ্গিরপাড়ে ভাষণ হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষের ভাগ্য এক বিচিত্র বস্তু। একে মানুষ নিজের আয়ত্তে আন্‌তে পেরেছে ব'লে শোনা যায় না। অধিকাংশ মানুষ অদৃষ্টের উপরে নির্ভর ক'রে স্রোতের জলে গা ভাসিয়ে দেয়। দুই একটী পুরুষ-সিংহকেই মাত্র ভাগ্য বা অদৃষ্টের সঙ্গে যাবজ্জীবন লড়াই কত্তে দেখা যায়। এঁরা সুধন্য পুরুষ, এঁরা মহিমান্বিতা নারী। এঁরা জগতের নমস্য।

পুরুষকারই জাতীয় ভাগ্যের নিয়ন্তা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবু প্রশ্নটা থেকেই যায় যে, মানুষ নিজের পুরুষকারের বলে ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ কত্তে পারে কিনা। কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে এই প্রশ্ন মীমাংসার অতীত হ'লেও জাতির পক্ষে এই প্রশ্নের সদুত্তর ইতিবাচক। একটা জাতি ইচ্ছা করলে তার ভবিষ্যৎকে ফিরাতে পারে, তার ভবিতব্যকে

নিজের প্রয়োজনানুরূপ ক'রে গড়্‌তে পারে। ব্যক্তির জীবনে ভাগ্য যত বড় লটারীই খেলুক না কেন, জাতির জীবনের নিয়ন্তা হচ্ছে এই জাতির সর্ব্বাঙ্গগত পুরুষকার। অদৃষ্ট জাতির ভাগ্য নির্দ্ধারণ কর্ব্বে না, তা' কর্ব্বে তার পুরুষকার। জাতির সামূহিক পুরুষকার তার সামূহিক দুর্গতি-সমূহের প্রতিরোধ কত্তে সমর্থ।

ব্রহ্মচর্য্য এবং পুরুষকার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই বোধটাকে জাতির জীবনে জলন্ত ও জাগ্রত ক'রে তোলার জন্যই চাই ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাপক প্রচার।

মন্ত্রমুগ্ধ সহস্রাধিক জনতার মধ্যে বক্তৃতা পূর্ণ আড়াই ঘণ্টা কাল চলিল।

বাবুপুর (নোয়াখালী)
১৩ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৪২
(৩০শে অক্টোবর, ১৯৩৫)

প্রাতে ছয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি টঙ্গিরপাড় হইতে রওনা হইয়াছেন। কেননা, প্রাতে আট ঘটিকায় বাবুপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত সারদা গুহের বাড়ীতে বক্তৃতা হইবে।

জনসমাগম হইতে হইতে নয়টা বাজিয়া গেল। শ্রীশ্রীবাবামণি দুই ঘণ্টা ভাষণ দিলেন।

ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পবিত্র হব, উন্নত হব, আদর্শ-স্থানীয় হব, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ কর্ব্ব, অলস হ'য়ে পড়ে থাক্‌ব না, কোনও সৎকর্ম্মের কৃতিত্বে কারো চেয়ে খাটো হব না, এই রকমের আকাঙ্ক্ষা যখন একটা জাতির ছোট-বড় প্রত্যেকটী মানুষের মনে জেগে ওঠে, তখন বলা চলে যে, এই জাতি নবজীবনের অভিসারে চলেছে, এই জাতির নবজীবনোন্মেষ ঘটেছে। এইরূপ লক্ষণ ভারতীয় জীবনে বিগত ষাট সত্তর বৎসরের মধ্যে বেশ কয়েকবারই পরিস্ফুট হ'তে দেখা গিয়েছে কিন্তু যমুনার সেই অকাল-প্লাবন স্থায়ী হয় নি। প্লাবন যে এসেছিল বা বারংবার আস্‌ছে, এটা শুভ লক্ষণ কিন্তু এটাকে স্থায়ী করাই হচ্ছে সব চেয়ে বেশী কাঙ্ক্ষিত বস্তু। আমি যে বহ্মচর্য্য প্রচার করি, তার আসল কারণটী এই।

সমাজ-সংরক্ষণে বা সমাজ-বিপ্লবে তোমার কর্ত্তব্য সৎ থাকা

একটী যুবক তাহার নানাবিধ সমস্যার বিষয় বর্ণনা করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ সমাজ থাকলেই সামাজিকতা থাকে। যেখানে সমাজ নেই, সেখানে আবার

কিসের সামাজিকতা? একটা নির্দ্দিষ্ট নৈতিক মান বা সামাজিক প্রথাকে কতকগুলি লোক যখন বিধিবদ্ধ নিয়মের ন্যায় মর্য্যাদা দিয়ে পালন করে, তখন তাদের মধ্যে জন্মলাভ করে সমাজ নামে অদৃশ্য একটী বস্তু, যার ক্ষমতা অপরিসীম। সমাজ আছে ব'লেই মানুষ সহসা উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হ'য়ে যেতে পারে না। সমাজ আছে ব'লেই অতীব আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য পালন থেকে মানুষ বিরত থাকতে পারে না। সমাজের ক্ষমতা আছে পালন করার, পোষণ করার, ক্ষমতা আছে শাসন করারও। কিন্তু সমাজ যখন শোষণ শুরু করে, তখন সমাজ-বিধিকে অমান্য করার জন্য উচ্ছৃঙ্খল অবাধ্যতার সৃষ্টি হয় অবশ্যম্ভাবী। যেখানে একই প্রকারের উৎপীড়নে বহু জনের চিত্ত সমভাবে মথিত হয়, সেখানে সমাজ-বিদ্রোহী একটী শক্তিশালী গোষ্ঠীর হয় অভ্যুদয়, যারা সমাজকে তার আবহমান কালের রূপ থেকে বিচ্যুত ক'রে নূতন রূপ প্রদান কর্ত্তে আগ্রহী হয়। কিন্তু এটাও লক্ষ্য করবার মত ব্যাপার যে, তারাও সমাজকে রাখতেই চায়, সকলের মধ্যে সমতা-বোধের একটা সংস্পর্শ রেখে সকলের সঙ্গে সকলকে যুক্ত কর্ত্তে চায়। এভাবে সমাজ অনাদি কাল থেকে কেবলই নানা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে নবতর রূপ পরিগ্রহ ক'রে আত্মপ্রকটন করার চেষ্টা কচ্ছে। এটাই কিন্তু স্বাভাবিক। সমাজকে তার চিরন্তন রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যেই তুমি সংগ্রাম কর্ব্বে,

নাকি সমাজকে নবতর রূপ প্রদান কর্ব্বার জন্য রণবাহিনী পরিচালন কর্ব্বে,—এটা খুব বড় সমস্যা নয়। তুমি যে-দিকেই থাক, তুমি যেন সৎ হ'য়ে চলতে পার, এইটীই তোমার সব চেয়ে বড় আকিঞ্চন হওয়া উচিত।

সৎ-লোকের গুণ-গরিমা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটা মানুষ যখন সৎ থাক্‌তে আপ্রাণ চেষ্টা করে, তখন নানাবিধ পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং আকস্মিক অঘটন অনেক সময় তাহাকে কক্ষভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। সে যদি সহজেই মাথা নুইয়ে দেয়, তবে ব্যাপার অল্পতেই চুকে যায়। তা' যদি না দেয়, তবে তাকে অনেক অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে যশে, বলে, আত্মপ্রসাদে দেদীপ্যমান হ'তে হয়। তখন তাকে সবাই চিনতে পারে, তখন তাকে অনেক দূর থেকেই হাজার হাজার মানুষ দেখ্‌তে পায়। তখন সে সহস্র সহস্র সম্ভ্রম-পূর্ণ নয়নের সম্মুখে হয় যেন প্রেরণার জীবন্ত উৎস। সে যে সৎ থাক্‌বার চেষ্টা করেছে, তার শুভফল এই ভাবেই সমস্ত জগৎ জুড়ে ছড়ায়। সৎ থাকার ভিতরে ব্যক্তিগত যে গৌরব ও প্রশান্তি আছে, সৎ থাকার ফলে ব্যক্তি-জীবনে যে অফুরন্ত আত্মস্থতা ও আত্মপ্রসাদ মিলে, তার চেয়েও জগদ্‌বাসীর পক্ষে এই দৃষ্টান্তটী অনেক গুণে অধিকতর গরীয়ান্‌। সৎ লোককে মানুষে পূজা করে

এরই জন্যে। একটী সৎলোকের দৃষ্টান্তে দশটী সৎলোকের আবির্ভাব-সম্ভাবনা বেড়ে যায় ব'লেই সৎলোকের এত সমাদর। এজন্যই বলা হয়, সৎলোক দর্শনে পুণ্য, সৎলোক স্পর্শনে পুণ্য, সৎলোকের গুণকীর্ত্তনে পুণ্য, সৎলোকের কীর্ত্তিস্মরণে পুণ্য। সুতরাং সমাজ-সংস্কার, সমাজ-সংরক্ষণ, সমাজ-সংহার বা সমাজকে রূপান্তর দানের পক্ষে বিপক্ষে তুমি যে কাজই যখন কর না কেন, সৎলোকত্ব বজায় রেখে তা' করো। তোমার মূল্য নির্দ্ধারণ আজকের সংবাদপত্র কর্ব্বে না, কর্ব্বে মহাকাল।

ধর্ম্ম না মানিয়াও ধার্ম্মিক হওয়া

একটী মহিলার স্বামী ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না। বলেন, ধর্ম্ম একটা ভণ্ডামি, ধর্ম্মের ধূয়া ধরিয়া চতুর লোকেরা নিজ নিজ ব্যবসায়ের পসার বৃদ্ধিই মাত্র করিতেছেন। মহিলাটী কিছু উপদেশ চাহিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক শ্রেণীর লোক আছেন, যারা ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না, ধর্ম্মকে মনে করেন ভণ্ডামি আর ধর্ম্মের ধূয়া ধ'রে চতুর লোকেরা যে নিজ নিজ পসার বৃদ্ধি ক'রে যাচ্ছেন তা' বুঝতে পেরে তাঁদের প্রতি খুবই বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। এতে আমি দোষও দেখি না, অস্বাভাবিকতাও কিছু পাই না। একথা কিন্তু সত্য, যত

লোককে ভণ্ড ব'লে মনে করা হয়, তারা সবাই ভণ্ড নন, আবার, যাঁদের খাঁটি ধার্ম্মিক ব'লে জ্ঞান করা হয়, মান-সম্মান দেওয়া হয়, পূজা করা হয়, তাঁরা সকলেই ধার্ম্মিক নন। ভণ্ড ব'লে প্রচারিত লোকদের মধ্যেও খাঁটি লোক আছেন, নির্ভেজাল সাধু ব'লে পরিচিত লোকদের মধ্যেও ভণ্ড আছেন। সুতরাং চারিদিকের কাণ্ডকারখানা দেখে শুনে যদি তোমার স্বামী ব'লেই থাকেন "ধর্ম্ম মানি না", তবে তোমার খেদ করার কিছু নেই। কিন্তু তিনি ধর্ম্ম না মানলেও বিপন্নের দুঃখ দেখ্‌লে নিশ্চয়ই অনুকম্পাপরায়ণ হন। তিনি অন্নাভাব-ক্লিষ্টের শীর্ণ দেহ ও বিষণ্ণ মুখ দেখে নিশ্চয়ই অন্তরে বেদনা বোধ করেন। কেউ সৎপথ থেকে বিচলিত হ'য়ে কুপথ আশ্রয় কর্ল্লে, নিশ্চয়ই একটু আফশোষ করেন। একজন সাঁতার না-জানা লোক পুকুরের মাঝখানে হঠাৎ চলে গিয়ে হাবুডুবু খেয়ে মরতে যাচ্ছে দেখ্‌লে নিশ্চয়ই "হায়, হায়" ক'রে চীৎকার করে উঠে পাড়ার দশ জন লোককে বিপন্নের উদ্ধারের জন্য ডাকতে শুরু করেন। কারো ঘরে আগুন লাগ্‌লে নিশ্চয়ই ছুটে যান এক বালতি জল নিয়ে আগুন নেবাবার জন্য। এসব যদি তিনি করেন, তবে লোক-দেখান ধর্ম্মকে তিনি না মান্‌লেও আমি তাঁকে ভক্তি-ভরে প্রণাম ক'রে কৃতার্থ বোধ কর্ব্ব। ধর্ম্ম না মান্‌লেও এঁরা প্রকৃত ধার্ম্মিক।

"পতি পরম দেবতা" কথার তাৎপর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেক স্বামীরা আমাকে ব'লে থাকেন যে, তাঁদের স্ত্রীরা ধর্ম্মের প্রতি মোটেই অনুরাগিণী নন,—এস্থলে কি উপায় অবলম্বনীয়। আমি সোজা কথায় জবাব দেই যে, স্ত্রীরা ধর্ম্মে-কর্ম্মে রতিসম্পন্না হ'লে ত' নিশ্চয়ই খুব আনন্দের কথা কিন্তু যদি ভাগ্যবশে তা' না হয়, তবে দুঃখ করার কারণ কি? হায়-আফশোষ না ক'রে স্ত্রীকে তার অন্যবিধ যাবতীয় কর্ত্তব্য-সম্পাদনে উৎসাহ দেওয়া উচিত। স্ত্রীর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য ত' তার স্বামীর প্রতি। এই জন্যই প্রাচীন কালে মেয়েদের জন্মাবধিই শিক্ষা দেওয়া হত,— "পতি পরম দেবতা।" স্ত্রীলোককে ক্রীতদাসী ক'রে রাখার জন্য এই স্লোগানটীর সৃষ্টি হয় নি, স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কত্তে পার্ল্লে তার সন্তান-সন্ততির প্রতি কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা আপনি আস্‌বে, আর, সন্তান-সন্ততির প্রতি মা যদি নিজের কর্ত্তব্যগুলি পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে ক'রে যেতে পারে, তাহ'লে এই সন্তান-সেবার মধ্য দিয়েই সে সমগ্র সমাজকে এবং সমাজের ভবিষ্যৎকে অসাধারণ সেবা দিয়ে গেল ব'লে মান্‌তে হবে। সুতরাং নৈষ্ঠিক ভাবে তারা কোনো ধর্ম্মাচরণ না কর্ল্লেও এই সকল নারীকে ধার্ম্মিক ব'লেই গণ্য কত্তে হবে।

বালকদের উপেক্ষা করিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু পুত্রকন্যাগুলিকে কোনও প্রকাশ্য ধর্ম্মাচরণে অভ্যস্ত করবে না, এই কথাটী আমি মেনে নিতে অক্ষম। অনেক বাপ-মাকেই বলতে শুনি,—"ছেলেমেয়েরা বড়-সড় হোক্, তারপর তাদের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী দীক্ষা নেবে বা মন্ত্র জপ কর্ব্বে।" এই সব উক্তি অর্ব্বাচীনেই সাজে। তারা বলে,—"ওদের স্বাধীন ইচ্ছায় আমরা হাত দিতে যাব কেন?" আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, তোমার পুত্রকন্যাকে তুমি দুধ-ভাত খেতে শেখাও কেন? তাকে সব্জী-ক্ষেতে ছেড়ে দিলেই ত' পার, সে তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী লঙ্কা পেড়ে খাক্, শসা ছিঁড়ে খাক্ বা ঝিঙ্গা, বাঙ্গী বা তরমুজ তুলে খাক্। বাল্যেই ধর্ম্মাচরণের শিক্ষা না দিলে এরা কালক্রমে এক একজন অসুরে পরিণত হ'তে পারে। তোমার ছেলেটী বি-এ পাশ ক'রে চাক্রী পেয়ে নিজের ইচ্ছায় নিজের পছন্দমত মেয়েটী বেজাত থেকে বেছে নিয়ে আসলে সেই বিবাহে অত আপত্তি কেন? ছেলের বা মেয়ের স্বাধীন ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য তাদের দাবী এক কথায় মেনে নাও না কেন? ঐ জায়গায় তারা স্বাধীনতা পাবে না, আর স্বধীনতা দিতে হবে ধর্ম্মসাধনের বেলা, এ এক তাজ্জব আবদার। আমার কথা হচ্ছে,—

বাল্য বলি' বয়সেরে উপেক্ষা করো না,
বাল্যেই করিতে হবে ব্রহ্মের সাধনা।

মুসলমানের ছেলে বাল্যকাল থেকেই নিরাকার পরমেশ্বরের অর্চ্চনার রাস্তা ধরে, তাই অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সেও নমাজ পড়তে পড়তেই মৃত্যু বরণ করে। ভেবে দেখ, কি সুন্দর এই দৃষ্টান্ত। যাকে যা কত্তে চাও, এই শিশুকালেই কর, শিশুকালেই ধর। সম্ভব যদি হয়, তবে শিশু জন্মাবার তিন পুরুষ আগে থেকে ধর। সম্ভব যদি হয়, তবে শিশু জন্মাবার পরেও নয় পুরুষ ধ'রে অর্থাৎ তিন শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত এই কাজটী ক'রে যাও। শিশুদের কেউ তুচ্ছ ক'র না। ওদের বাদ দিলে দেশ বল, জাতি বল, সমাজ বল, রাষ্ট্র বল, সবই ফক্কিকারে পরিণত হবে।

ভারতের দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের অঞ্চলে দাঙ্গা প্রায় প্রতি বছর লেগেই আছে, বল্‌ছ। এ অবস্থাটা আগে ছিল না। কোনো কোনো সাম্প্রদায়িক নেতা নিজ-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের মনে একটা ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছেন যে, ওদের অশিক্ষা, দরিদ্রতা ও দুরবস্থার জন্য দায়ী ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী লোকগুলি, যারা ইংরেজ-শাসন-প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজি শিখেছিল,

ইংরিজি শিক্ষাকে ধর্ম্মনাশকর ব'লে ফতোয়া দিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের ইংরিজি শিক্ষা থেকে বিরত করেনি এবং যারা এরই ফলে ইংরেজের শাসনাধীন ভারতবর্ষে আপাততঃ খুব বেশী সংখ্যায় পেয়েছে সরকারী চাকুরী। এই একটা ভ্রান্ত ধারণার সঙ্গে আর একটা ভ্রান্ত ধারণা যুক্ত হয়েছে যে, সেই ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাই কৌশল ক'রে যাবতীয় ব্যবসায়ের মূলসূত্রও নিজেদের হাতের মুঠোর মধ্যে ধ'রে রেখেছে। অতএব, যেই সম্প্রদায়ের লোকেরা ষড়যন্ত্র ক'রে সেই সম্প্রদায়ের লোকদের দাবিয়ে রেখে দিয়েছে, যারা মাঠে খাটে সর্ব্বাঙ্গে কাদা মেখে, যারা উৎপাদন করে খাদ্যশস্য, পাট, ফল, ফুল। আর একটা ভ্রান্ত ধারণা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যে, মার-দাঙ্গা ক'রে, লুট-পাট ক'রে, নরহত্যা ক'রে, নারীধর্ষণ ক'রে এদের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া যাবে এবং ধর্ম্মের নাম ক'রে এসব ঘট্‌লে ভগবান্ তাতে রাগ করেন না, বরং খুশী হন। এতগুলি ভ্রান্ত ধারণার উপরে ভর ক'রে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চ'লে থাকে, তা' বাঁধবার জন্য উপযুক্ত কারণের কোনো প্রয়োজন পড়ে না, যে-কোনও একটা উপলক্ষ্য পেলেই মানুষের গৃহদাহ আর রক্তপাত শুরু হ'য়ে যেতে পারে। এর প্রতীকার নিশ্চয়ই সম্ভব কিন্তু তা' সহজ-সাধ্য নয়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—খ্রীষ্টিয় ১৯০৫এ বাংলার কয়েক জন স্বদেশ-প্রাণ পুরুষ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন,—"ইংরাজের চাক্‌রী কর্‌ব না।" তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। যথা,—শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিন চন্দ্র পাল এবং আরও অনেকে। কিন্তু এক সম্প্রদায়ভুক্ত লক্ষ লক্ষ লোকও যদি তখন ইংরাজের চাক্‌রী ছেড়ে দিতেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত লক্ষ লক্ষ লোক যদি সেই চাক্‌রীগুলিতে বহাল হ'য়ে যেতেন, তথাপি ঐ নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকের দারিদ্র্য ঘুচ্‌ত না, অশিক্ষা দূর হ'ত না। কারণ, সরকারী চাকুরেরা সমগ্র জনসংখ্যার কয় শতাংশ? বাকী লোক ত' কোনো প্রকারেই সরকারী চাকুরী পেত না। ভবিষ্যতে ভারত যখন স্বাধীন হবে, তখনও দেখা যাবে যে, সরকার অতি অল্প-সংখ্যক লোককেই চাক্‌রী দিতে সমর্থ হচ্ছেন, বাকী লোকেরা চাক্‌রীর অভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মরছে। সরকারী চাকুরী কদাচ দারিদ্র্যের সমাধান নয়, সরকারী চাকুরী কিছু দরিদ্রের ভরণ-পোষণেরই মাত্র সহায়ক। সরকারী চাকুরী অশিক্ষারও খুব ফলপ্রদ কোনো প্রতিষেধক নয়, তবে কিছু-সংখ্যক লোকের বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে আগ্রহ-বর্দ্ধক প্রেরণা, এটা সত্য কথা। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশেরই ইতিহাসের পাতাগুলি উল্‌টে দেখো,—দেখ্‌তে পাবে, প্রায় প্রতিটি শিক্ষা-

প্রতিষ্ঠান, তা' নিতান্ত একটী পাঠশালাই হোক্ আর বিরাট এক বিশ্ববিদ্যালয়ই হোক্, এক বা একাধিক শিক্ষাপ্রচারব্রতী ব্যক্তিদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত জনসেবার তাগিদে কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূর্ত্তি ধ'রে এসে কাজে লেগেছে ব'লেই এগুলি একটার পর একটা গজিয়ে উঠেছে। সুতরাং যে-কোনো সম্প্রদায়ের লোকের শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ এবং সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য সেই সম্প্রদায় থেকেই ত্যাগী, কর্ম্মী, মহতের আবির্ভাব প্রয়োজন। তিনিই প্রকৃত শিক্ষাব্রতী, যিনি ধর্ম্মের বেড়াকে ডিঙ্গিয়েও সকলকে শিক্ষা লাভের সুযোগ দিতে চেষ্টাবান্। এইরূপ শিক্ষা-ব্রতীদের আধিক্য কোনও সম্প্রদায়ের ভিতরে থাক্‌লে সেই সম্প্রদায়ের ছাত্রেরা স্বভাবতই বিদ্যার্জ্জনে উৎসাহী হবেন এবং তাঁদের এই শুভ চেষ্টা ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরও শিক্ষা-লাভের আগ্রহকে সার্থকতা দিতে পার্ব্বে। আমার সম্প্রদায়ের লোকদের অশিক্ষার জন্য আমি ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের দায়ী কর্ত্তে পারি না। কারণ, আমার সম্প্রদায়েরই ত' অগ্রসর হ'য়ে শিক্ষার ব্যাপকতা বৃদ্ধির জন্য এসে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল। অবশ্য, সময় এখনো অতিক্রান্ত হয়ে যায় নি। করলে এখনো অনেক কাজ করা যায়, আর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসঙ্গে এই কথাই বল্‌তে হয় যে, চাঁদ-সদাগরের কাহিনীই শুধু শোনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালী সুদীর্ঘ কাল ধ'রে ব্যবসায়ে বিমুখ! বাংলার বাণিজ্য-চর্চ্চা অনেক কাল আগে

থেকেই বাঙ্গালীর হাত থেকে সরে গেছে। ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড নিয়ে ভারতে এসে রাজসিংহাসনে বসল, আর বাঙ্গালী বাবুরা রাজানুগ্রহ-পালিত পোষ্যের সৃষ্টিতে লগ্ন হলেন। এর চেয়ে বড় বিড়ম্বনা একটা জাতির পক্ষে আর কিছু হ'তে পারে না। দূরদৃষ্টি থাকলে বাঙ্গালী সেই সময়ে রাজদণ্ডধারীদের হাতের বোঝা কমাবার জন্য তাঁদের হাত থেকে মানদণ্ডটী নিয়ে নিতে পাত্ত। কিন্তু তার চেষ্টা উল্লেখযোগ্য ভাবে তারা করে নি। ফলে, রাজার হাতের বাণিজ্য আপনা আপনি পশ্চিম ভারতে চলে গেল। ১৯০৫ এর স্বপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন কিছু লম্ফ-ঝম্পের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে মিইয়ে গেল। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র বৃথাই চিৎকার কচ্ছেন, বাঙ্গালী জাগো। কিন্তু এদের চাকুরীর নেশা আর যাচ্ছে না, আবার সেই চাকুরীও আর সে পাচ্ছে না। এই অবস্থায় বাঙ্গালী হিন্দুকে ঈর্ষ্যা করার কোনো কারণ বাঙ্গালী মুসলমানদের নেই। তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে কেন? এই বিষয়ে আমার জবাব,—নিজেদের ধর্ম্মকে ভুল ক'রে বুঝাই হয়ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আসল কারণ। ইতিহাসের পটপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা ঘটনায় হয়ত একদা প্রমাণিতও হবে যে, সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা দূর হ'য়ে গেলে একদিন এসব দাঙ্গা চিরতরে দূর হবে, আর সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা যদি অন্য কোনও মধুময় ছদ্মবেশের আবরণেও আত্মগোপন

ক'রে থাকে, তবে তা' একদা দাঙ্গার রূপ ধারণ ক'রে হঠাৎ আত্মপরিচয় দিয়ে ফেল্‌বে। সুতরাং প্রকৃত প্রতীকার হচ্ছে, অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের চর্চ্চা। এই অসাম্প্রদায়িকতার চর্চ্চা দেশের কেবল একটী সম্প্রদায়ের লোকেরাই কর্ব্বেন আর বাকী সকলে উদাসীন থাক্‌বেন,—এ হ'লে চল্‌বে না, ছোট-বড়-নির্ব্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের লোককে অনুশীলন কত্তে হবে, একই ঈশ্বর আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদের নাম, গোত্র, আচার, নিষ্ঠা, নিয়ম, কানুন আলাদা হ'লেও আমরা পরস্পর পরস্পরের ভাই ছাড়া আর কিছু নই।

সুযোগ-সন্ধানী দুর্ব্বৃত্তেরা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিছু লোক আছে, যারা ধর্ম্মাধর্ম্মের ধারও ধারে না, কিন্তু যে সময়ে লুঠের সুযোগ মিলে, তখন লুণ্ঠন-কাজে যেতে চায়। যখন নারীধর্ষণের সুযোগ মিলে, তখন নির্ল্লজ্জ হ'য়ে পশুর অধম কাজগুলি সব করে। কিছু লোক আছে, ধর্ম্মাধর্ম্মের বাছ-বিচারের ধার-কাছ দিয়েও যারা চল্‌বে না কিন্তু পয়সা পেলে যে কোনো নৃশংস কার্য্য তারা সমাধা ক'রে দিয়ে এসে বুক ঠুকে ব'লে বেড়াবে, জানিস আমি কে? আবার কিছু লোক এমনও আছে, যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থ দ্বারা এমন সব সমাজ-বিরোধী দুর্বৃত্তদের পোষণ করে এবং দুর্বৃত্তেরা যখন

মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখনও তাদের শাসন না ক'রে সর্ব্বপ্রকারে প্রতিপালন করে, তাদের পৃষ্ঠপোষণ করে। এই দুই শ্রেণীর লোক দেশ ও সমাজের সব চেয়ে বড় শত্রু। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা পরস্পর পরস্পরকে ধর্ম্মের মধ্যে উজ্জ্বল দিকটায়, সুন্দর দিকটায়, গ্রহণযোগ্য দিকটায়, মননযোগ্য দিকটায় শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিপাত কত্তে কত্তে একদা হয়ত ধর্ম্মান্ধতার নিষ্ঠুর কবল থেকে মুক্তি পাবে, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাজনীতি-পন্থীদের উগ্র ক্ষমতালিপ্সা চিরকাল ঐ সব দুর্ব্বৃত্তদের বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা কর্ব্বে, যারা সব কুকাজ কত্তে সমর্থ শুধু সুযোগ পেলে। সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে পৃথিবী একদা রক্ষা পাবে কিন্তু এদের হাত থেকে পৃথিবীর সভ্যতাকে রক্ষা কত্তে হ'লে বিধাতার নূতন ক'রে নব-মানবজাতি সৃষ্টি কত্তে হবে।

আদর্শ ও পিতামাতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পিতামাতার মধ্যে জীবনের আদর্শকে খুঁজে না পাওয়া সন্তানের পক্ষে এক পরম দুর্ভাগ্য। পিতামাতারই ত' সদ্‌গুণাবলি সন্তানের ভিতর দিয়ে ক্রমবিকশিত হ'তে হ'তে বংশানুক্রমে একটা নূতন জগৎ, নূতন সভ্যতা, নূতন মানব-সমাজ গ'ড়ে তুলবে। স্বাভাবিক ভাবে বিকাশমান সেই ক্রমোন্নতির সম্ভাবনাটী বিরাট এক ধাক্কা খায়,—সন্তানের চখে যদি পিতামাতা আদর্শ মানুষ না

থাক্‌তে পারে। এর অন্য কুফল হচ্ছে এই যে, আদর্শের সন্ধানে সন্তানকে অন্যত্র দৃষ্টি সঞ্চালন কত্তে হবে, অন্যত্র ছুটে যেতে হবে এবং বংশের স্বাভাবিক ঝোঁক অনুযায়ী পথে না গিয়ে পুত্রের ক্রমবিকাশ ও অনুশীলন হয়ত অন্য এক পথে যাবে, স্বাভাবিক আনুকূল্যগুলি না পাওয়ার দরুণ যাতে তার অগ্রগমন হয়ত অধিকাংশ স্থলেই শ্লথবেগ হবে। কিন্তু এরূপ সঙ্কটেও যদি পড়, তবু সাধ্যমত চেষ্টা ক'রো পিতামাতার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশগুলিকে নিজের জীবনের ক্রমোন্নতির পক্ষে সহায়ক রূপে গ্রহণ কত্তে। পিতামাতার প্রতি অকৃতজ্ঞ কদাচ যেন না হও। জগতের শ্রেষ্ঠতম আদর্শই তোমার অনুসরণীয় হোক্, কিন্তু মাতাপিতার প্রতি কদাচ বেইমানি ক'রো না।

পিতৃমাতৃ সেবা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পিতা ও মাতা দুইটী জন্তু নন, যাঁরা তাঁদের জান্তব দৈহিক মিলনের দ্বারা তোমাকে জন্মই দিলেন, পরন্তু তাঁরা অনন্ত অতীতের অনুশীলনের ফলে জীব-প্রবাহের সৃষ্টি-ধারার মধ্যে নিত্য যে নূতন বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতর দক্ষতার সৃষ্টি হয়েছে, তাকে প্রবাহিত ক'রে দিলেন তোমার মস্তিষ্কে, মেরুমজ্জায়, শোণিত-কণাগুলির মধ্যে, তোমার মধ্যে ভবিষ্যতের অবারিত সম্ভাবনার দ্বার

দিলেন মুক্ত ক'রে। অতীতের সমস্ত জ্ঞানকে তোমার পক্ষে সুলভ্য ক'রে দিয়ে আরও দিলেন ভবিষ্যতের অকল্পনীয় বিকাশের সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি। এজন্যই পিতৃ-মাতৃ-সেবার তুল্য পুণ্যজনক কাজ জগতে ভারতীয় আর্য্যের দৃষ্টিতে আর কিছু নেই। এজন্যই উপবীত গ্রহণকারী ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত করার কালে আচার্য্যের প্রথম উপদেশ—পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব। এই উপদেশ যতকাল আমরা পালন কর্ব্ব, ততদিনই আমাদের পক্ষে এই পরিচয় দেওয়া সার্থক হবে যে, আমরা প্রাচীন ঋষিদেরই বংশধর। কোনো বংশধর ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে ব'লেই সে অনার্য্য হ'য়ে যায় নি। তাকেও এই উপদেশটী পালন কত্তে হবে।

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবামণি টঙ্গিরপাড় ফিরিয়া আসিলেন। কেননা আগামীকল্য নোয়াখালী শহরে যাইতে হইবে।

নোয়াখালী

১৪ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২

(৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৫)

রেলগাড়ী হইতে নামিতেই শ্রীশ্রীবাবামণি সবিস্ময়ে দেখিলেন, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমদানন্দ কুণ্ডু মহাশয় ষ্টেশানে আসিয়াছেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে।

প্রমদাবাবু দেখিলেন, শ্রীশ্রীবাবামণি কথা কহিতেছেন না। তিনি বলিলেন,—না বাবামণি, আজ আপনার মৌনী থাকা

চল্‌বে না। আজই রাত্রে আপনি ষ্টীমারে ক'রে সন্দ্বীপ পাড়ি দেবেন। কত লোক কত কথা বলার জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষা কচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হস্তোত্তোলন করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন,—অপেক্ষা কর, প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে।

প্রমদা বাবু ভূলুয়া রাজ এষ্টেটের রিসিভার হইয়া এখানে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণিকে রাজ-কাছারিতেই তুলিলেন। মহাযত্নে যোগ্য সমাদরে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিলেন। স্নান, বস্ত্র-পরিবর্ত্তন, উপাসনা প্রভৃতি সারিয়া তিনটী তুড়ি দিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনভঙ্গ করিলেন।

আমি অলৌকিক নহি

কত দর্শনার্থী যে কত কথা কহিলেন এবং শুনিলেন, ইয়ত্তা নাই। দুই একজনে শ্রীশ্রীবাবামণির অনেক অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলিয়াও আরোপ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না, না, আমার ভিতরে অলৌকিক কিছুই নেই, আমি আর দশজনের মতন একটী সাধারণ মানুষ। নানা রকম গল্প-গাছা শুনে কেউ আমাকে অলৌকিক-শক্তিধর অমানব-মানব ব'লে জ্ঞান ক'রো না। তোমাদের সকলকে আমি যে দৃষ্টিতে দেখি, তোমরাও আমাকে মাত্র সেই দৃষ্টিতেই দেখো। ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে বিরাজমান। এই হিসাবে

তোমরাও আমাকে মাত্র সেই দৃষ্টিতেই দে'খো। ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে বিরাজমান। এই হিসাবে তোমরাও কি অলৌকিক নও? তোমরা যখন অলৌকিক, আমি একমাত্র তখনই অলৌকিক হ'তে পারি, অন্যথা নয়।

কেন নিজের পূজা চাহি না

একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবামণি, আপনাকে আমি বিগত দশ বারো বৎসর যাবৎ নানা স্থানে লক্ষ্য ক'রে আসছি। আপনি যখন যেখানে যান, সেখানে কি কি যে বলেন বা কি কি করেন, তার খোঁজ আমি যতটা সাধ্য নিয়ে থাকি। তার ফলে আপনার সম্পর্কে আমার কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ধারণাটী এই যে, আপনি কোনও অবস্থাতেই কারো পূজা চান না। কিন্তু অপরাপর গুরুদেবদেরও আমি বেশ কিছুকাল ধ'রে অনুসরণ ক'রে আসছি। তাঁদের সকলের মধ্যেই নানা ব্যাপারে পার্থক্য থাক্‌লেও একটী ব্যাপারে এক অসাধারণ ঐক্য দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, তাঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে গুরুপূজার সমর্থন করেন এবং গুরুমূর্ত্তিপূজায় উৎসাহ দেন। তাঁরাই বা কেন দেন, আপনিই বা কেন দেন না, একথাটীই আমার জিজ্ঞাস্য।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি যে আমার মূর্ত্তি পূজা কর্ব্বার প্রেরণা আমার শিষ্যদের দেই না, তার প্রধান কারণ

এই যে, ঐ পূজাতে আমার কোনো লাভ নেই। লোকসান আছে কিনা, সেই কথাটী কখনো ভেবে দেখি নি। সমবেত উপাসনায় আমার প্রতিচিত্রের পূজার অবকাশ নেই, কারণ, ঐ উপাসনাতে আমি সকল উপাসক-উপাসিকাদের সঙ্গে চিরকালের জন্য একজন সমসাধক। সমবেত উপাসনাতে যাতে সব গুরুর শিষ্যদের একত্রে বসবার সুযোগ ঘট্‌লে যেন তাদের একত্র মিলনের বাধা না থাকে, শুধু এই জন্যও সমবেত উপাসনার পূজার বেদীতে আমার বা অন্য যে-কোনও মহাপুরুষের বা অবতারের বা ঈশ্বর-কল্প ব্যক্তির মূর্ত্তি আদি রাখা নিষিদ্ধ। যাদের ইচ্ছা হয় গুরুকে পূজা করার, তারা নিজ নিজ ঘরে ব'সে তা' করে ত' করুক। কিন্তু বিশ্বের সমস্ত গুরুর শিষ্যদিগকে যেখানে একত্র বসানোর হচ্ছে প্রয়োজন-বোধ, সেখানে গুরুপূজার সমর্থন দেই কি ক'রে? দিলে ত' গুরুতে গুরুতে লাঠালাঠি লেগে যাবে। মানুষের সাম্প্রদায়িক ভাবের উগ্রতা ত' কম নয়। আমার পূজা আমি চাই না, বিশ্বের সকলের একত্র মিলে বিশ্বেশ্বরের পূজাটুকুই আমার কাম্য।

গুরুপূজায় লাভ

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—গুরুপূজায় কি শিষ্যের কোনও লাভই হয় না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হয়। গুরুপূজায় শিষ্যের লাভ নিশ্চয়ই হয়। গুরুর কোনো লাভ নেই। গুরুকে পূজা কত্তে কত্তে গুরুর চরিত্রের মহত্ত্বগুলি শিষ্যের মধ্যে প্রকটিত হয়। গুরুধ্যান কত্তে কত্তে গুরুপ্রদত্ত কাজগুলির প্রতি শিষ্যের গভীর কর্ত্তব্যবোধ ও মমত্ব-বুদ্ধি জাগ্রত হয়। নিয়ত গুরু-স্মরণের দ্বারা শিষ্য গুরুর প্রদত্ত আদর্শের ইঙ্গিতগুলি অতি সহজে ধরতে পারে, যার ফলে তার মত-পরিবর্ত্তন ও পথ-বিচ্যুতির সম্ভাবনাগুলি ক'মে যায়। যে যাকে ধ্যান করে, তার ভালবাসা তার প্রতি ধবিত হয়। একজনকে ধ্যান কত্তে কত্তে তার মানুষী সত্তার মর্ম্মদেশে সঙ্গোপনে নিহিত যে অপরূপ অধ্যাত্ম-সত্তা আছে, সেইটী শিষ্যের অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা প'ড়ে যায়। তাতে দুর্ব্বল শিষ্য বিশ্বাসের শক্তিতে সবল হয়, অজ্ঞান শিষ্য বশিষ্ঠ তুল্য জ্ঞানী হয়, কুরূপ শিষ্য ইন্দ্রতুল্য রূপৈশ্বর্য্যশালী হয়। বলতে পার, তবে কেন শিষ্যদিগকে আমার প্রতিচিত্রের পূজা কত্তে উপদেশ দেই না। দেই না এই জন্য যে, কারো যদি ঐ কাজটীতে সত্য সত্য কোনো প্রয়োজন থাকে, সে তা' আপনিই ত' কর্ব্বে। হজরৎ মহম্মদ তাঁর নিজ প্রতিচিত্রকে কদাচ পূজিত হ'তে দেন নি, কিন্তু শিষ্য-প্রশিষ্যমণ্ডলী একান্তই অনুগত ব'লে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত না দেখেও ত' তাঁকেই অবিরাম স্মরণ ক'রে জীবনের পথ চলছেন। আজ যদি কেউ তাঁর পবিত্র অঙ্গের উৎক্ষিপ্ত এক গুচ্ছ কেশ কোথাও প্রদর্শন কত্তে পারে, তাহ'লে কোটি

কোটি লোক কি এক কথায় সেখানে কুর্ণিশ কর্ব্বে না? ফটোপূজা না ক'রেও গুরুর প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য যে কি ক'রে আস্‌তে পারে, আর সে আনুগত্য যে কত গভীর হ'তে পারে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ মুসলমানদের অন্তরে মদিনায় খুঁজে দেখ। নূতন কিছু শিখে ধন্য হবে।

প্রতিষ্ঠাবান্ পুরুষের ছত্রচ্ছায়াতলে যাওয়ার বিপদ

অপর এক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষ যখন নিজের যশ, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার বলে অন্য লোকের উপকার না ক'রে অপকার-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে, তখন জান্‌তে হবে যে, মানুষটী আসলে মানুষ নয়, মনুষ্যবেশী একটী হিংস্র জন্তু। এমন মানুষদের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে সুকৌশলে দূরে রাখাই সৎ লোকের পক্ষে কর্ত্তব্য। অপরকে খর্ব্ব করার ভিতরে নিজের প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে দেখ্‌লে এই শ্রেণীর মানুষগুলি যেন খ্যাপা কুকুরে পরিণত হয়। তখন তাদের ভক্তিভাব, ভালবাসা, প্রীতি, স্নেহ, প্রণয় সব-কিছু এক নিদারুণ ভাণে পরিণত হয়। তখন তারা কেবল আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেই কপট ব্যবহার চালায় না, তখন নিতান্ত আত্মীয় এবং নিকট বন্ধুদের কাছে পর্য্যন্ত কপটতার বেসাতি খুলে ধরে। এই সকল প্রতিপত্তিশালী

লোকেরা শেষ পর্য্যন্ত নিজ নিজ পুত্র, কন্যা, পত্নী, জামাতা বা শ্যালক আদির কাছে কেবল ভাণ আর কেবল অভিনয় ক'রে চলে। অন্তরে নিজেরা শান্তি পায় না এক কণাও কিন্তু অন্যান্যদের শান্তিকে এমন ভাবে বিপর্য্যস্ত করে যে, তাদের অন্তরের হাহাকার শেষে গিয়ে পরমেশ্বরের দরবারে হাজির হয়। তোমরা ছল-স্বভাবী প্রতিষ্ঠাবান্ এই সব লোকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থেকো। তাহ'লেই যে সামান্য সৎকর্ম্মটুকু তোমাদের মত ছোট ও অখ্যাত জনসেবকদের পক্ষে সম্ভব, তা' অনায়াসে এবং নির্ব্বিবাদে সুসম্পন্ন হ'তে পার্ব্বে। প্রসিদ্ধ পুরুষদের প্রতিষ্ঠার ছায়া-তলে গিয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান পড়ে, তাদের ভাগ্যে যে বিড়ম্বনাগুলি স্বাভাবিক, তোমাদের ক্ষেত্রে মাত্র তাই ঘটেছে। এরূপ প্রায় সর্ব্বত্রই ঘটে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

স্বপ্ন-ভঙ্গে

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিশ বছর আগে যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলে, যে স্বপ্ন দেখছ নিদ্রায়, দেখছ জাগরণে, যে স্বপ্নের আবেশ তোমাকে পূর্ণ বিংশতি বর্ষকাল পরিচালিত ক'রে এসেছে জীবনের প্রতিটি কর্ম্মে, প্রতিটি অধ্যবসায়ে, আজ হঠাৎ যখন দেখ্‌লে, বুঝলে, জানলে যে, ওটা স্বপ্নমাত্র, সত্য নয়, ওটা

ছায়া মাত্র, কায়া নয়, ওটা একেবারেই মিথ্যা এক জঞ্জাল, সত্যের স্বর্ণমুকুট নয়, তখন যে হঠাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'য়ে পড়তে পার, এটা আশ্চর্য্য ব্যাপার কিছুই নয় কিন্তু জেনো, যিনি আজ তোমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছেন, স্বপ্নও একদা তিনিই দেখিয়েছিলেন। এর মধ্যে নিজের কর্ত্তৃত্বকে খুঁজতে যেও না। এর মধ্যে তাঁর কর্ত্তৃত্বের অলঙ্ঘনীয় শক্তিকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা কর। বুঝতে চেষ্টা কর যে, তাঁরই ইচ্ছায় সব-কিছু হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। তোমাকে তাঁর ইচ্ছার অনুগত হ'য়ে চল্‌বার যোগ্যতা অর্জ্জন কত্তে হবে, 'হায় স্বপ্ন', ব'লে কাঁদলে চলবে না। জগতে প্রায় সকলেই কিছু না কিছু স্বপ্ন দেখে। কারো স্বপ্ন এক রাতের, কারো স্বপ্ন দশ, বিশ, পঁচিশ বছরের, কারো স্বপ্ন সারা জন্মের, কারো স্বপ্ন বা কোটি কোটি জন্মের। এ স্বপ্ন একদিন প্রত্যেকেরই ভাঙ্গবে এবং স্বপ্নভঙ্গে প্রত্যেকে পরমেশ্বরকে নিজের অন্তরের অন্তরাত্মা রূপে পেয়ে কৃতার্থ হবে।

সমগ্র জগৎ তোমার আপন জনে পূর্ণ

প্রশ্নকর্ত্তা একটা ভাল চাকুরী পাইয়া একটা দূরবর্ত্তী নূতন স্থানে যাইতেছে। সে কতকগুলি ব্যক্তিগত বিষয়ের বিবরণ দিয়া উপদেশ প্রার্থী হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি

ত' আবাল্য ঘুরেও বেড়াচ্ছি, সদ্ভাবের প্রচারও সাধ্যমত ক'রে এসেছি। সুযোগ পেলেই মানুষকে দু-চারটি সৎকথা শুনিয়েছি। যে কথা লোককে শুনিয়েছি, সেই কথার সার সত্যকে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে যতটুকু পারি, চেষ্টাও করেছি। এর ফলে আপনা আপনি নানা স্থানে এমন অনেক লোকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, যারা মনে মনে নিজেদিগকে আমার শিষ্য ব'লে জ্ঞান ক'রে থাকে। এরা সকলেই চিরকাল এক জায়গার বাসিন্দা নাও থাক্‌তে পারে। অনেকেই হয়ত অনেক দূরদেশে অপ্রত্যাশিত এক এলাকায় গিয়ে জীবিকার্জ্জনের প্রয়োজনে ছড়িয়ে পড়বে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে কথাটী আমি কোনও ঝোপে, ঝাড়ে, জঙ্গলে, শূন্য মাঠে বা প্রকাশ্য সভায় বলেছিলাম, হয়ত তার এককণা রেশ তখনো তাদের কাণে বেজে চলবে। সুতরাং যেখানেই গিয়ে পড়, একবার খুঁজে দেখো, আমার বাণীর সঙ্গে পরিচিত, আমার আদর্শের প্রতি অনুরক্ত কাউকে খুঁজে পাও কিনা। না যদি পাও, তবে নিজে চেষ্টা কর, নূতন মানুষদের মধ্যে আমার ভাব, আদর্শ-বাণী ও বক্তব্য ছড়িয়ে দিতে। এভাবে তুমি এক প্রীতিপ্রদ পরিবেশ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিমণ্ডল সৃষ্টি ক'রে নিতে সমর্থ হবে। তার ফলে সর্ব্ববিষয়ে তোমার সকল কর্ম্ম বাধামুক্ত এবং সাফল্যসম্ভাবনাযুক্ত হ'তে থাক্‌বে। যেখানেই গিয়ে ওঠ, নিজের অন্তরের আসল আদর্শের

অনুকূল মনোভাব-সম্পন্ন মানুষদের তোমার খুঁজে নিতেই হবে। সমগ্র জগৎ তোমার আপনজনদের দ্বারা পূর্ণ। কেবল প্রয়োজন খুঁজে বের ক'রে নেওয়ার।

আপন খোঁজার পথে সতর্কতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আপন খোঁজার জন্যই ত' ব্রহ্মাণ্ড-পর্য্যটন। কিন্তু কাউকে অন্তরের কাছাকাছি পেয়েছ ব'লে, দেখো, ভ্রমেও যেন কোনও সন্নীতির, সদাচারের অপহ্নব না ঘটান হয়। যার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হ'ল, তার ধন-সম্পদ প্রভৃতির উপরে যেন ভ্রমেও তোমার লুব্ধ দৃষ্টি না পড়ে। তার ঘরে সধবা, বিধবা, কুমারী নারীদের একজনকেও নিয়ে যেন তোমার মনে কণামাত্র অসঙ্গত ভাবের তরঙ্গ না উত্থিত হ'তে পারে।

পরমেশ্বর ধন্য

একজন নিজের নানা প্রকারের দুঃখভোগের কাহিনী বলিয়া শেষে ইহাও উল্লেখ করিলেন যে, তিনি বৎসরাধিক কাল রোগশয্যায় শুইয়া ছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তবে ত' বলতেই হবে যে, তুমি নিরাশ্রয় ও অসহায় অবস্থায় এই দীর্ঘ সময়টা বারংবার ভগবানের নাম করেছ। আর, তাই যদি ক'রে থাক,

তাহ'লে রোগশয্যা তোমার পক্ষে তীর্থবাসের ফল দিয়েছে। লোকে দান করে, তীর্থ করে, শুধু ভগবানের প্রতি অন্তরের ভক্তিকে জাগাবার জন্য আর তাকে চিরস্থায়ী কর্ব্বার জন্য। রোগ-ভোগ তখন পরম সার্থক, যখন তার ফলে ভগবানের নামে রুচি আসে। বৈষয়িক চিন্তা মানুষ সহজে ছাড়তে পারে না কিন্তু দারুণ রোগক্লেশ বৈষয়িক চিন্তা ভুলিয়ে দেয় এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বর-ফীশ্বরে বিশ্বাস করে না ব'লে বড় গলায় প্রচার করে, সেও বারংবার ঈশ্বর-স্মরণ করে। "হে ঈশ্বর, যদি ঈশ্বর ব'লে কেউ কোথাও থেকে থাক, তুমি আমাকে এই পরম সঙ্কট থেকে রক্ষা কর, অবশ্য যদি তোমার সে ক্ষমতা থেকে থাকে",—এইরূপ ব'লেও তাকে ঈশ্বরের নামটী স্মরণ, মনন ও উচ্চারণ কত্তে হয়। মুখে তাকে বলতে হয়,—ঈশ্বরের নাম আমার কাছে ক'রো না, আমি ওসব মানি না, কিন্তু মনে মনে সে কেবলি ভাব্‌তে থাকে, "হে অদৃশ্য সর্ব্বনিয়ন্তা, দেখা দিয়ে তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ কর আর নাই কর, আমার এই দারুণ দুঃখক্লেশ দূর কর।" প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, সাদরে বা অবহেলায়, জেনে, শুনে, বুঝে বা না জেনে, না শুনে, না বুঝে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পরমেশ্বরের কথা বল্লে বা ভাবলে মনে শান্তি আসে। এই জন্যই পরমেশ্বর আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। তিনি বৈজ্ঞানিকের টেষ্ট-টিউবে ধরা নাও পড়্‌তে পারেন,

কিন্তু বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী প্রত্যেকের হৃদয়-মধ্যে তিনি নিজের স্থান নিজেই ক'রে নেন। এই জন্যই বলি, পরমেশ্বর ধন্য। আর ধন্য তাঁর ভক্তেরা।

দলাদলি ও সাধনশীলতা

একজন প্রশ্ন করিলেন,—কাজ কত্তে গেলে সঙ্ঘবদ্ধতা চাই কিন্তু কার্য্যারম্ভের দুচার মাস পর থেকেই শুরু হয় দলাদলির। এর একটা প্রতীকার বলুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আসল কথাটা বোঝ্‌বার চেষ্টা কর আগে। ওঙ্কার-বিগ্রহ তোমাদের সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত পূজার বিগ্রহ, ওঙ্কার-মন্ত্র তোমাদের সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত মহামন্ত্র। কিন্তু মন্ত্রই নিলে, সাধন ত' কৈ কেউ কিছু কচ্ছ না। যে অল্প একটু সময় সাধনে কেউ কেউ বস, তা' শুধু লোক দেখান ব্যাপার বা নিয়ম রক্ষার বেশী ব'লে মনে করার হেতু নেই। ওঙ্কার-সাধনের ফল নিবিড় ঐক্য, গভীর প্রীতি, অতল আত্মীয়তা। তোমরা কেউ সাধনই ত' কর না, সাধনের ফলটুকু কি ক'রে পাবে? সাধন কর না ব'লেই ত' তোমাদের এত দলাদলি। বুদ্ধি তোমাদের অনেকের কুশাগ্রসম তীক্ষ্ণ। তোমরা বুদ্ধিবলে মানুষের মধ্যে প্রাধান্য চাও। সাধনের বলকে তোমরা গণনায় আন না ব'লেই সাধন ক'রে সাধন-বলশালী হবার চেষ্টাও কর না। সাধন-বলে বলীয়ান্ পুরুষ

বা নারী হাজার লোককে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারে, একজনকেও স্খলিতপদ বা ব্রতভ্রষ্ট হ'তে দেয় না। সাধনের বল যার নেই, সে বুদ্ধির বলে সবাইকে পদানত করার চেষ্টা করে। বুদ্ধি অহঙ্কারের উত্তেজক। অহংকার প্রভুত্ব-প্রয়াসকে ডেকে আনে সকলের অজ্ঞাতসারে এবং সহসা। সাধনে বলবান্ ব্যক্তি বুদ্ধির পরামর্শকে সকল সময়েই যে গ্রাহ্য ক'রে চল্‌বে, তা' নয়। সাধন-বল তার অন্তরের ভিতরে Intution বা প্রত্যাদেশকে জাগ্রত করে, যার ফলে পথ খুঁজে বের কত্তে তাকে অন্ধকারে হাতড়াতে হয় না। বৈষয়িক জগতের সাধারণ মানুষের পক্ষে বুদ্ধি এক পরম সহায়। কিন্তু সাধনশীল মানুষের প্রজ্ঞাই তাঁদের পথ দেখায়। এই জন্যই ক্ষমতা অধিকার করার দিকে তাদের লক্ষ্য একেবারেই থাকে না। তাই তাদের দ্বারা দলাদলির সৃষ্টিও হয় না। যদি দলাদলি আপদ দূর কত্তে চাও, তবে প্রত্যেকে সাধনশীল হও।

পতিগৃহে না পিত্রালয়ে

একজন প্রশ্ন করিলেন,—বিয়ের পর স্বামীর ঘর না ক'রে স্ত্রীর পক্ষে পিতৃগৃহে বা অন্যত্র বাস করা সঙ্গত কিনা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামী যদি অভিলাষ করেন যে, তাঁর স্ত্রী বিবাহের পরে স্বামীর গৃহে থাকবেন না,

থাকবেন পিতৃগৃহে বা অন্যত্র, তবে স্ত্রীর পক্ষে বাধ্য হ'য়েই তা' মানতে হবে। স্বামীর অনিচ্ছায় স্ত্রী কি ক'রে জোর ক'রে স্বামিগৃহে থাকে? কিন্তু স্বামী যদি ইচ্ছা করেন যে, স্ত্রী তাঁর কাছেই থাকবেন, বাপের বাড়ী বা অন্য কোনও আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে গলগ্রহ হবেন না, তবে সেই স্থলে স্ত্রীর পক্ষে জোর ক'রে স্বামিগৃহ ছেড়ে আসা অন্যায় হবে। কিন্তু স্বামী যদি হয় দুশ্চরিত্র, মদ্যপ, জুয়াড়ী, বিশ্বাসঘাতক বা স্ত্রীর সতীত্ব-ব্রতের বিনাশে সহায়ক, তাহ'লে এমন স্বামীর গৃহ থেকে স'রে আসাই স্ত্রীর উচিত। কিন্তু এসব দুর্ভাগিনীদের অনেকের পিতৃগৃহে স্বচ্ছলতা থাকে না,—তারা নিরুপায়। স্ত্রীকে পণ রেখে যুধিষ্ঠির জুয়া খেলেছিলেন, হেরেও গিয়েছিলেন, তবু তাৎকালিক জন-সমাজ যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার দিতে সাহস পায় নি। কিন্তু এই যুগে কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে পণ্য ক'রে জুয়ার দান ফেলে, তবে সেই স্বামীর সংস্পর্শ তন্মুহূর্ত্তে পরিত্যাগের পাতি প্রায় প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তি দেবেন। 'পতি পরম দেবতা',—এটাই এদেশের শিক্ষা। এই শিক্ষা অধিকাংশ নারী এখনো ভোলে নি কিন্তু স্বামী স্বেচ্ছাচারী হ'লে তাকে দৈত্য জ্ঞানে পরিহারের অধিকার সমাজ খুব শীঘ্রই দেবে। পরিস্থিতি-ভেদে স্ত্রী কখনো জোর ক'রে স্বামিগৃহে থাকার অধিকারিণী, আবার কখনো বা স্বামিগৃহ ত্যাগ ক'রে নিরাপদ অন্য আশ্রয়ে থাকারও অধিকারিণী।

সুপ্রথা ও কুপ্রথা

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রথাকে সব সময়েই তুমি খারাপ বল্‌ছ? তোমার বলাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। বল ত', প্রথার সৃষ্টি কি ক'রে হয়? একটা কোনো কাজ একটা কোনো নিদৃষ্ট মাসের নির্দ্দিষ্ট তারিখে ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর ধ'রে ক'রে যেতে থাক্‌লে, ঐ কাজটা একটা প্রথায় পরিণত হয়। যেমন, নির্দ্দিষ্ট একটা আরবী মাসের নির্দ্দিষ্ট একটা দিনে আকাশের চাঁদ দেখা গেলে সেদিন ঈদ্-মহোৎসব হয়। যেমন, নির্দ্দিষ্ট একটা ভারতীয় মাসের নির্দ্দিষ্ট একটা তিথিতে বিজয়া দশমী হয়। ঐ দিনটাতে সবাই নিজ নিজ পূর্ব্ব-শত্রুতা ভুলে গিয়ে একে অন্যকে একই আল্লার সন্তান বা একই জগজ্জননীর পুত্র জেনে প্রেমভরে আলিঙ্গন করে। বিচার ক'রে বল দেখি, এই প্রথা দুটি ভাল, না মন্দ? স্বীকার তোমাকে কত্তেই হবে যে, এই প্রথাদ্বয় নিশ্চয়ই ভালো, মন্দ এতে কিছুই নেই। কিন্তু বিজয়া দশমী করবে ব'লে তুমি যদি ভাং গুলে খাও, তবে সেটা হবে মন্দ। এখানে প্রথার খারাপ দিক্‌টা লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু আলিঙ্গনের প্রথা সকলের মধ্যে বিস্তৃত হ'লেও ভাং খাওয়ার প্রথা নিতান্ত সীমাবদ্ধ কিছু লোকের মধ্যেই আবদ্ধ। এই প্রথাটা খারাপ ব'লেই স্বল্প লোকের

মধ্যে আবদ্ধ। এমন প্রথা যে খারাপ, তা' সকলে অতি সহজে বুঝতে পারে ব'লেই এর বিস্তার নেই। কখনো কখনো কোনো কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি নিজের ঐশ্বর্য্যের চমকে বা বাহুবলের জমকে কিম্বা প্রতিভার দাপটে কুপ্রথাকে সমাজ-মধ্যে ব্যক্তিগত স্বকীয়তার মহিমায় প্রচলিত করেন বটে, কিন্তু মুখ ফুটে তার প্রতিবাদ করার সাহস কারো না থাকলেও মনে মনে প্রত্যেকে অনুভব করেন যে, কাজটা অতীব কুৎসিত হচ্ছে অতীব নোংরা জিনিষকে ভদ্রবেশে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। কুপ্রথার এইখানেই প্রথম পরাজয়।

অসুন্দর অতীতকে বর্ত্তমানে প্রসারিত হইতে দিও না

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিকট অতীত আর সুদূর অতীত, সব অতীতকেই অতীতের মর্য্যাদা দাও। তা' যখন অপ্রিয় এবং অসুন্দর, তখন তাকে স্মৃতিপথে টেনে এনে বারংবার বর্ত্তমানের মর্য্যাদা দিও না। স্বপ্নে মানুষ পাপ করতে পারে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তার অবচেতন মনে দুর্ব্বলতা আছে। সুতরাং তাকে সঙ্কল্প কত্তে হবে যে, যে কোনো প্রকারে মনের এই সুপ্ত দুর্ব্বলতা এই প্রচ্ছন্ন পাপাভিলাষ, এই গুপ্ত ভাবে অবাঞ্ছিত পাপ-প্রবণতা তাকে নির্ম্মূল কত্তে হবে। তার উপায়ও অতি সহজ।

উপায় অবিরাম ভগবন্নাম স্মরণ করা। এটা যে ভগবানেরই নাম, এই কথাটী মনে রেখে স্মরণ করা। ভগবানের নাম-স্মরণে যে গুপ্ত, সুপ্ত, প্রচ্ছন্ন, পাপলিপ্সা সত্যই কমে যায়, এই প্রত্যয় অন্তরে রেখে স্মরণ করা। অজ্ঞানতার দরুণ মানুষ এমন ভুল কত্তে পারে, যাতে দেহ অপবিত্র হয়, মন অপবিত্র হয়, রুচি-প্রকৃতি-আচরণ পর্য্যন্ত অপবিত্র হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভুল একটা করেছ ব'লেই তাতেই লগ্ন হ'য়ে থাক্‌তে হবে, তার কি মানে আছে? যেই মুহূর্ত্তে বুঝতে পার্ল্লে যে ওটা ভুল, তন্মুহূর্তে ওটা ত্যাগ কর, ওটার সংশ্রব বর্জ্জন কর, তৎক্ষণাৎ ওটার বিরুদ্ধে রুদ্র রোষে রুখে দাঁড়াও। পাপ হঠাৎ ক'রে ফেলেছ বলেই তুমি একেবারে গোল্লায় যাওনি, তোমার ফিরে আসার পথ আছে, এই কথা বিশ্বাস কর।

পরম নিশ্চিন্ততার পথ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—খুব আড়ম্বরপূর্ণ জাঁকজমকের জীবন যাপন কত্তে পার নি বা পাচ্ছ না ব'লে হায়-আফশোষ ক'রো না। আদর্শের অনুগত জীবন যদি যাপন কত্তে পার, তবে তোমাকে জগতে কেউ চিন্‌ল, কি না-চিন্‌ল, এতে কিছু আসে যায় না। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ধ্যান চালাও তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শটীর। মনে মনে নিজেকে নিরন্তর আদর্শের রূপসজ্জায় সাজাতে থাক।

অনুক্ষণ যেই ধ্যানটী কর্ব্বে, তুমি আস্তে আস্তে, এমনকি নিজের অজ্ঞাতসারে, ঠিক তা-ই হ'য়ে যাবে। প্রবল চিন্তা, গভীর ধ্যান এবং অবিরাম তৎপর থাকার যে কি সুফল, তা' দুমাস ক'রে দেখলেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে যাবে। জাগরণে বা নিদ্রায়, কর্ম্মে বা বিশ্রামে নিজের মনকে একটী মাত্র আবেশের দ্বারা আবৃত ক'রে রাখ। কি আছে তোমার প্রয়োজন জগদ্বাসী লক্ষ লোকের কাছে নামজাদা হবার? নামের লোভে লোকে ভাণ করে, কাজ করে প্রেমের লোভে। তোমার নিখুঁত আদর্শটিকে ভাল ক'রে চিনে নাও এবং তার সঙ্গে প্রেম কর। প্রেমই তোমাকে জন্মমরণের দুঃখ ভুলিয়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত কর্ব্বে।

নিঃসন্তানা বিধবার বিত্তে ব্যবসায়

এক প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একজন নিঃসন্তানা বিধবার ধনকে মূলধন স্বরূপে নিয়ে তুমি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হতে চাও, এতে আমি সন্তোষ অনুভব কচ্ছি না। কারণ, তুমি যদি এঁকে প্রতারণা কখনো কর, তবে তার প্রতীকার এঁর পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। ব্যবসায়ে নামবে কেবল নিজের লাভালাভের হিসাব ক'রে, এটা সৎপন্থা নয়। যদি ক্ষতি হয়, তবে এই মূলধনদাত্রীর অবস্থাটা কি হবে, তা'

আগে তোমার ভাবা প্রয়োজন। সৎলোকে এই ভাবেই সব কাজের বিচার করে। ইনি যৌবনবতী, বিশেষতঃ নিঃসন্তানা, এই কারণেই তোমার পক্ষে এরূপ কারবার থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন। কারণ, নিন্দক মানুষের চটুল রসনা এমন অনেক অপবাদ রটনা কত্তে পারে, যা' কাণে শুনলেও পাপ হয়। বল্বে, ইনি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠা। কিন্তু সে কথায় আমার আপত্তি খণ্ডিত হয় না। কারণ, আমাদের সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠা নারীকে বিবাহ করার রীতি প্রশংসিত নয়। নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তিদের মধ্যে এরূপ বিবাহ কিছু কিছু চলে, আর অতি সামান্য সংখ্যক চলছে ইঙ্গ-বঙ্গ-জাতীয় সমাজে, কিন্তু সাধারণ সমাজে যে-কোনও বর নিজের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহে আপত্তি কর্ব্বে, প্রসন্ন মনে এমন বিবাহে বরের সম্মতি হয় না। এমতাবস্থায় অপবাদ রটনার কুৎসিত সুযোগ লোকের হাতে তুলে দিয়ে কারবার করা বড় অমঙ্গল-সূচক। যে সব সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠা নারীর বা বিধবা রমণীর বিবাহ বিনা বাধায় চলে, সেই সকল সমাজের লোকেরা বিধবার সম্পত্তি তদারক করার কাজ নিতে পারে, বিধবার মূলধনে কাজ-কারবার কত্তে পারে। কারণ, দুর্নামের সম্ভাবনা দেখার আগেই তারা ইচ্ছে ক'রে সমাজ-সম্মত ভাবে বিবাহ কত্তে পারে এবং অবাধে দাম্পত্য জীবন যাপন কত্তে পারে।

অন্যথায় তোমার মতন একটী নিঃসম্পর্কিত যুবক বিধবার সম্পত্তি-সংরক্ষণের বা বিধবার মূলধনে কাজ-কারবার করার দায়িত্ব কিছুতেই নিতে পারে না।

বিপন্ন বিধবার ক্রন্দন ও অশ্রু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এবং প্রায়সব জাতীর মধ্যেই, মৃত স্বামীর প্রতি গভীর অনুরাগ যাদের আছে, এমন বিধবারা পুনর্ব্বিবাহিতা হবার জন্য ব্যগ্র হয় না। কিন্তু দুষ্ট ও দুর্ব্বৃত্তের উৎপীড়ন হ'তে আত্মরক্ষার জন্য কোনো কোনো বিধবাকে পূর্ব্ব স্বামীর প্রতি আন্তরিক অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও আরেকটী পতি গ্রহণ কত্তে হয়। যার পক্ষে এমন প্রয়োজন অপরিহার্য্য, তার পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণ কদাচ দোষের নয়। কিন্তু তুমি বিধবার সম্পত্তি-হরণের জন্য প্রথমে নেবে তার মূলধন, পরে নেবে তার সর্ব্বস্ব-ধন, সর্ব্বশেষে করবে অর্দ্ধচন্দ্র-দান, এরূপ ঘটনা জগতে বিরল নয়। এই জন্যই আমি আগে থাকতেই তোমাকে বল্‌ছি যে, সাধু সাবধান। সময় থাকতেই দূরে সরে পড়। ব্যবসায় করার মূলধন তুমি জগতে অনেক স্থানেই পাবে, সুতরাং কোনও নিঃসন্তানা নিরাশ্রয়া বিধবার টেঁকের দিকে দৃষ্টি দিও না। চতুর্দ্দিকে যত লোকের যত সম্পদ দেখতে পাচ্ছ, তার মধ্যে বিপন্না বিধবার

চোখের জল আর দীর্ঘনিঃশ্বাস, নিঃসহায়া বিধবার কাতর ক্রন্দন আর অভিসম্পাত কোথায় কোথায় আছে আর কত আছে, তা' তুমিও জান না, আমিও জানি না।

কাজ করা ও নাম করা

আর একজন জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—সারা দিন অসংখ্য রকমের নানা কাজে ব্যস্ত-সমস্ত থাকতে হয়। আমার মত লোকের পক্ষে ভগবানের নাম-সাধন কি ক'রে সম্ভব হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কর্ত্তব্য কাজ ত' কত্তেই হবে। কুকাজ করা যেমন পাপ, কর্ত্তব্য না করাও তেমন পাপ। তবে, এই দ্বিবিধ পাপের গুরুত্বের পার্থক্য আছে, এই মাত্র। সর্ব্বসময়ে মনকে ভগবানের নামে লগ্ন ক'রে রাখ এবং ঐ অবস্থাতেই কাজ কর। অর্থাৎ সাধন কত্তে কত্তে কর্ম্মরত হও, কর্ম্ম কত্তে কত্তে সাধন কর।

প্রশ্নকর্ত্তা।—কর্ম্ম কত্তে কত্তে নাম করলে নাম হয় না, নাম কত্তে কত্তে কর্ম্ম করলে কর্ম্ম হয় না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঠিক তাই নয়। কর্ম্ম কত্তে কত্তে নাম কত্তে থাকলে কর্ম্মেই মনোযোগ বেশী পড়ে নামে মনোযোগটা কম থাকে। যেমন তানপুরা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সেতার বাজালে সেতারের আওয়াজটাই স্পষ্টতর হয়, তানপুরার আওয়াজ তার তলায় পড়ে থাকে একটা আমেজের

মত। আবার, নাম কত্তে কত্তে কর্ম্ম করলে নামেই মনোযোগ বেশী পড়ে, নামটার দিকেই বেশী লক্ষ্য থাকে, কর্ম্মটার প্রতি লক্ষ্য কম থাকে। মনে কর তুমি পশমের জামা বুন্‌ছ। কুরশিকাটা যতবার নাড়ছ সঙ্গে সঙ্গে নামও করে যাচ্ছ। এক্ষেত্রে কুরশিকাটার দিকেই তোমার মনটা বেশী থাকছে কিন্তু নাম একটা গুঞ্জনের মত তার পিছে পিছে ধ্বনিত হচ্ছে । আবার, কুরশিকাটাকে একটা নির্দ্দিষ্ট অভ্যাসের মধ্য দিয়ে চালাতে গেলে কিছুক্ষণ পরে দেখবে যে, কুরশিকাটার দিকে তোমাকে আর লক্ষ্য দিতে হচ্ছে না পরন্তু নামের মধ্যে প্রায় সমস্ত মনটাকে তুমি ঢেলে দিতে পাচ্ছ।

প্রশ্নকর্ত্তা।—এক সঙ্গে কি মনটাকে দুটো কাজে রাখা যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যায়, যেমন গোলাপজাম খাবার সময়ে একই সময়ে তোমার মন জানছে যে, এটা মিষ্টি লাগ্‌ছে রসনায় আবার এটাও জান্‌ছে যে, এটা সুগন্ধ লাগছে নাসিকায়।

ভগবানের নাম ও দারিদ্র্য-বিনাশ

অপর প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দশ পনের বা বিশ বৎসর যাবৎ দীক্ষা নিয়েছ, কিছু কিছু সাধনও ক'রে যাচ্ছ কিন্তু শারীরিক দুরবস্থার বা সাংসারিক

অনটনের কোনো পরিবর্ত্তন হচ্ছে না ব'লে তুমি প্রথম গুরুর মন্ত্র ত্যাগ ক'রে দ্বিতীয় একজন গুরু কত্তে চাচ্ছ। একাজ আমার কাছে হঠকারিতা ব'লে মনে হচ্ছে। ভগবানের সব নামই নিত্য, সব নামই সত্য। গুরু তোমাকে যে নামই দিয়ে থাকুন, সে নাম যে সত্য, এই বিশ্বাসটী রেখে কেবল জপ ক'রে যেতে থাক। মানুষ ডাক্তারের কাছে যায় শারীরিক রোগ সারাবার উপায় জান্‌তে। উকিলের কাছে যায় মামলা-মোকর্দ্দমায় নিষ্কৃতি পাবার পথ জান্‌তে। গুরুর কাছে যায় ভব-বন্ধন কাটাবার পথ জানতে। রেলওয়ে টাইম-টেবলে কোন্ পূজার কোন্ তিথি তা' লেখা থাকে না। তোমরা গুরুর কাছে মন্ত্র নিতে কেন যাবে, সংসারের দারিদ্র্য-ভঞ্জন করাবার জন্য? দারিদ্র্য মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা। দেশব্যাপী পরাধীনতা জাতির রাজনৈতিক সমস্যা। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উপায় অবলম্বন কত্তে হবে। কিছু লোককে আমি দেখেছি ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য প্রভু জগদ্বন্ধুর নাম জপতে। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মী যাঁরা তাঁরা অন্য পথ খুঁজে বের করেছেন। ভব-বন্ধনের পাশ থেকে মুক্তির জন্য গুরুর কাছে গিয়েছিলে, তিনি দিলেন ভগবানের নাম। তুমি সেই নাম জপ কর, শুধু বাসনার বন্ধন, কামনার বেড়াজাল, রিপুকুলের দাসত্ব, ইন্দ্রিয়গণের উৎপীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য। সংসারের আর্থিক

উন্নতি-বিধানের জন্য প্রতিজনে আলস্য পরিহার কর এবং জনে জনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপার্জ্জন দিয়ে সংসারের আর্থিক রিক্ততাকে দূর করার চেষ্টা কর। ভগবানের নাম তোমাকে বল দেবে, সাহস দেবে, বিশ্বাস দেবে, নিজ ভবিষ্যতে আস্থা দেবে। ঐ সকলের সহায়তায় তুমি জীবন-যুদ্ধে শুধু পটুই হবে না, হবে দুর্দ্ধর্ষ ও অপরাজেয়।

কাজ করার কৌশল

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— বড় কাজ যদি কত্তে চাও আর ভাল ভাবে যদি কত্তে চাও, তা'হ'লে চতুর্দ্দিকের আবহাওয়াকে হৃদ্যতাপূর্ণ অনুকূল ক'রে তোলার দিকে আগে দৃষ্টি দেবে। নিজেদের অনভিজ্ঞতায়, অপরিণামদর্শিতায় ও বুদ্ধি-বিভ্রমের ফলে যদি কাজ শুরু না কত্তেই ঝড়ো হাওয়ার সৃষ্টি হয়, তবে জানবে, অল্প কালের মধ্যেই কিছু দামী কর্ম্মী পালিয়ে যাবে, কিছু কাজের লোক পদস্খলিত হ'য়ে খানায় ডোবায় ডুববে, কিছু লোক নিজেদের অমার্জ্জনীয় জিদের বশে গড়া জিনিষকে ভাঙ্গবে। আর, ছোট ছোট ভাল কাজই যদি কর, তাহ'লেও, ছোট কাজগুলিকেও সুন্দর ভাবে, পরিচ্ছন্ন ভাবে, সহজে সুচারুতায় সম্পূর্ণ করার জন্য নিজের, সংশ্লিষ্ট কর্ম্মীদের, প্রতিবেশীদের মন-মেজাজ ভাল থাকা প্রয়োজন। সৎ কাজের বাধা সৃষ্টি করে মানুষের প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার, প্রকটিত দর্প, অপরের শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি

ভ্রূকুটি নিজেকে বড়, মহৎ ও সর্ব্বজ্ঞ ব'লে জ্ঞান করা আর পরের কাজে গায়ে প'ড়ে হস্তক্ষেপ করা। এসব থেকে সাবধান থাক্‌তে পারবে? যদি পার তবে সকলেরই কাছে কিছু দামী সেবা পাবার প্রত্যাশা সফল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি না পার, তবে সবাইকে হতাশ কর্ব্বে আর কি। যাতে পার, তার জন্যই তোমাকে উপদেশ দিব যে, নিয়ত মনটাকে ভগবানের চরণে স্থাপন কত্তে চেষ্টা ক'রো। সেই চেষ্টার ফলে চিরসুন্দর ভগবানের সুন্দরতা তোমাতে সংক্রামিত হবে, চির-মঙ্গল ভগবানের মঙ্গলময়ত্ব তোমাতে অধিষ্ঠান নেবে।

অবিনশ্বর কীর্ত্তি

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, লোকের মনে আশা পোষণের শক্তি অপরিসীম ব'লেই প্রত্যেকে মনে ক'রে থাকে যে, সে যে সব কাজ ক'রে যাচ্ছে, তার কীর্ত্তি অক্ষয় অমর হ'য়ে জগতে চিরকাল দেদীপ্যমান থাক্‌বে। অথচ ভারতে ইংরেজের আগমনের পরে নানা স্থানে নানা কারণে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি ক'রে প্রাচীন শিলালেখ-সমূহ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা রাজা অশোকের পুণ্যকীর্ত্তির কোনো কথাই জানতুম না। ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিক-তত্ত্বের অনুসন্ধানকারীরা মিশরের পাহাড়, মৃত্তিকা,

প্রস্তর, মরুভূমি প্রভৃতির খনন না কর্ল্লে টুটেনখামেন বা অ্যামেনহোটেপের বিরাট সাম্রাজ্যের খবরই কখনো হয়ত জানা যেত না। অতুল-কীর্ত্তিধর এই সব বিরাট ব্যক্তিত্বশালী মানুষদের চেয়ে আরও বিরাট, আরও মহৎ কত শত জনের স্মৃতি বালুকাস্তূপে চাপা প'ড়ে মৃত্তিকার শত গজ নিম্নে লুক্কায়িত হ'য়ে আছে, তার সাক্ষ্য একমাত্র ধরিত্রী-মাতাই দিতে পারেন, যিনি মুখ ফুটে কারো কথা কারো কাছে বলেন না অথচ নীরবে অনন্ত কাল ধ'রে প্রত্যক্ষ ক'রে এসেছেন। চিরস্থায়ী কীর্ত্তির যদি তুমি লিপ্সু হ'য়ে থাক, তবে জানবে, ভুল পথে তোমার লিপ্সাকে পরিচালনা কচ্ছ। জাগ্রত জীবন্ত বর্ত্তমান কালটুকুর মধ্যে নিজেকে কত সুন্দর ব্যবহারে আনতে পার, মাত্র তার দিকে তাকিয়ে পথ চল। চিরস্থায়ী কীর্ত্তি-লাভের আলেয়ার আলোর অনুসরণ ক'রে বৃথা শ্রান্ত হ'য়ো না। জগতে কারো কীর্ত্তি চিরস্থায়ী নয়। আত্মপ্রসাদই তোমার অবিনশ্বর কীর্ত্তি হোক্।

সন্দ্বীপ

১৫ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৪২
হইতে ১৯শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার অর্থাৎ
(১লা নভেম্বর, ১৯৩৫ হইতে
৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত)

সন্দ্বীপের ভ্রমণ-কাহিনী নানা কারণে বিচিত্র। তৎসম্পর্কে

সম্প্রতি যে বৃত্তান্ত সন্দ্বীপ-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুধাংশু লাল দাস ইংরাজি ১৯৭৪ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রেরণ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা হুবহু বর্ণিত হইল।

সন্দ্বীপ ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীসুধাংশু লাল দাস লিখিয়াছেন,—“১৯২৮ কি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা; সন্দ্বীপে তখন কলেজ ছিল না। সন্দ্বীপের অধিবাসী কতিপয় কলেজের ছাত্ররা সন্দ্বীপের বাইরে বিভিন্ন কলেজে তখন অধ্যয়নশীল থাকাবস্থায় বৃটীশ-বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবপন্থী গুপ্ত সমিতি যুগান্তর ও অনুশীলন দলের সংস্পর্শে আসেন এবং ঐ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দল-গঠনের উদ্দেশ্যে সন্দ্বীপ টাউনে একটী ব্যায়ামাগার স্থাপন করেন। কিন্তু শরীর-চর্চ্চার সাথে সাথে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে বৃটীশ-বিরোধী মনোভাব গড়িয়া তোলা এবং সশস্ত্র বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যায়ামাগারের সাথে “ছাত্র-মঙ্গল পাঠাগার” নামে একটী গ্রন্থাগারও স্থাপন করেন। এই বিপ্লবপন্থী ছাত্র ও যুবকদের গুপ্ত কার্য্যাবলী পুলিশ, গোয়েন্দা ও সরকারের নিকট গোপন রাখার জন্য তাঁহারা অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, বিধবা-বিবাহ, দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষাদান, বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা এবং রুগ্ন-নারায়ণের সেবা ইত্যাদি লোক-লোচনের গোচরীভূত প্রকাশ্য কার্য্যাবলী-সমূহ

প্রতিষ্ঠান দুইটীকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু সন্দ্বীপের উচ্চশ্রেণীর বর্ণ-হিন্দুরা ঐ সমস্ত কার্য্যাবলীকে বিশেষ সমর্থন করিতেন না বলিয়া প্রায় সকল কাজেই বিভিন্ন ভাবে অসহযোগিতা প্রকাশ করিতেন। অথচ সমাজে ইঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম। কাজেই গুপ্ত ও প্রকাশ্য সকল কাজেই যুবকদের চারিদিক হইতে নানা প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি হইত; যাহা কখনোই বাঞ্ছনীয় ছিল না।

"এই সময়ে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রা' নামক বহু-প্রশংসিত মাসিক পত্রিকায় পুপুন্‌কী অযাচক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের কার্য্যাবলি সম্পর্কে সচিত্র এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উহা সন্দ্বীপের ব্যায়ামাগার এবং গ্রন্থাগার স্থাপনকারী বিপ্লবপন্থী যুবক ও ছাত্রদের মনে গভীর রেখাপাত করে। তাঁহারা ছাত্র ও যুবকদের ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ভিত্তি দৃঢ়রূপে গঠনের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের অমোঘ শক্তির প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভব করেন। এতদ্‌ব্যতীত তাঁহারা শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের অভাবনীয় অযাচক-বৃত্তির আদর্শে মোহিত ও চমৎকৃত হন। তাঁহারা এরূপ একজন সর্ব্বত্যাগী মহান আদর্শপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্য তাঁহাদের এবং তাঁহাদের অনুগামী ছাত্র ও যুবকদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করেন এবং তাঁহারা আরও মনে

করেন যে, এজন্য স্বামিজী মহারাজকে যে-কোনও প্রকারে একবার সন্দ্বীপে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ তাঁহার এই শুভাগমনের ফলে প্রতিষ্ঠান দুইটীর পরিস্থিতি ও পরিবেশ ভিন্ন রূপ ধারণ করিবে এবং উহার ফলে বর্ণ-হিন্দুদের মধ্যে প্রতিষ্ঠান-দুইটীর প্রতি অসহযোগিতার যে বিরূপ মনোভাব সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাও বহুলাংশে বিদূরিত হইবে।

"এই অভিপ্রায় হইতেই উক্ত বিপ্লবপন্থী যুবকেরা 'ছাত্রমঙ্গল পাঠাগার'কে কেন্দ্র করিয়া ঐ পাঠাগারের মাধ্যমে স্বামিজী মহারাজকে সন্দ্বীপ-ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। অবশ্য সন্দ্বীপ আসার পূর্ব্বে বা সন্দ্বীপে অবস্থান-কালে অথবা সন্দ্বীপ হইতে চলিয়া যাইবার পরে কেহ এই গোপন উদ্দেশ্যের কথা স্বামীজীকে ঘুণাক্ষরেও জানান নাই। তিনি নিজে ইহা অনুভব করিয়াছিলেন কিনা, তাহা আমরা আজও জানি না। সম্ভবত স্বামিজী মহারাজ তখন ত্রিপুরা জেলায় (বর্ত্তমান কুমিল্লা জেলা, বাংলাদেশ) ভ্রমণ করিতেছিলেন। ঐ আমন্ত্রণ গৃহীত হইলে কি ভাবে সন্দ্বীপ আসা যায়, সে বিষয়ে স্বামীজী মহারাজের সহিত পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী বি, এস, সি মহাশয়ের পত্রালাপ চলিতে থাকে। তখন ফার্ণ নেভিগেশান কোম্পানীর মেডিস্ নামক একখানা ষ্টীমার নোয়াখালী হইতে সন্দ্বীপ এবং সন্দ্বীপ হইতে নোয়াখালী চলাচল করিত। পত্রালাপের মাধ্যমে ঐ

মেডিস্ ষ্টীমারেই স্বামীজির নোয়াখালী হইয়া সন্দ্বীপ আসা স্থির হয় এবং আসার নির্দ্দিষ্ট তারিখও স্বামিজী মহারাজ জানাইয়া দেন।

"৩১।১০।১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ (১৪ই কার্ত্তিক ১৩৪২ বাংলা) গভীর রাত্রে স্বামিজী নোয়াখালী হইতে উক্ত মেডিস্ ষ্টীমারে তাঁহার দুইজন ব্রহ্মচারী-শিষ্য সহ সন্দ্বীপ অভিমুখে রওনা হন। হিসাব মত পরদিন সকাল ৭।৮ টায় ষ্টীমার সন্দ্বীপে পৌঁছার কথা ছিল, সেই অনুসারে স্বামিজীকে কীর্ত্তনাদি সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া ষ্টীমার-ষ্টেশন হইতে নিয়া আসার জন্য পাঠাগারের সভ্য চট্টগ্রাম জিলার পতেঙ্গা-নিবাসী (পরে স্বামিজীর প্রিয় শিষ্য) অধুনা পরলোকগত মথুরা রঞ্জন শীলের নেতৃত্বে একটী কীর্ত্তনের দলকে ষ্টীমার-ষ্টেশনে পাঠান হয়। বেলা প্রায় ১০।১১ ঘটিকার সময় কীর্ত্তনের দল কীর্ত্তনাদি সহকারে স্বামিজীকে সহ সন্দ্বীপ টাউনে উপস্থিত হন। সন্দ্বীপের তৎকালীন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ও পরম ভগবদ্ভক্ত উকিল (বর্ত্তমানে লোকগত) রসিক চন্দ্র কর্ম্মকার মহাশয়ের বাসভবনে স্বামিজীর অবস্থানের জন্য পূর্ব্বেই স্থান নির্দ্দিষ্ট করা ছিল। রসিকবাবু সস্ত্রীক ভক্তি-সহকারে নিখুঁত আতিথ্য প্রদান করেন।

"সন্দ্বীপ পৌঁছিয়াই শ্রীশ্রীস্বামিজী ঐ দিনই সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় 'মনুষ্যত্বের সাধনা' সম্পর্কে বক্তৃতা দিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া তাহা

প্রচার করা হয়। সভারম্ভের পূর্ব্বেই সমস্ত সন্দ্বীপের চারিদিক হইতে নারী ও পুরুষেরা টাউন হলটীকে একেবরে পূর্ণ করিয়া রাখেন।

"ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে শ্রীশ্রীস্বামিজী বক্তৃতারম্ভ করেন। তিনি বলেন,—প্রাচীন গ্রীস দেশের এথেন্স নগরীতে ডায়োজিনিস নামে এক মহান্ দার্শনিক ছিলেন। তিনি একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে আলোকবর্ত্তিকা হস্তে নগরীর প্রশস্ত রাজবর্ত্মে কাকে যেন খুঁজছিলেন? তাঁর এই অদ্ভুত কার্য্যাবলীতে বিস্মিত হ'য়ে জনৈক পথিক তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্ল্ল,—আপনি এই জ্বলন্ত আলোকবর্ত্তিকা হস্তে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কিরণে উদ্ভাসিত রাজপথে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন? ডায়োজিনিস উত্তর দিলেন,—মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছি। কৌতূহলী পথিক পুনরায় জিজ্ঞাসা কর্ল্ল,—এই উজ্জ্বল দিবালোকে এই প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে অগণিত জনস্রোত ব'য়ে চলেছে। তাদের কি আপনি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না? দার্শনিক উত্তর দিলেন,—না, এদের মধ্যে আমি একজনও মানুষ দেখতে পাচ্ছি না।

"এই সূচনার উপর ভিত্তি করিয়া শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব মনুষ্যত্ব কি বস্তু, কি ভাবে মনুষ্যত্বের সাধনা করিতে হয়, তাহার সাধনা করিয়া মানুষ কি ভাবে ক্রমশঃ প্রকৃত মনুষ্যজীবনে উন্নীত হয়, সত্যিকার মানুষ কাহাকে বলে, এই জগতে কাহারা প্রকৃত মনুষ্য-পদবাচ্য ইত্যাদি

বিষয়ে সুদীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টা ব্যাপিয়া অনর্গল বক্তৃতা প্রদান করিয়া তাঁহার বক্তব্য অসমাপ্ত রাখিয়া সেদিনের মত তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন।

"পরদিন ২।১১।১৯৩৫ ইং পূর্ব্বদিনের ন্যায় ঠিক সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীস্বামিজী তাঁহার অসমাপ্ত বক্তৃতা পুনরায় আরম্ভ করেন। এই দিন পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা আরও এত অধিক জনসমাগম হয় যে, বহু শ্রোতা বসিবার স্থান সংগ্রহ করিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হন। কিন্তু যতক্ষণ স্বামিজীর বক্তৃতা শেষ না হয়, ততক্ষণ তাঁহারা অম্লান বদনে দাঁড়াইয়াই বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

"এই দিন স্বামিজী জগতের যত সত্যদ্রষ্টা মহাপ্রাণ ব্যক্তি মনুষ্যত্বের সাধনালব্ধ জ্ঞান দ্বারা মানব-কল্যাণে নিজ নিজ জীবন নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া মহৎ জীবনের গতিপথ নির্দ্দেশ করেন। আর তিনি দৃঢ় ভাবে ইহাও প্রকাশ করেন যে, ঐ পথ ভিন্ন জগতে মানুষের শান্তির পথ, সুখের পথ, আনন্দের পথ আর কিছু হইতে পারে না।

"এই দিনও স্বামিজী রাত ৯।।০ টায় তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন।

"৩রা নভেম্বর রবিবার, পূর্ব্বাহ্নে ব্যায়ামাগার ও পাঠাগারের বিপ্লবী ছাত্র ও যুবকগণ এবং বিশিষ্ট সভ্যগণ

তাঁহাদের নিজেদের এক ঘরোয়া আলোচনা সভায় মিলিত হন। তথায় তাঁহাদের আলোচনা দ্বারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, যেই উদ্দেশ্যে স্বামিজী মহারাজকে সন্দ্বীপ আনয়ন করা হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য বহুলাংশে সাধিত হইয়াছে। তদুপরি যেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী এক জ্বলন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মানবকল্যাণে ধূপের মত পুড়িয়া পুড়িয়া নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতেছেন, তাঁহাকে একটী মানপত্র দিয়া অভিনন্দিত করা একান্তই সঙ্গত।

"সুতরাং অপরাহ্নে ঠিক ছয় ঘটিকায় সভারম্ভ-কালে প্রথমে মানপত্র দেওয়া হইল। শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় মানপত্র পাঠ করিলেন। তৎপরে বক্তৃতারম্ভ হইল। এই দিন এত জনসমাগম হয় যে, সমস্ত টাউন হলে তিল ধারণের স্থান ছিল না। বহুলোক টাউন হলের বাহিরে ও ভিতরে তিন পার্শ্বের রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শোনেন।

"এই দিন স্বামিজী ব্রহ্মচর্য্য, জীবন-গঠন, নারী ও পুরুষের জীবনের পবিত্রতা, সংযম-সাধনা, জীবন-গঠনের নৈতিক শিক্ষা, চরিত্র-গঠন, সাহিত্য ও সমাজ ইত্যাদি আরও বহু বিষয়ের অবতারণা করিয়া জ্বলন্ত ভাষায় এমন ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন যে, শ্রোতাগণ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন। এই দিন রাত প্রায় দশটায় সভার সমাপ্তি ঘটে।

"প্রতিদিন সভায় সন্দ্বীপের উকিল, মোক্তার, ডাক্তার,

শিক্ষক, উচ্চ ও মধ্য রাজকর্ম্মচারী ও বহু বিশিষ্ট শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং সকল স্তরের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ যোগদান করিয়াছিলেন।”

শ্রীযুক্ত সুধাংশু লাল দাসের স্মৃতি-চারণে আরও অনেক কথা আছে, যাহা স্থানাভাবে প্রকাশিত হইল না।

১৯শে কার্ত্তিক তারিখে শারীরিক অসুস্থতার জন্য আর বক্তৃতা দেওয়া হয় নাই। দুই তিন দিন মধ্যেই বরিশাল যাইবার কথা ছিল। টেলিগ্রাম করিয়া জানানো হইল যে, শরীর অসুস্থ, অতএব আপাততঃ বরিশাল ভ্রমণ স্থগিত রহিল।

মোহম্মদ বেদার বখ্ত

কিন্তু সন্দ্বীপের একটী প্রেমিক মুসলমান ভদ্রলোকের স্মৃতি অক্ষয় হইয়া রহিল। শ্রীসুধাংশু লাল দাস লিখিয়াছেন,—

“সন্দ্বীপ থানায় এই সময় মোহম্মদ বেদার বখ্ত নামে একজন পুলিশ সাবইনস্‌পেক্‌টার ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়া থানার ‘মাইজ-ভাণ্ডার’ নামক বিখ্যাত দরবারের আওলিয়া পীরের (গুরু) মুরিদ (শিষ্য) ছিলেন। তাই অত্যন্ত ভগবদ্-ভক্ত ও প্রেমিক লোক ছিলেন তিনি। স্বামিজীর বক্তৃতার প্রথম দিবস হইতে তিনি তাঁহার প্রতিটি বক্তৃতা শুনিয়া এবং

পরে তাঁহার সহিত নানা প্রকার আলাপ-আলোচনা করিয়া বিশেষ ভাবে মোহিত হন। গানের মজলিশেও তিনি যোগ দিয়াছিলেন। দুই দিনই স্বামিজীর ভক্তিমূলক গান আরম্ভ হইলেই তিনি আর ভাব সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। চোখের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত। তিনি মজলিসের মধ্যে কাঁদিতে কাঁদিতে নাচিয়া, কুঁদিয়া, লাফাইয়া ঝাপাইয়া মজলিশটাকে যেন একটা পাগলা গারদ বানাইয়া ছাড়িতেন। সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত হইয়া যাইত। নিজের পদমর্য্যাদা বা সম্মান কোন বিষয়ের কথাই তাঁহার স্মরণ থাকিত না।—এই প্রেমিক ভক্ত আজ আর ইহজগতে নাই।"

মথুর রঞ্জন শীল

সন্দ্বীপের সুগায়ক শ্রীমথুর রঞ্জন শীল শ্রীশ্রীবাবামণির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার সংরক্ষিত ডায়েরি হইতে সন্দ্বীপের নানা জনের সহিত যে কথোপকথন হইয়াছে, তাহার অংশ-বিশেষ পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাসমূহে প্রদত্ত হইল।

তারিখ অনুয়ায়ী সাজান সম্ভব হইল না। তবে সব উপদেশই বক্তৃতামঞ্চের বাহিরে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই সময়ে ছায়ার ন্যায় যাঁহারা নিয়ত সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদেরই কাছ হইতে মথুরদা তাঁহার তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

একা একা কাজ ও সদলে কাজ

একজন প্রশ্ন করিলেন,—একা একা কি কেউ বড় কাজ কত্তে পারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কতকগুলি লোক থাকে, যারা খুবই কর্ম্মঠ এবং উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত কিন্তু অন্যের সঙ্গে মিলে কোনো কাজ তারা কর্ব্বে না। কর্ব্বে অনেক, খাট্‌বে চূড়ান্ত ভাবে কিন্তু সব একা একা। কাজটা যখন জগতের সকলের কুশলের জন্য কত্তে যাচ্ছি, তখন জগদ্‌বাসী যত জনেই সহযোগ দান করুক, তাদের সেবা আমি গ্রহণ কর্ব্ব না কেন? তা'দিগকে কাজ কত্তে আমার সঙ্গে মিল্‌তে কেন আমি দিব না? ব্যক্তিগত যোগ্যতা সম্পর্কে অতিরিক্ত উচ্চধারণা অথবা অপরের অযোগ্যতা সম্পর্কে অত্যধিক নীচ ধারণা এই সকল ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে থাকে। কর্ম্মি-মাত্রেরই চেষ্টা থাকা উচিত, অনুকূল-মনোভাব-সম্পন্ন সৎ-কর্মীদের সহায়তা কি ভাবে পাওয়া যেতে পারে, তার জন্য। কারো সহযোগ পেতে হ'লে যদি আদর্শের অপহ্নব ঘটাতে হয়, কারো সহযোগ পাবার ফলে যদি আদর্শের মানদণ্ডকে খাটো ক'রে নিতে হয়, তবে এমন স্থলে কারো সহযোগিতা না নেওয়াই উচিত। কিন্তু পাঁচ জনে মিলে কাজ করবার সুযোগ সৃষ্টি যেখানে বৈধ ভাবেই সম্ভব,

সেখানে একা একা খেটে মরার কোনো মানে হয় না। নিজেকে জান্‌বে দীনাতিদীন ব'লে, তাহ'লেই আত্মাভিমান আর বাধা দেবে না। নিজেকে জান্‌বে আদর্শের অকুণ্ঠ পূজারি-রূপে, তাহ'লেই আর আদর্শহীনেরা তোমার সঙ্গে চালাকি খাটাতে পার্ব্বে না।

শৃঙ্খলার মূল্য

প্রশ্ন হইল,—আদর্শ-বর্জ্জিত লোকেরা যখন আমাদের কর্ম্মসঙ্গী হবার জন্য ভিড় ঠেলে কাছে আসবার চেষ্টা কর্ব্বে, তখন আমরা কর্ব্ব কি? তাদের উপেক্ষা কর্ব্ব? অসম্মান ক'রে তাড়িয়ে দিব?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না, নিশ্চয়ই কর্ব্ব না। তাদের কাছে আদর্শকে উজ্জ্বল ক'রে আগে তুলে ধরতে চেষ্টা কর্ব্ব। আদর্শ-জীবন যাপনের জন্য তাদের মনে নিশ্চয়ই ব্যাকুল আগ্রহ সৃষ্টি ক'রে নিব। যাতে তারা আদর্শানুযায়ী জীবন-যাপন কত্তে প্রবুদ্ধ হয়, প্রস্তুত হয় এবং সমর্থ হয়, তার জন্য তাদের সামনে জীবনের শৃঙ্খলাকে এনে উপস্থিত কর্ব্ব। বলতে হবে, পণ কর, মদ কখনো খাবে না। বলতে হবে, ছেড়ে দাও, চা, চুরুট, সিগারেট, বিড়ি, হুকো। বল্‌তে হবে, এস, প্রত্যেকে অনুশীলন কর সত্যের আর প্রেমের। বল্‌তে হবে, কামে আর প্রেমে তফাৎ কোথায়, তা' খুঁজে বের

করার জন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টি হবার চেষ্টা কর। বলতে হবে, ত্যাগের সাথে ভোগের আপোষ আর সেবার সাথে স্বার্থের আপোষ চলবে না। এই ভাবে তার জীবনের মধ্যে মননে ও আচরণে যুগান্তর আনয়ন কত্তে হবে। এই কাজটী করার নামই হচ্ছে, শৃঙ্খলা বা discipline স্থাপন। হাজার, লক্ষ, কোটি নরনারী তোমার আদর্শবাদের ব্যাখ্যা শুনে তোমাকে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত কত্তে পারে কিন্তু তাতে তুমি বেশী মূল্যবান্ ব'লে মনে ক'রো না। এর ভিতরে যে দুই চারটি দুর্ল্লভ মানুষ শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে তোমার সমীপস্থ হবে, তুমি নির্ভর কত্তে পার মাত্র সেই কয়টী মুষ্টিমেয় মানুষের উপরে। শোভাযাত্রার জয়ধ্বনি তোমার যোগ্যতা বা সুযোগের মাপকাটি নয়, সে জিনিষটী আলাদা। শৃঙ্খলার সাথে যে তোমার অনুগামী বা সহগামী, তুমি একমাত্র তাকেই গণনায় আনতে পার। হাতে বন্দুক আছে ব'লেই কেউ তোমার পক্ষে নির্ভরযোগ্য নয়। হস্তধৃত লেখনী বা ছোট পাথরের টুকরোটাও যে সময় মত সুশৃঙ্খলার সাথে ব্যবহার কত্তে পারে, সে-ই তোমার পক্ষে নির্ভরযোগ্য। লক্ষ লক্ষ লোককে নিয়ে সুশৃঙ্খল ভাবে চলা কঠিন কিন্তু লক্ষ লোকের যারা কারবারী, তাদের পক্ষে এই কঠিন কাজটীকে সব চেয়ে বড় কাজ ব'লে মেনে নিতে হবে। কেবল হৈ-হল্লা আর কেবল স্লোগানের উচ্চ চীৎকার কোনো দক্ষ সেনাপতির কাম্য নয়। লক্ষ্য কর্‌লেই দেখতে পাবে যে,

সমগ্র দেশটা জুড়েই উচ্চাকাঙ্ক্ষার বান ডেকেছে। অক্ষমেরা সক্ষম হতে চায়, দুর্ব্বলেরা সবলতা পেতে চায়, মূক ও বধিরেরা আজ কথা কইতে চায়, কথা শুনতে চায় কিন্তু এই চাওয়া যতই ব্যাপক হউক, এর ভিতরে শৃঙ্খলা আছে কোথায়? শৃঙ্খলা মানেই পরস্পর পরস্পরকে সহ্য ক'রে সহাবস্থান, শৃঙ্খলার মানেই হচ্ছে প্রত্যেকের শক্তির একাংশকে একটী সুনির্দ্দিষ্ট কাজে লাগিয়ে দেওয়ার নির্ব্বিরোধ আয়োজন।

উদ্দেশ্য-নির্ণয় ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুধু তাই নয়। প্রয়োজন আছে উদ্দেশ্য বিচারেরও। কেন কোটি কোটি লোককে একমুখী কত্তে চাও, কেন তাদের কর্ম্মশক্তিকে একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে উদ্যত কত্তে চাও, কেন তাদের আত্মোৎসর্গ আজ তোমাদের কাম্য, তারও একটা নির্ভুল হিসাব প্রয়োজন। আমার ডাকে আর তোমার ডাকে লক্ষ লক্ষ লোকের অন্তরে আত্মোৎসর্গের উন্মাদনা এল, এরূপ ঘটনা পৃথিবীতে নূতন নয়। চিরকাল সবল কণ্ঠের ডাকে কোটি কোটি দুর্ব্বল একত্র হয়েছে, প্রাণ উৎসর্গ ক'রে দিয়ে নির্দ্দিষ্ট কোনও লক্ষ্যকে করায়ত্ত করেছে। কিন্তু কি সেই লক্ষ্য, কেন তার জন্য প্রিয়তম প্রাণ দিয়ে দিতে হবে, এই বিষয়ে তার কি সুস্পষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন নেই? সেই জ্ঞানটুকু বিলাবে কারা? এই জ্ঞানটুকু বিলাতে

যদি ত্রুটি কর, তাহ'লে এমন দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে যে, যে অন্যায়কে নির্ব্বাসিত করার জন্য একটা বিরাট কর্ম্ম-কোলাহল বা আন্দোলন সৃষ্টি করেছ, সেই অন্যায়ই, সেই অনর্থই, সেই পাপই, সেই অত্যাচার ও সেই ব্যভিচারই তোমাদিগকে নূতন ক'রে উৎপীড়ন কত্তে লেগে গেছে। "আমার কাজ আমি ক'রে গেলাম, ভবিতব্য রইল ভবিষ্যতের হাতে",— একথা সাধারণ মানুষের পক্ষে খাটে। কিন্তু যাঁরা নিজেদিগকে চিন্তানায়ক বা দার্শনিক ব'লে জ্ঞান করেন, তাঁরা এই বিষয়ে চিন্তা না ক'রে পারেন না। যে কর্ম্মযজ্ঞে যোগ্য কোনও দার্শনিক নেই, যে আন্দোলনে স্পষ্ট, স্বচ্ছ, সুদূরব্যাপী দৃষ্টিশক্তির অধিকারী কোনও চিন্তানায়ক নেই, সেই যজ্ঞ, সেই আন্দোলন অনেক সময়ে এমন সব পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যার ফল অতীতের অত্যাচার থেকে বেশী অত্যাচার, অতীতের অনাচার থেকে বেশী অনাচার, অতীতের অশান্তি থেকে বেশী অশান্তি, অতীতের বিভ্রান্তির চেয়ে বেশী বিভ্রান্তি। সমাজের শোষণ বন্ধ করার জন্য যে কাজ করা হ'ল, তারই পরিণামে যদি শোষণ আরও ঘৃণ্য রূপ ধারণ করে, যদি প্রতারণা আরও জঘন্য হয়, যদি মিথ্যার রাজত্ব কায়েম হয়ে যায়, তবে তখন কি কর্ব্বে? এসব ভাবতে গেলে গতিবেগ যে কিছুটা কমে, একথা সত্য কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত দ্রুততার ফলে যদি পর্ব্বতচূড়া থেকে পদস্খলিত হয়ে দশ হাজার ফুট নীচের

গর্ত্তে প'ড়ে যাও, তবে তা' কি কখনো অভিনন্দন-যোগ্য হবে? দেশ, জাতি বা জগতের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণই পরমেশ্বরের হাতে কিন্তু তোমার যতটুকু দৃষ্টিশক্তি, তদনুযায়ী দূরের দিকে দৃষ্টি রেখে চলার চেষ্টা নিশ্চয়ই তোমার নিজের হাতে। নিজের শক্তিতে কারো বিশ্বাস হারানো উচিত নয়।

সদনুষ্ঠানের শুভফল

জনৈক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সদনুষ্ঠানের শুভফল হচ্ছে বললাভ। বললাভের সার্থকতা হচ্ছে জগন্মঙ্গলে। মনে মনে বিশ্বাস রাখ্‌বে যে, যা কিছু কচ্ছ, তা' পৃথিবীর নব-রূপায়ণের মহাযজ্ঞের সমিধ্ সংগ্রহ-মাত্র,—তোমাদের আত্মস্বার্থ পুরণের কোনো আয়োজন নয়। মনে রাখ্‌বে যে, জীবনের প্রতিটি কর্ম্ম তোমরা কচ্ছ সর্ব্বজীব-হিতার্থে, নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ তোমাদের লক্ষ্য নয়। প্রতি কার্য্যে নিরন্তর প্রার্থনা কর,—"হে ভগবান্, আমাকে নিষ্কাম কর, নিঃস্বার্থ কর, নিষ্কলুষ কর, নিষ্কলঙ্ক কর, তোমার সেবার যোগ্য কর।" নিরন্তর সৎকর্ম্মে লেগে থেকে তার মধ্য দিয়ে চিত্তশুদ্ধি বিধান কর। প্রত্যেকটী প্রাণী নিজেকে সৎকর্ম্মে সংযুক্ত কর এবং যে যে-কাজ ধরেছ, তার চূড়ান্ত না দেখে কাজ ছাড়বে না ব'লে পণ কর। সকলে সকলকে সৎকর্ম্মের দিকে আকর্ষণ কর। সকলে সকলকে সৎকর্ম্ম

সাধনে প্রেরণা দাও, উৎসাহ দাও, বুদ্ধি দাও, বল যোগাও। সমগ্র জগৎ তোমরা নামে, প্রেমে, স্নেহে, সেবায়, দয়ায় ও ভালবাসায় পূর্ণ কর্ব্বে, ইহাই যে তোমাদের একমাত্র ব্রত, তা' মনে রেখে প্রতিটি পদ-সঞ্চালন কত্তে থাক। তোমাদের মিলন-প্রয়াস সমগ্র বিশ্বকে আপন কত্তে সমর্থ হোক্। সদনুষ্ঠানের শুভফল হচ্ছে ঐক্যলাভ, বললাভ, জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ।

জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও সমাজসেবা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তুমি যদি জিতেন্দ্রিয় হ'তে পার, তবে জানবে, তুমি সমগ্র জগতের মধ্যে ঐক্য সম্পাদনের একটী নির্ভরযোগ্য সেতু হ'লে। নির্ব্বিচার এবং অসংযত আচরণ জগতে অনৈক্যের সৃষ্টি করে। একটী মাত্র মেয়ে-মানুষকে নিয়ে যে শত শত পুরুষের মধ্যে দুর্ব্বার কলহ, তাই কি সমাজের অনেক স্তরে কল্পনাতীত অশান্তির সৃষ্টি করে নাই? একটী মাত্র সুস্বাস্থ্য সুপুরুষকে নিয়ে যে কত কত রমণীর ভিতরে অকথনীয় অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে, তা কি অসংযমের কুফলই প্রমাণিত করে না? যে দেশে বা সমাজে পুরুষ বা নারী মাত্রেই সুসংযত ও জিতেন্দ্রিয়, সেই দেশে বা সমাজে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কলহের অবসান আপনা আপনিই হ'য়ে যায়। এই জন্যই যাঁদের প্রদত্ত সৎশিক্ষায়

পুরুষ বা নারীদের ভিতরে সংযমের প্রেরণা জাগ্রত হয়, তাঁদের চেয়ে বড় সমাজহিতৈষী আর কেউ নেই। শাস্ত্রের অসংখ্য অনুশাসনের মধ্যে সেইগুলিই জাতিগঠনের পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক, যেগুলি পুরুষকে দিয়েছে সংযম, নারীকে দিয়েছে ধৈর্য্য আর উভয়কে দিয়েছে দেহের শুচিতা, মনের শুদ্ধতা ও আচরণের নিষ্কলুষতা। তুমি যে জিতেন্দ্রিয় হ'তে চেষ্টা কচ্ছ, এর দ্বারা তুমি সমাজকেই উন্নত ও শান্তিপ্রিয় কর্ব্বার অনুশীলন কচ্ছ। তুমি যে আর একজনকে জিতেন্দ্রিয় হবার জন্য প্রেরণা দিচ্ছ, এর দ্বারা তুমি সমাজকে ব্যাপকতর সেবা প্রদান কচ্ছ। তোমার একাজের জন্য খবরের কাগজে হয়ত তোমার প্রশংসা বেরুবে না। তোমার একাজের জন্য রাষ্ট্র-কর্ণধারেরা হয়ত তোমাকে প্রশংসা কর্ব্বেন না। তোমার কাজের মূল্য হয়ত তারাও বুঝতে চাইবে না, যদের মধ্যে কাজ ক'রে ক'রে তুমি নিঃশেষে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিচ্ছ পরহিতার্থে। কিন্তু তোমার সেবা দেশ-গঠনের কাজে লাগ্‌ছে। এই কাজ এত জরুরী যে, তোমাদের স্বার্থের বিরোধী যাঁদের স্বার্থ, তাঁরা তোমাদের একাজকে নিশ্চয়ই পছন্দের দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাচ্ছেন না।

চরিত্র-আন্দোলন এক বিভীষিকা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একখানা গীতা বালিশের নীচে

রাখ্‌লে কাল তোমাকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কার কথাটা তুমিই ত' আমাকে এই মাত্র বল্‌লে। কিন্তু গীতাখানা দেখে পুলিশের ভয় হবার কথা নয়। গীতাপাঠ তোমাকে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী কচ্ছে। গীতার উপদেশ তোমাকে সংযম ও একাগ্রতার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। সংযম এলেই জাতির ভিতরে ঐক্য আস্‌বে। ঐক্য এলেই দেশব্যাপী অন্যায়ের সমূল উচ্ছেদের সাহস, রুচি ও চেষ্টা আসবে। এদেশ যে ইংরেজের নয়, এটা ইংরাজ জানেন। এদেশটা যে তোমাদের, একথা তোমরা জানো না। কিন্তু আত্মসংযম এলেই তোমাদের স্বার্থলুব্ধ বিক্ষিপ্ত মন অনেক অবান্তর বিষয় থেকে ফিরে তোমার নিজের কাছে ঘুরে আস্‌বে এবং তারই ফলে তোমার দেশকে তুমি চিন্‌তে পার্ব্বে। ইংরেজের ভয় সেইখানেই। নতুবা ইংরেজকে প্রশংসা করার অনেক যুক্তি আছে। ইংরেজ এখনো তোমার গীতা দগ্ধ করেন নি। ইংরাজ কোনো গীতা-ব্যখ্যাতাকে বন্দী ক'রে নিয়ে কারাগারে সর্পসঙ্কুল কূপে নিক্ষেপ ক'রে তার প্রাণহানি ঘটান নি। ইংরেজ তোমাদের কোনো মঠ, মন্দির, আশ্রম দগ্ধ করেন নি, ধ্বংস করেন নি, লুণ্ঠন করেন নি। গীতা তোমার এক আদরণীয় শাস্ত্র ব'লে ইংরেজের মনে কোনো ঈর্ষ্যা বা বিদ্বেষ নেই। তবে তোমার বালিশের শিয়রের নীচে গীতা দেখ্‌লে তোমাকে বিদ্রোহী সন্দেহ কেন করেন? কারণ,

গীতা-পাঠ চরিত্র-বল বৃদ্ধি করে, মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল চিত্ত-বৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের প্রেরণা দেয়। একবার যদি কাম আর ক্রোধ, লোভ আর ভয়,—এইগুলিকে জয় কত্তে পার, তাহ'লে ত' তোমার মনের অনেক বাজে পরিশ্রম ক'মে গেল, তখন ত' তুমি অনায়াসে খোলা চোখে তোমার দেশকে এবং তোমার কর্ত্তব্যকে দেখ্‌তে পাবে, তখন তোমার দেশের কথা ভাববার অবকাশ হবে। তখন তুমি দেশের দুঃখবিদূরণের জন্য মৃত্যুঞ্জয় সঙ্কল্প ক'রে বসতে পার। ভয়টা এখানে। এদেশটা ইংরেজের নয় ব'লেই এদেশকে হারাবার ভয় তাঁদের বেশী। এই দেশটা তোমাদের ব'লেই এদেশের উদ্ধার-চিন্তা তোমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তবে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদের স্বদেশ-ভাবনা একেবারেই ঠুন্‌কো কাচ। তাদের স্বদেশ-সঙ্কল্প উদ্বায়ু বাষ্পের মতন সহজে আকাশে উড়ে যায়, স্থায়ী হয় না।

ন্যূনতম লক্ষ্য স্থির কর

অপর এক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাজই যদি কত্তে হয়, তবে তার একটী টারগেট বা ন্যূনতম লক্ষ্য স্থির ক'রে নিতেই হবে। তারপরে সেই লক্ষ্যের অনুযায়ী তদুচিত আয়োজনে নেমে যেতে হবে। একটা সভার অনুষ্ঠান কর্ব্বে, বেশ ত'। আগে লক্ষ্য স্থির

ক'রে নাও যে, কত হাজার লোকের সমাবেশ সেখানে করা চাইই চাই। দশ হাজার জনতার সমাবেশ করার জন্য যে আয়োজনের আবশ্যকতা, বিশ হাজার জনতার সমাবেশ কত্তে হ'লে আয়োজন তার দ্বিগুণ, ত্রিগুণেরও বেশী হওয়া চাই। মানুষকে সভাস্থলে টেনে আনতে হ'লে কি কি ব্যবস্থার প্রয়োজন, তা' ভাল ক'রে বুঝে নিতে হবে। মানুষেরা দলে দলে এলেন কিন্তু তোমরা বক্তৃতা আরম্ভ কত্তে না কত্তেই তাঁরা ঘরে ফিরতে শুরু কর্ল্লেন,—এইরূপ ঘটনা যদি ঘটে যায়, তবে ত' সমস্ত আয়োজন একেবারেই মিথ্যা হ'য়ে গেল। সুতরাং কি কি সদুপায় অবলম্বন কর্ল্লে, সহস্র সহস্র শ্রোতাকে তোমরা সভাস্থলে আটক ক'রে রাখ্‌তে পার, তার বিষয়টী তোমাদের খুব ভাল ভাবে ভেবে ও বুঝে নিতে হবে। সুরেশ সমাজপতির গুরুগম্ভীর ও সাহিত্য-রসাশ্রিত সুললিত বক্তৃতাধারার সঙ্গে মানুষ ধ'রে রাখবার জন্য রাবীন্দ্রিক নারীনৃত্য-বিলাসটীও জুড়ে দেবে কিনা, দিলে ভাল হয়, না মন্দ হয়, দিলে সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয় কিনা, মৌলিক যেই উদ্দেশ্যটী তোমাদের সভা-সমিতির প্রস্তাবের জনক, এই কথাও ভেবে দেখ্‌তে হবে। বিশ্বনাথ রাও বা চন্দন চৌবের খেয়াল-ধ্রুপদ গানের আমদানী সেখানে করবে কিনা, না কি নরসিংদীর বাউলদের লোকসঙ্গীতের জমায়েৎ কর্ব্বে, এগুলি অবশ্যই ভেবে দেখ্‌বার। যে অনুষ্ঠানটী কত্তে

যাচ্ছ, তার আসল উদ্দেশ্য যা', তা' থেকে একচুলও যদি না স'রে যাও, তাহ'লে হয়ত লোকরঞ্জনী ব্যবস্থা তোমাদের একটু অনিশ্চিত হ'য়ে পড়বে। তবু জান্‌বে, আসল লক্ষ্যে স্থির থাকাই সব চেয়ে বড় কথা এবং তার উপরে ভিত্তি করেই লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করা তোমার পক্ষে পুরুষকার-সম্মত হবে। দশ-হাজার লোক জড় না হয়ে তোমাদের সভায় বরং পাঁচ হাজার লোকই যেন এল, এই পাঁচ হাজার জনের প্রত্যেককে কি ক'রে তোমরা আদর্শের মোহন-বেণু-ধ্বনি দিয়ে সভাস্থলে আটকে রাখতে পার, সেইটীই সর্ব্বাগ্রে দেখা দরকার। লোকাধিক্যকে আমি বড় সফলতা জ্ঞান করি না, যারা এসেছে, তাদের সভাস্থলে আমার প্রতিটি বাক্যোচ্চারণ শোনবার জন্য বেঁধে রাখতে পাচ্ছি কিনা—আমার সফলতা-বিচারের মাপকাঠি এইটী।

সাম্প্রদায়িকতা ও স্বাদেশিকতা

জিজ্ঞাসু বলিলেন,—আমার লক্ষ্য স্বদেশ-মন্ত্র প্রচার, আমার চেষ্টা স্বাদেশিকতার প্রসার।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমারও লক্ষ্য স্বদেশ-মন্ত্র প্রচার, আমারও চেষ্টা স্বাদেশিকতার প্রসার। কিন্তু দেশের মানুষের স্বাদেশিকতা-চিন্তার অপবিত্র বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সাম্প্রদায়িকতা, যে সাম্প্রদায়িকতা এক শ্রেণীর মানুষকে

অপর এক শ্রেণীর মানুষ থেকে সর্ব্বদাই দূরে দূরে সরিয়ে রাখ্ছে। সাম্প্রদায়িকতার অবসান না ঘট্লে স্বাদেশিকতার বিকাশ এক অসাধারণ ব্যাপার। অথবা বল্ব, সাম্প্রদায়িকতা যার দূর হবে না, তার পক্ষে স্বদেশকে ভালবাসা অসম্ভব। আমার আদি ধর্ম্মগুরু বিথেলহামে জন্মেছিলেন ব'লে আমি খ্রীষ্টধর্ম্মাভিমান বশতঃ যদি ভাবতে থাকি যে, ভারত আমার স্বদেশ নয়, আমার সমধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজের সুবৈধ তালুকদারী মাত্র, আমি এদেশের মানুষ নই, অন্য খ্রীষ্টানরা যে যে দেশে বাস কচ্ছে স্বাধীনতার গৌরব নিয়ে, আমি সেই দেশেরই অধিবাসী, তবে আমি ভারতে জন্মলাভ ক'রেও স্বাদেশিকতার চর্চ্চা কর্ব কেমন ক'রে? তোমার আদি ধর্ম্মগুরু আরব দেশে জন্মেছিলেন ব'লে ইসলাম-ধর্ম্মাভিমান বশতঃ তুমি যদি ভাবতে থাক যে, ভারত তোমার স্বদেশ নয়, এটা হিন্দুদের আর বৃক্ষপূজক, প্রেতপূজক, প্রস্তরপূজকদের স্বদেশ, এই দেশটা তোমার সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানদের পদতলে সাত শত বৎসর ধ'রে দাসত্বের কুর্ণিশ কেটেছে, তুমি এ দেশের মানুষ নও, আরব, তুর্কী, পারসিক প্রভৃতি মুসলমানেরা যেই যেই দেশে বাস কচ্ছে স্বাধীন জাতির বিজয়-ধ্বজা উড়িয়ে, তুমি সেই দেশেরই অধিবাসী, সেই কাবুল, বোখারা, গজনী, ইস্তাম্বুল, বসোরা, ইরাক তোমার পূর্ব্বপূরুষদের

জন্মভূমি, তুমি প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দেশের অধিবাসী, তবে তুমি ভারতে জন্মলাভ ক'রেও স্বাদেশিকতার চর্চ্চা করবে কেমন ক'রে? তোমার ধর্ম্ম যদি তোমার দেশকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তবে আর স্বদেশ চর্চ্চা তোমার করা হবে না। ধর্ম্ম যদি স্বাদেশিকতার চর্চ্চাকে তার প্রাপ্য সম্মান দেয়, তা'হলে দেখ্‌বে, তখন আর ধর্ম্মে ধর্ম্মে লড়াই নেই, প্রতিযোগিতা নেই, তিক্ততা নেই। কিন্তু একথা বুঝতে হ'লে আর বুঝাতে হ'লে শক্ত মেরুদণ্ডের মানুষ চাই সর্ব্বাগ্রে। যে বুঝাবে, তারও মেরুদণ্ড শক্ত হওয়া চাই, যাকে বুঝাবে তারও মেরুদণ্ড শক্ত হওয়া চাই।

স্বদেশ-প্রেমের প্রকৃত সাফল্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তুমি বল্‌ছ যে, স্বদেশকে জননী বলতে অনেকের ঘোর আপত্তি। স্বদেশকে মা বল্‌লে পৌত্তলিকতা হবে, আপত্তির এটাই কি প্রকৃত কারণ? না, তা' নয়। স্বদেশকে স্বদেশ ব'লে মনে কত্তে না পারাই এর একমাত্র কারণ। আর, মা যে কি বস্তু তা' স্পষ্ট রূপে বুঝ্‌তে না পারা, এর দ্বিতীয় কারণ। ব্রহ্মাণ্ডের সকল পাপ-পঙ্কিলতার উর্দ্ধে নিজের মনটাকে যে তুলে নিতে পারে নি, সে কখনো চিন্‌বে না যে, মা কি বস্তু। জগতের সকল সম্ভাব্য ও

অসম্ভাব্য কলুষ-কালিমার অতীত প্রদেশে বাস করে মাতৃভাব। এই ভাব কারো ভিতরে জাগ্‌লে সমগ্র বিশ্বময় প্রতিটি প্রকৃতি তার মা হ'য়ে যায়। এগুলি কোনো যুক্তি-তর্কের কথা নয়, এগুলি উপলব্ধির কথা। অব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, কামাসক্ত, পরনারীলুব্ধ কোনো দুর্বৃত্তের কাছে এই উপলব্ধি ধরা দেয় না। ভাগ্যগুণে এই সুমহতী উপলব্ধি যাঁর করামলকবৎ আয়ত্ত হয়, তিনি পৃথিবীর সব নারীতে নিজ মাতাকে দেখেন আর নিজ মাতাতে বিশ্বের সমস্ত নারীকে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর কাছে স্বদেশ তাঁর মাতৃময়ী মূর্ত্তি নিয়ে আবির্ভূতা হন। তাঁর দৃষ্টিতে স্বদেশের প্রত্যেকটী নারী তাঁর নিজের মায়ের সঙ্গে অভিন্না। তারই ফলে তিনি সমগ্র বিশ্ব-ব্যেপে এক মহতী মাতৃশক্তির সন্ধান পান, তাঁর স্নেহরস আস্বাদন করেন এবং জননী, জন্মভূমি ও বিশ্ব এই তিনে একের অনুভূতি পান, এঁদের যে-কোনও একটী এককের ভিতরে তিনকে জানতে পান, বুঝতে পান, দেখ্‌তে পান। প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমের এইখানেই পূর্ণ সাফল্য।

স্বাধীনতা ও সর্ব্বসাধারণ

অপর একটী যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাজের সাফল্য বিজ্ঞাপনের মধ্যেও নেই, আত্মপ্রচারের মধ্যেও নেই। কাজের সাফল্য হচ্ছে মূল

চিন্তাধারাটীর সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের মনের স্বাভাবিক ও আত্যন্তিক সংযোগের মধ্যে। মুষ্টিমেয় কয়েক জনের স্বদেশপ্রেম যতই অকৃত্রিম হোক্ না, জনসাধারণের সামূহিক মনোভাবের সমর্থন তাঁদের পিছনে এসে না দাঁড়ালে তাঁরা প্রাণই শুধু দিয়ে দিতে পার্ব্বেন কিন্তু দেশমাতার দুর্গতি-মোচন কর্ত্তে পার্ব্বেন না। এই জন্যই চিন্তাশীল লোকেরা সার্ব্বিক আন্দোলনের কথা ভাবছেন। কিন্তু সার্ব্বিক আন্দোলন দীর্ঘকাল গোপন থাকতে পারে না, গোপনতা আর সার্ব্বিকতা দুইটী দুই মেরুর জিনিষ। এই কারণেই দেশের মঙ্গলের বিষয়ে একদল লোক বিশেষ ক'রে অহিংসার কথা বারংবার বল্‌ছেন বা বলতে বাধ্য হচ্ছেন। সার্ব্বিক গণ-আন্দোলন যদি সশস্ত্র পথে চলে, তবে তা' হয় ফরাসী বিপ্লবের, নয় আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের রূপ ধারণ করে। গণ-সহযোগ পূর্ণত প্রতিষ্ঠিত না হ'লে সিপাহী-বিদ্রোহ আন্দোলনের মতই বারুদের স্তূপ সগৌরবে গর্জ্জন ক'রে ক'রে কয়েকটী বৎসরের মধ্যেই দীর্ঘকালের জন্য নিঃস্তব্ধ হয়ে যায়। ভারতে সশস্ত্র স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্ভব নয়, এমন কথা মূর্খেরাই ভাবতে পারে, ইংরেজরা ভাবেন না। এজন্যই বাঙ্গালীদিগকে সেনাদলে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না। এজন্যই সৈনিকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষদের মিশতে দেওয়া হয় না। এই জন্যই সৈন্যদিগকে প্রাদেশিকতার ভিত্তিতে বা

ধর্ম্মের ভিত্তিতে আলাদা আলাদা ক'রে রাখার চেষ্টা হয়। কিন্তু ভারতে সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্ভাবনা হ্রাস পেয়ে আছে আমাদের স্বদেশ-চেতনার অভাবেরই দরুণ। সমগ্র ভারতবর্ষকে নিজের জননী ব'লে ভাববার মতন লোক দেশে কত জন আছে? ক্ষণিক স্বার্থ আর স্থানিক সুখসুবিধা, সাম্প্রদায়িক মোড়লী আর ব্যক্তিগত প্রতিপত্তিতে যদি বাধা না পড়ে, তাহ'লে আমরা প্রায় প্রত্যেকেই এক একজন অভারতীয়, সঙ্কীর্ণচেতা, প্রাদেশিকতাবাদী, দুর্ব্বলদৃষ্টি, অস্থিরমতি মানুষ। এমন মানুষেরা কখনো কোনো দেশের স্বাধীনতা আনয়ন করে না, বরং পরাধীনতাকে চিরস্থায়ী করে। যে স্বাধীনতা সর্ব্বসাধারণের জন্য অর্জ্জিত, যে স্বাধীনতা সর্ব্বসাধারণের দ্বারা রক্ষিত, যে স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেকের প্রাণ সমভাবে লালায়িত, সেই স্বাধীনতাই বিজয়লক্ষ্মীর মত সাড়ম্বরে দেশে শুভাগমন করে। চোরের মত সিঁদ কেটে স্বাধীনতা আহরণ করা যায় না। আর, সে ভাবে যদি স্বাধীনতা আসে, তবে তার অনেক দুর্গতি।

কথাগুলি শ্রোতার শ্রুতিসুখকর হইল না, সে একটু বিরক্তি নিয়াই স্থানত্যাগ করিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত মথুর রঞ্জন শীলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ছেলেটী হয়ত সত্যই স্বদেশপ্রেমিক। কিন্তু আমি যে বাবা সকলের মনোরঞ্জন ক'রে কথা বল্‌তে পারি না।

সবাই কি সত্যই অলস

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাদের তুমি একান্ত অলস ব'লে কল্পনা কচ্ছ, আসলে কিন্তু তারা অলস নয়। তারা তাদের পছন্দ-মত কাজে কঠোর শ্রম কত্তে কখনো কুণ্ঠিত হয় না। তোমরা তাদের হাতে তাদের পছন্দ-মত কোনো কাজ দিতে পাচ্ছ না। তাদের পছন্দমত কাজ দিতে তোমার অসুবিধা এই যে, তাহ'লে তোমাকে তোমার নীতিজ্ঞানের মান অবনমিত কত্তে হয়। তোমার দেওয়া কাজ হাতে নিয়ে কাজ কত্তে উৎসাহিত হবার পথে তাদের বাধা এই যে, এ কাজ কত্তে হ'লে তাদের নীতিজ্ঞানকে উন্নয়িত ক'রে নিতে হবে। উচ্চস্তরের নীতিজ্ঞানের উপরে আরোহণ না কর্লে কেউ উচ্চস্তরের কর্ত্তব্য সম্পাদন কত্তে পারে না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তোমার সুস্পষ্ট কর্ত্তব্যই হচ্ছে নীতিজ্ঞানের উচ্চতা বিধানের জন্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অবিরাম অবিশ্রাম কাজ ক'রে যাওয়া। এ কাজে বিশ্রামও যেমন নেই, অবকাশও তেমন নেই। নেই আপোষ রফারও অবসর। দেশবাসীর দেশব্যাপী রুচি-পরিবর্ত্তন ছাড়া তুমি তা'দিগকে কদাচ উন্নততর কাজে যুক্ত বা আগ্রহী কত্তে পার্ব্বে না। অথচ, শ্রমশক্তি তাদের প্রত্যেকেরই আছে। খুব কম লোকই চব্বিশ ঘণ্টা শুয়ে, বসে, ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয় বা দিতে পারে। আসলে

অলস এরা প্রায় কেহই নয়, এদের হাতে আমরা কাজ তুলে দিতে পাচ্ছি না।

বাজাও পরার্থপরতার মোহন-বংশী

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—একের জন্য অপরের প্রাণ কাঁদে, একথা ত' এক স্বর্গীয় বারতা। দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ অপরকে কাঁদিয়ে পরপীড়নের দ্বারা নিজের অবস্থার উন্নতি সাধন ক'রে উল্লসিত হয়। অধিকাংশ মানুষের এই অপচার সত্ত্বেও দুই একটি করুণ হৃদয় দেবতার প্রাণ দীন-দুঃখী-আতুরের জন্য, অক্ষম-অবশ-দুর্ব্বলের জন্য কাঁদে, একথা শুনলে দেবতাদের চোখে আনন্দের অশ্রুধারা বানের জলের মত খরস্রোতে বইতে থাকে। আমরা কেউ নিজেদের জন্য যেন না বাঁচি, নিজেদের জন্য না মরি, আমাদের মরা-বাঁচা সব যেন পরের জন্য হয়,—এইটীই প্রকৃত দেব-মনের বাসনা। অবিরাম প্রচারের দ্বারা, অকপট দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনের দ্বারা, জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণের দ্বারা চারদিকের মানুষের মনে যদি পরার্থপরতার ভাব জাগ্রত ক'রে দিতে পার, তবে দেখ্‌বে, তা'দিগকে কোনও দুঃসাধ্য কর্ম্মেই প্রবর্ত্তিত ক'রে দিতে কোনো বাধার কারণ থাক্‌বে না। কাণে কাণে প্রাণে প্রাণে বাজাও নিয়ত পরার্থপরতার মোহন বংশী,—দেখো, যমুনা উজান বইতে দেরী হবে না।

কর্ম্মময় ভারত ও ধ্যানময় ভারত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেহ দ্বারা যখন কাজ কত্তে অক্ষম হও, তখন বাক্য দ্বারা হ'লেও কাজ কর। বাক্য দ্বারাও যখন কাজ কত্তে অক্ষম হচ্ছ, তখন মনের দ্বারা কর কাজ। চিন্তাশক্তির দ্বারা সূক্ষ্ম ভাবে যে-কাজ করা যায় আর যে-ভাবে করা যায়, সে কাজ এবং তেমন কাজ অনেক সময়ে বাক্য বা দেহ দ্বারা করা সম্ভব হয় না। আবার, একথাও জানবে যে, অসংখ্য লোক যদি মনে মনে একই সময়ে একটী মাত্র চিন্তারই বিরামহীন অনুশীলন চালাতে থাকে, তবে তাতে নিখিল-ভুবন-ব্যাপী এমন এক অদৃশ্য শক্তির সৃষ্টি হয়, যার আবির্ভাব বাস্তব জগতের অভাবনীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে না ঘটেই পারে না। যখন দেখ্‌বে যে, অলস লোকগুলিকে কোনও কাজেই লাগাতে পাচ্ছ না, জোর ক'রে ধরে আনলেও হাতের মুঠি থেকে পিছ্‌লে ছিট্‌কে চলে যাচ্ছে, তখন তাদের চিন্তার জগতে প্রবেশ করার জন্য চেষ্টা শুরু কর। এক ভাবের ভাবুকেরা একত্র মিলিত হ'য়ে মৌন প্রয়াসের দ্বারা চিন্তার প্রবল স্রোত উৎপাদন ক'রে তাকেই দিগ্‌বিদিকে প্রবাহিত ক'রে যেতে চেষ্টা কত্তে থাক। এই সকল ক্ষেত্রে কর্ম্মের শক্তির চেয়েও সুনির্ব্বাচিত বাক্যের শক্তি অনেক বেশী, আর বাক্যের শক্তির

চেয়েও ধ্যানের শক্তি আরও বেশী। কর্ম্মময় ভারত আমার কাম্য ধন, কিন্তু ধ্যানময় ভারত তার চেয়ে অধিকতর কাম্য।

উদার সরল মন লইয়া চল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা অন্যকে কর্ম্মোদ্যত দেখ্‌লে নিজেরা ঝাঁপিয়ে এসে কাজে নামেন, কিন্তু কাজ করা তাদের আসল উদ্দেশ্য নয়। তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্য লোকেরা যে আপ্রাণ শ্রম স্বীকার ক'রে কাজটুকুকে এগিয়ে দিচ্ছেন, তার যশটুকু নিজের জন্য আহরণ করা। এঁরা খাঁটী কর্ম্মী নয়। এঁরা মেকী মাল। তবু এঁদের অবজ্ঞা কর্ব্বে না। বরং চেষ্টা কর্ব্বে এঁদের মনের উপরে তোমাদের তীব্র চিন্তার সৎফলটুকু যাতে প্রতিবিম্বিত, প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। দুদিন একটু হুজুগের কাজকর্ম্ম ক'রে বেশ নাম-যশ নিয়ে একজন হঠাৎ চম্পট দিলেন ব'লে তাঁর উপরে ক্রোধ, বিরক্তি বা অভিমান পোষণ ক'রো না। তাঁর নিন্দাও ক'রো না, সমালোচনাও কত্তে বসো না। তিনি হঠাৎ এসে যোগ দেওয়াতে হয়ত কিছু শুভ হয়েছে, তিনি হঠাৎ চলে যাওয়াতে হয়ত কিছু অশুভ হয়েছে। শুভটা বেশী না অশুভটা বেশী, এ নিয়ে হিসাব কত্তে বসো না। এসব ঘটা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক ব্যাপারকে নিতান্ত স্বাভাবিক আগ্রহ ও স্বাভাবিক উদাসীনতা নিয়ে সমদৃষ্টিতে দেখে যেয়ো। তুমি

যদি অনিন্দক থাকতে পার, তাহ'লে পরিণামে দেখ্‌তে পাবে যে, লাভের দিকটাই ওজনে ভারী, ক্ষতির দিকটা তার বিপরীত। উদার সরল মন নিয়ে চলো, দেখ্‌বে, দুঃখ কম পাবে, দুঃখ কম দেবে।

সঙ্ঘে শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একাকী কাজ ক'রে মানুষ কতটা এগুতে পারে? কর্ম্মযজ্ঞে অনেক লোকের একত্র মিলন একান্তই আবশ্যক। একের শক্তি অপরের শক্তির সঙ্গে মিলিয়ে জনকল্যাণ-কর্ম্মে তার প্রয়োগের অনুশীলন খুব বড় রকমের একটা যজ্ঞ। ছোট ছোট উপনদীর জল আস্তে আস্তে পরস্পরের সঙ্গে মিলে যেমন হঠাৎ একদিন একটা বিরাট গঙ্গায়, বিরাট ব্রহ্মপুত্রে বা বিরাট গোদাবরীতে বা বিরাট নর্ম্মদায় পরিণত হয়, এ'ও ঠিক তাই, জান্‌বে। এক মানুষের শক্তিকে অপর মানুষের শক্তির সঙ্গে মিলানোর সাধনা এই জন্যই মানব-জাতির সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীক জীবনে এবং স্থলবিশেষে আধ্যাত্মিক জীবনেও এক মহাশুভ ঘটনা। কার সঙ্গে কাকে মিলান যায়, লক্ষ্য হওয়া উচিত তা। কার কাছ থেকে কাকে দূরে সরান যায়, এই বুদ্ধি ক্ষীণজীবীর বা স্বার্থপরের হ'লে হ'তে পারে। পৃথিবীর সব মহারথেরা নিজ নিজ বুদ্ধিবিদ্যানুযায়ী মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলিত ক'রেই

সংঘশক্তির সৃষ্টি করেছেন। কথায় বলে,—সঙ্ঘে শক্তিঃ কলৌ যুগে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি সব যুগেই সঙ্ঘবদ্ধতায়ই শক্তি, বিচ্ছিন্নতায়ই দুর্ব্বলতা ও পরাভব।

সমস্যা থাকিবেই

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষের সমস্যার অন্তও নাই, অবধিও নাই। যতক্ষণ সে বিবেক-বুদ্ধি-সমন্বিত একটী চিন্তাশীল জীব, ততক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্তে একটা না একটা সমস্যা তার হয় সহচর হবে, নয় প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়াবে। দুই বন্ধুর প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাদের একই দিনে বিবাহ হবে, একটী আসরে বিবাহের মন্ত্রপাঠ হবে, একই পুরোহিত শুভকর্ম্ম করাবেন, একই শানাইওয়ালা শানাই বাজাবে ইত্যাদি। কার্য্যকালে তা হ'লেও কিন্তু একটী বিভ্রাট সকলের অজ্ঞাতসারে ঘ'টে গেল। বরকন্যা বাসরশয়নে যখন গেলেন, তখন এক বরের কনে অন্য বরের কনে হ'য়ে গেলেন। এই ভুলটা কারো চক্ষে তখন পড়ল না, উৎসবের হৈ-হুল্লোড়ে কি যে একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল। পরদিন ঊষাগমে কন্যারা প্রথম অনুভব কর্ল্ল যে, তারা নিজ নিজ স্বামীর কাছে রাত্রি যাপন করে নি, যাঁর সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করে বিয়ে হয়েছিল, তাঁর কাছে অন্য কনেটী গিয়েছে। কি সর্ব্বনাশ! এমন

সাংঘাতিক কথা কে জীবনে নিজের মুখে প্রকাশ ক'রে স্বীকার কত্তে পারে, বল ত'! বরেরা বুঝলেন অনেক পরে। কিন্তু ততক্ষণে দুই কন্যাপক্ষের আত্মীয়দের কাছে বিপদটী পরিষ্কার-রূপে ধরা পড়েছে। এক বর বল্লেন,—আসল বিবাহ ত' নিশাযাপনে। মন্ত্রে-ফন্ত্রে কি আসে যায়? সুতরাং যা' হয়েছে, ঠিকই হয়েছে। আমি আমার বউ ছাড়ব না। অপর বর বল্লেন,—সর্ব্বশাস্ত্র মন্থন ক'রে বৈদিক আচার্য্যেরা বিবাহের যে পবিত্র বিধি আবিষ্কার করেছেন, তার মতানুবর্ত্তী হওয়াটাই আসল বিবাহ, পরের বউ ভ্রমক্রমে আমার ঘরে এক রাত্রি বাস ক'রে গেছে ব'লেই সে আমার স্ত্রী হবে কেন? সে পরস্ত্রী। ভ্রমক্রমে পরস্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে গেছে ব'লেই চিরকাল তার সংসর্গকে ধন্য ব'লে মনে কত্তে হবে, এমন বিচারবুদ্ধি আমার নেই। আমার বউ আমাকে ফিরিয়ে দাও, আমি তাকেই আমার ঘরের লক্ষ্মী কর্ব্ব। লোকটীর মন নিশ্চয়ই উদার, কিন্তু তার সমাজ তাকে এজন্য শাসন না ক'রে ছাড়বে কি? যা' ঘ'টে গেছে, তাই মেনে নাও, এই কথা যদি দুটী বরই সমস্বরে বলে, তবে ঐ দিক দিয়ে একটা সমাধান সত্যই হ'য়ে যায় কিন্তু বিবাহে বরই একমাত্র প্রধান ব্যক্তি নন, স্ত্রী যে অপ্রধান নন, এইটীও মনে রাখ্‌তে হবে। একটী স্ত্রী হয়ত ব'লে বসবেন, মুখচন্দ্রিকার সময় বা মন্ত্র পড়ার সময় এক রকম মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলাম, কে যে

বর, তা' ঠাওরাতেও পারি নাই। বরকে সত্য-রূপে চিনলাম ত' নিশাযাপনের মাধ্যমে। আমি তাঁকেই প্রকৃত ও সঙ্গত বর ব'লে গ্রহণ কচ্ছি, তোমরা তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না। অপর স্ত্রীটী হয়ত বল্‌বেন,—বেদমন্ত্রের মধুরধ্বনিতে মন যখন আকুলিত, তখন আমি হৃদয়ং মম ব'লে যাঁর কথা উচ্চারণ করেছি, হঠাৎ ভুলে অন্য রকম বিভ্রাট হ'য়ে যাওয়াতে, তিনি কখনো নস্যাৎ হ'তে পারেন না। মন্ত্রপাঠ যাঁর সঙ্গে হয়েছে, বর আমার তিনিই। ইংরিজি মতে Consummation বা সহবাস-মিলন না ঘটা পর্য্যন্ত নাকি বিবাহ ঠিক ঠিক হয় না। ইসলামি মতে তালাক দেওয়া স্ত্রী যতক্ষণ অন্য একজনের দ্বারা বিবাহিত হওয়ার পরে শারীরিক সম্বন্ধে অঙ্গীকৃত না হয়েছে, ততক্ষণ পুনরায় তালাক দিলে তা' শুদ্ধ হয় না, শতবার শত জনে বিয়ে ক'রে তালাক দিলেও আর পূর্ব্ব স্বামীর সঙ্গে বিবাহিত হওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সংস্কারগত রুচি বিভিন্ন রকমের। মানুষের মনে যতক্ষণ রুচির বিভিন্নতা থাক্‌বে, ততক্ষণ সংস্কারের প্রভাব ও বৈচিত্র্য থাক্‌বেই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন জনের সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হবেই হবে। এর হাত থেকে কারো উদ্ধার নেই। যতক্ষণ জীবিত আছ, ততক্ষণ একটা না একটা সমস্যা তোমার থাকবেই। সেই সমস্যাই জীবনের সব চেয়ে মারাত্মক

সমস্যা, যে সমস্যার সংবাদ অপরের কাছে বলা যায় না, যার সমাধানের জন্য কারো কোনো বুদ্ধি, পরামর্শ বা উপদেশ নেওয়া যায় না, যার বিষয় প্রকাশ ক'রে ব'লে কারো কাছে দুদণ্ড নীরবে কেঁদে মনের বেদনা হাল্কা করা যায় না। হালফিল আধুনিক ইঙ্গবঙ্গ-মহাজনেরা সস্ত্রীক নাইট-ক্লাবে বাসনাসক্ত থেকে প্রমত্ত মন ও নিদ্রাতুর চক্ষু নিয়ে যখন বাড়ী ফিরবার জন্য নিজ নিজ মোটরে ষ্টার্ট দেন, তখন হয়ত জানেনও না যে, ভুল ক'রে তাঁর স্ত্রীকে তিনি অন্য একজনের হেফাজতে ফেলে এসে পরের একটী প্রমত্তা পত্নীকে নিজের গাড়ীতে তুলে নিয়েছেন। নেশা যখন ছুটে যায়, তখন হঠাৎ এই সব স্ত্রীলোকদের মনের ভিতরে কি এমন কোনও সূর্য্যের আলোকরেখা ফোটে না, যে দেখিয়ে দেয় যে, তুমি সমস্যায় প'ড়ে গেছ, সাবধান হও এবং দৃঢ়হস্তে এখনি একটা সমাধানের সূত্র ধর?

ভারতীয় সমস্যার সমাধান ভারতীয়ত্বে

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কথাটা শুনে আঁত্কে উঠলে ত'? স্বদেশপ্রেমের যে বন্যা দেখ্‌তে পাচ্ছ, তার পশ্চাতে একটা প্রেতের কালো

হাত স্পষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। মুখের বুলি যার যেমনই হোক্, অধিকাংশ দেশনেতার জীবন হচ্ছে অভারতীয় আদর্শে গঠিত। এঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা কত্তে কুণ্ঠিত হন না যে, ত্যাগ কখনো একটা জাতির আদর্শ হ'তে পারে না, ভোগই মনুষ্যমাত্রের একমাত্র আদর্শ এবং তারই অনুসরণে জাতির ক্রমোন্নতি হবে। এঁরা মদ্যপানকে মনে করেন স্বাস্থ্যরক্ষা, পরস্ত্রী-প্রীণনকে মনে করেন শিভাল্‌রি, বড় বড় কথা ব'লে কিছুমাত্র কাজ না করাকে মনে করেন প্রচণ্ড বাহাদুরী। সুদীর্ঘকাল মোগল-পাঠানের অধীন থেকে এবং প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর কাল ইংরেজের পদলেহন ক'রে আমরা এইটুকুই শিখেছি যে, রাজার জাতিকে ঘৃণা করার নামই স্বদেশপ্রেম এবং রাজার জাতির আচরণ ও আদব-কায়দাকে নকল করাই হচ্ছে সভ্যতা। ব্রহ্মচর্য্যকে এরা বিদ্রূপ করে, পরহিতার্থে জীবনধারণকে এরা ঠাট্টা করে, সর্ব্বজীবে হিতবুদ্ধি নিয়ে মহৎ কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করাকে এরা বোকামি মনে করে। অনেক লোক যেখানে জাগ্রত প্রতিভার মহৎ সঙ্কল্পের মন্ত্রবাক্য উচ্চারণ কচ্ছে সরবে, এঁরা সেখানে যান হঠাৎ নেতা হ'য়ে পড়ার জন্য। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ষাট পঁয়ষট্টি পয়েন্ট টাইপে নিজেদের নাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ফটো ছাপা হ'য়ে গেলেই এঁদের তপস্যায় সিদ্ধি হ'ল। লক্ষ লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়ে সংবাদপত্রগুলিকে খোশ-খেয়ালের গোলাম ক'রে রাখাই এঁদের মহত্তম কৃতিত্ব। জাতির সমগ্র

সত্তা জাগ্‌ল না, জাতির অজগর-তুল্য বিরাট দেহ মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়ে রইল কিন্তু এঁরা জাতির প্রতিনিধি-হিসাবে জাতির ভাগ্য ক্রয় কর্ল্লেন, জাতির ভাগ্য বিক্রয় কর্ল্লেন, এই হবে সম্ভাব্য ভবিতব্য। আমরা ডিমোক্রেসি ব'লে চীৎকার করি ডিমোক্রেসিকে ভালবাসি ব'লে নয়, ইংরেজেরা ওটা পছন্দ করে ব'লে। আমরা ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস চাই এজন্য নয় যে, এতে দেশের কল্যাণ হবে, পরন্তু ইংরেজরা ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাসকে একটা অমূল্য সম্মান ব'লে বর্ণনা করেছে ব'লে। আমাদের নিজস্ব কোনও বস্তুর প্রতি আমাদের মায়া নেই, মমতা নেই, আকর্ষণ নেই, শ্রদ্ধা নেই, আমরা আমাদের শাস্ত্রকে চিনি, আমাদের কবিকে, দার্শনিককে চিনি, মাত্র তখন, যখন ওরা চিন্‌তে আরম্ভ করে। আত্মশ্রদ্ধাহীন এমন যে পরানুকারী জাতি, স্বাধীনতা তারা সহজে লাভ কত্তে পারে না এবং স্বাধীনতা লাভ দৈবাৎ হ'য়ে গেলেও তারা তার অসদ্‌ব্যবহার করে। ভবিষ্যদ্‌বাণী ক'রে রাখছি, তোমাদের অবস্থা শোচনীয়তম ক'রে তোলবার জন্য যারা প্রধান উপলক্ষ্য হবে, তারা বিদেশ থেকে আসবে না, জন্মাবে বা জন্মেছে তোমাদের এই পুণ্যময় দেশের তীর্থময়ী মৃত্তিকাতেই। যতক্ষণ আমরা নিজেদের জাতীয় আদর্শে সঞ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিপদের সম্ভাবনা থেকে আমাদিগকে কেউ কদাচ মুক্ত কত্তে পার্ব্বে না। ভারতের সর্ব্বজাতীয় সমস্যা সমাধান হবে আমাদের প্রকৃত

ভারতীয়ত্বের সহায়তায়, অন্য কিছু দিয়ে নয়। ভণ্ডামি দিয়ে নয়, গুণ্ডামি দিয়ে নয়, কথার যাদুবিদ্যা দিয়ে নয়, উৎকোচের মহোৎসব দিয়ে নয়।

ধর্ম্ম ও রাজনীতি

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্ম আর রাজনীতি, এই দুইটী জিনিষের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক কি হওয়া উচিত, একটী দৃষ্টান্ত দিলে তা' হয়ত তোমার বুঝতে সুবিধা হবে। আলোর দীপ্তি আছে, তাপ আছে। দীপ্তিকে অনুভব করি চক্ষু দিয়ে, তাপকে অনুভব করি চর্ম্ম দিয়ে। দর্শনেন্দ্রিয় যে বস্তু সম্পর্কে ঔজ্জ্বল্যের করল আস্বাদন, স্পর্শেন্দ্রিয় সেই বস্তু সম্পর্কে তাপের কর্ল্ল আস্বাদন। অথচ আলো আর তাপ কিন্তু মূলত বস্তুত এক। নিজের উদরের ক্ষুধার ওজনে যখন মানুষ দেশ ও জগৎকে বুঝতে চায়, তখন সে হয় রাজনীতিক। নিজের অন্তরের শাশ্বতী তৃষ্ণার মুখপানে তাকিয়ে সে যখন দেশ ও জগৎকে বুঝতে চায়, তখন সে হয় ধার্ম্মিক। উদর তাকে ভাবতে বাধ্য করে, দেশের উৎপাদন কি, সরবরাহ কি, কেন মানুষ প্রাপ্য বস্তু সহজে পায় না, কেন সে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অন্তরের শাশ্বতী পিপাসা তাকে অন্য কোটি কোটি অন্তরের আরাধ্য ধনের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেয় এবং

এর ফলে অনেক সময়ে সে সমগ্র জগতের বা কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বিগত আগত অনাগত প্রত্যেকটী প্রাণের সঙ্গে নিজের প্রাণের সম্বন্ধ, সঙ্গতি ও নৈকট্য বা অভেদত্ব আস্বাদন করে।

রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ কেউ বলেন, যাঁরা রাজনীতি করেন, তাদের ধর্ম্মচর্চ্চা করার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু এই দাবীটী সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। উদরের ক্ষুধা আছে ব'লেই কেউ তার প্রাণের ক্ষুধার কথা ভাববে না, এ হ'তে পারে না। কেউ কেউ বলেন, যাঁরা ধর্ম্মচর্য্যা করেন, তাঁদের রাজনীতি করা উচিত নয়। আমার মতে এই ঔচিত্যানৌচিত্যের প্রকৃত নির্দ্ধারক হবেন তিনি নিজে, যিনি ধর্ম্মরত হয়েও রাজনীতি কত্তে আগ্রহী। তবে একথা সত্য যে, রাজনীতি মূলত সুবিধাবাদের নীতি, ঘটনাবলির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর নীতি ও রীতির পরিবর্ত্তন অতি দ্রুত তালে ঘ'টে থাকে। এই পরিবর্ত্তনপ্রিয়তার মধ্যে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেবার কপটতাকে আশ্রয় করবার, অসত্যের জয়ধ্বনি দেবার এত এত অবসর ঘ'টে থাকে যে, স্বভাবতই নিরীহ স্বভাবের ধার্ম্মিক ব্যক্তি এমন রাজনীতির চর্চ্চা কত্তে সাহস পাবেন না। সাহস যদি বা কেউ সঞ্চয় কত্তে পারেন, তবে

তাঁর আবার রুচিতে বাঁধবে। বলা চলে যে, এসব স্থলে ধর্ম্মে আর রাজনীতিতে প্রীতির বন্ধন বা উদ্বাহের গাঁটছড়া বাঁধা অসাধ্য ব্যাপার।

অধার্ম্মিকের হাতে রাজনীতি পড়িলে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অধার্ম্মিকের হাতে রাজনৈতিক মহানায়কের রাজদণ্ড পড়লে তিনি নিজের চরিত্র-ভ্রংশতার দরুণ সাময়িক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুলের দ্বারাও সমগ্র জাতির সুদীর্ঘকালের দুর্ভাগ্য রচনা কত্তে পারেন। রাজনীতির পথে মানুষ সহজে প্রতিষ্ঠা পায়। এজন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর আর তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিভাগুলি এই রাস্তায় বেশী হাটাচলা করে। এদের যদি আবার চরিত্রবল না থাকে দৃঢ়, তবে এঁরা এক একটা কাণ্ড ক'রে দেশের সমস্ত মঙ্গলকে নস্যাৎ ক'রে দিতে পারেন। এই জন্যই বোধ হয় ডিজরেলি বলেছিলেন,—Politics is the last resort of a scoundrel. সমগ্র দেশব্যাপী নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনের চেষ্টাই হচ্ছে প্রকৃত দেশকল্যাণ। কেননা, এই কাজটী কত্তে পারলে মানুষের রাজনৈতিক জীবন থেকেও পাপ, অনাচার, অবিচার, অবিবেক ও দুর্নীতি দূর হ'য়ে যাবে। পুলিশের ঘুষ খাওয়া কে বন্ধ কত্তে পারে? সদ্‌গুরু তা' পারেন কিন্তু মাত্র দুই চারিটি

বিরল ক্ষেত্রে পুলিশের লোকেরা প্রকৃত সদ্গুরুর আশ্রয় পায়। কিন্তু দেশের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা যদি নিজে সৎ ও সাধু-স্বভাব হন, তাহ'লে অনুজ্ঞার বলে আর দৃষ্টান্তের শক্তিতে পুলিশকে, সাব-রেজেষ্টারী অফিসের কেরাণীদিগকে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের আমলাদিগকে আর রেলের টিকিট চেকারদিগকে ঘুষ নেওয়া থেকে রক্ষা কত্তে পারেন। কিন্তু সেই চরিত্রের সাধনা আমরা কচ্ছি কিনা, এস না আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বুকেই টোকা দিয়ে সে প্রশ্নটী নিজেদের করি। অধার্ম্মিক ব্যক্তি যখন রাজশক্তি দখল করে, তখন সে-ই হয় দেশের পাপিষ্ঠতম শত্রু।

যত সাধু, তত শ্রেণী

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— সাধু-সন্তদের মধ্যে যে কত রকমের শ্রেণী আছে, তার ইয়ত্তা নেই। এক হিসাবে একথা বলা চলে যে, যত জন সাধু, ততগুলি সাধুর শ্রেণী এই জগতে আছে। তোমার হাতের পাঁচটী আঙ্গুল যেমন এক রকম নয়, একই মঠের পাঁচটী সাধুও ঠিক তেমনি এক রকম নন। প্রত্যেকের রুচি আলাদা, প্রকৃতি আলাদা, দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা, সুতরাং মানুষের সম্পর্কে তাঁদের সম্পর্ক-বোধ বা কর্ত্তব্যের দায়ও আলাদা। অনেক সাধুই অল্পবিস্তর পরোপকার করেন। একজন ডাক্তার বা

কবিরাজ নিতান্ত কৃপণ-স্বভাবের হ'লেও যেমন নিজের অজ্ঞাতে অনেক লোকের উপকার করেন, ঠিক তেমনি একজন সাধুও নিজের অজ্ঞাতসারে মানুষের অনেক উপকার ক'রে থাকেন। সাধু নামে যাঁরা পরিচিত নন, এমন লোকেরাও অনেক সময়ে তা' করেন। করেন তাঁরা নিজেরা মানুষ ব'লেই, মানবিকতা তাঁদের অনেক সৎকাজ করিয়ে নেয়। সাধু নামে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা সবাই অপদার্থ, বর্ব্বর, একথা বলাও যেমন ভুল হবে, তেমন যত সাধু যত স্থানে আছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই পরোপকারী মহাজন, কেউ আত্মসেবার সুযোগ পাবার জন্য সাধু হন নি, একথা বলাও তেমন ভুল হবে। কোথাও একজন সাধু নামে পরিচিত ব্যক্তি ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম করেছেন ব'লে সমগ্র সাধু-সমাজকে তুমি গাল দিতে পার না। কেউ একজন সাধুদের মত চলেন বা বলেন ব'লেই তাঁকে তোমাদের শ্মশান-সৎকার-সমিতির গাড়ী ঠেলতে হবে, এই জিদ্ ভাল নয়। বিশ্বজনের প্রতি যার মমতা এসেছে, সে নিজের শক্তি-সামর্থ্য-রুচি অনুযায়ী জীবসেবা করুক, এই স্বাধীনতা তাকে নিশ্চয়ই দিতে হবে।

কুমারীর নিকট প্রেমপত্র

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মেয়েটী বুদ্ধিমতী নিশ্চয়ই এবং খুব সম্ভবত মহৎ ভাবে

অনুপ্রাণিতা। নতুবা তুমি তার প্রতি আকৃষ্ট হ'তে পাত্তে না। কিন্তু অন্তরের প্রেম নিবেদন ক'রে একটী কুমারী মেয়েকে তুমি পত্র লিখ্‌বে, আর সেই কথাটা আমি প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে বিচার কর্ব্ব, এটা কখনো হ'তে পারে না। কুমারী তার প্রাগ্‌বিবাহিত জীবন-কালটুকু একান্ত ভাবেই তার পিতামাতার আশ্রিতা, রক্ষণীয়া ও প্রতিপাল্যা। তার কাছে প্রেমের ডালি নিয়ে তুমি সোজাসুজি হাজির হবে, এটা এদেশের সজ্জন-সম্মত রীতি নয়। তুমি অন্য দশ দিকে যথেষ্ট প্রশংসনীয় ব্যক্তি হ'তে পার কিন্তু তোমার এই কাজকে আমি কদাচ প্রশংসা ত' কত্তে পার্ব্বই না, এমনকি বরদাস্ত কত্তেও আমি অক্ষম। তুমি কি এর ভবিষ্যৎ ফলাফল ভেবে দেখেছ? হয়ত এই মেয়েটীর বিবাহ ভবিষ্যতে অন্য স্থানেই হ'য়ে গেল। তোমার সঙ্গে হ'য়ে উঠ্‌ল না। কিন্তু তোমার প্রেম-পত্রগুলি তার মনে তোমার সম্পর্কে যদি কোনো বিশেষ অনুভূতি জাগিয়ে থাকে, তবে সেই মানসিক বিকার তাকে, তার সমগ্র ভাবী জীবনকে অসম্পূর্ণ ও বিষাক্ত ক'রে দিতে পারে। একটী কুমারীকে ধর্ষণ করা যতখানি অপরাধজনক, তার প্রতি শারীরিক অসৎ ব্যবহার না ক'রেও তার মনকে এমন একজনের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট করা তার চেয়ে কিছু কম অপরাধ নয়, যার সঙ্গে সমাজ-সম্মত ভাবে তার বিবাহ হ'ল না, হ'তে পার্ল্ল না বা হ'তে পারে না। মেয়েদের তোমরা

মূল্যহীন খোলামকুচি ব'লে জ্ঞান ক'রো না যে, সবলে বুট পায়ে মড়মড়িয়ে ভেঙ্গে দিয়ে চ'লে যাওয়া যায়।

আদর্শের ধারাবাহিকতা চাই

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার স্বদেশানুগত্যে তোমার নিজের হয়ত এক কণাও সন্দেহ নেই কিন্তু যখন ঠিক প্রয়োজনীয় মুহূর্ত্তটী আস্‌বে, তখন বিনা চেষ্টাতেই এবং কোনো গাণিতিক যোগ-বিয়োগ না ক'রেই নিষ্করুণ ঘটনা দুর্ব্বার ভাবে প্রমাণ ক'রে দেবে যে, তুমি বাস্তবে কতটুকু স্বদেশানুরাগী আর কতটুকু সুযোগ-সন্ধানী বা time-server। সুদূর লক্ষ্যের পানে প্রখর দৃষ্টি রেখে স্থির পায়ে দুর্গম পথ আজীবন নিষ্ঠায় চলতে পারার মতন বীর-হৃদয় ধৈর্য্যশীল কর্ম্মীরই আজ প্রয়োজন। স্বার্থ যখন মোহন বেশ ধারণ ক'রে বিলোল কটাক্ষ হান্‌তে থাক্‌বে, তখন অনেক উৎসর্গীকৃত-জীবন আদর্শ বীর-পুরুষই হয়ত তুচ্ছ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য অনায়াসে আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়ে ভাবতে বসবে,—"পৃথিবীর লোক শতকরা নিরানব্বই জনই ত' বোকা, ওরা কি ক'রে বুঝবে যে, আমি কোন্ কৌশলে কোন্ স্বার্থটীকে হাসিল ক'রে নিলাম।" চোর-জুয়াচোরেরা হবে রাজা, সেনাপতি, মন্ত্রী ও কোটাল। ঘুষখোর

দৈত্যেরা হবে ধর্ম্মাধিকরণের বিচারক। নরহন্তা নারীখাদক, দুরন্ত পাপিষ্ঠেরা হবে শান্তিরক্ষার কর্ত্তা এবং সর্ব্বসাধারণের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। তোমার আদর্শবাদে এবং আদর্শানুসরণে যদি চালাকীর ভেজাল থাকে, তবে এই দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা পাবার কোনো উপায় নেই। তুমি নিজে আদর্শবান, এই কথাটুকুই যথেষ্ট নয়। এই আদর্শবাদকে জীবন্ত কর্ম্মান্দোলনের মধ্য দিয়ে পরবর্ত্তী কর্ম্মীদের মনেও নিয়ত সঞ্চারিত ও প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

ভারতের স্বদেশ-প্রেম

অপর এক যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইংরেজকে শত্রু ব'লে মনে কচ্ছ তুমি কি জন্য? তোমার শত্রু ত' তুমি নিজে। ইংরেজ এদেশে ব্যবসা কত্তে এসেছিলেন। বাণিজ্যের মানে হচ্ছে, অল্প কিছু দিয়ে তার বিনিময়ে বেশী কিছু গ্রহণ ক'রে দেশে পাঠানো। সাগরবেষ্টিত দেশের লোক নিজের উৎপাদনে নিজেকে বাঁচাতে পারে না, তাকে এজন্য বাণিজ্য কত্তেই হয়। বাণিজ্য কত্তে এসে তাঁরা দেখ্‌লেন, তোমরা নিজেরা নিজেরা কলহ কচ্ছ। আবার তোমরা নিজের দেশের লোকদের জব্দ করার জন্য এই বণিকদের সহায়তাও চাচ্ছ। তাঁরা বাণিজ্যের সুবিধা হবে বিবেচনা ক'রে কাউকে বা সাহায্য কাউকে বা বিরোধিতা

দিতে লাগলেন। ঘটনাচক্রে এবং তোমাদেরই দুর্ব্বুদ্ধির দোষে বাণিজ্যের মানদণ্ডধারীরা এ দেশের রাজদণ্ডের মালিক হ'য়ে গেলেন। চূড়ান্ত দোষটা ত' তোমাদের। সেই দোষ সংশোধনের দিকে যাতে তোমরা দৃষ্টি দাও, তার জন্যই ত' দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনীষীরা তোমাদের নানা উপদেশ দিচ্ছেন। ইংরাজ তোমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি নষ্ট করেছে, একথা ভুল। ইংরেজি-শিক্ষা তোমরা নিজেরা গরজ ক'রে গ্রহণ করেছ। ইংরেজি-আনা জীবন-যাপনের দিকে তোমরা নিজের গরজে এগিয়ে গেছ। ইংরেজ কখনো তোমার ঘরে অগ্নি-সংযোগ ক'রে ভীতি-প্রদর্শন করে নি যে, হয় বিলাতী কায়দায় চল, নতুবা মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ কর। বরং ইংরেজ তোমাদের প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষার জন্য চেষ্টা করেছেন। ইংরেজ মনীষীরা অনেকে তোমাদের প্রাচীন গৌরবের কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। ইংরেজ এদেশে ততকাল নিশ্চয়ই থাকবার চেষ্টা কর্ব্বে, যতকাল এদেশে বাণিজ্য ক'রে নিজ দেশে বিপুল অর্থ প্রেরণের তাদের পথ খোলা থাক্‌বে। ইংরেজকে শত্রু ভাবে না দেখে সমগ্র বিশ্বের মানব-জাতিরই তারা একটা অংশ জ্ঞান ক'রে তাঁদের প্রতি প্রসন্ন নয়নে তাকাও এবং তাঁদের সদ্‌গুণগুলি কিসে নিজেদের জীবনে আনয়ন কত্তে পার, তার বিষয়ে চেষ্টাপরায়ণ হও। স্বদেশপ্রেম এক পরম পবিত্র বস্তু, তাকে হিংসা-বিদ্বেষ-ঈর্ষ্যা দ্বারা কুলষিত

করার কোনো সার্থকতা নেই। আমার বিশ্বাস, ইংরাজকে ঘৃণা না করেও স্বদেশের শ্রেষ্ঠ সেবায় আত্মনিয়োগ করা যায়। ঘৃণাতে শক্তিক্ষয় ঘটে। প্রেমে শক্তিবৃদ্ধি হয়। ভারতীয় চিন্তাধারা স্বদেশ-সাধনার মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি প্রেম-বিতরণে সমর্থ। ভারতের স্বদেশ-প্রেমে আর বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্বদেশপ্রেমে এইখানেই পার্থক্য।

আশ্চর্য্য

একটী যুবক প্রশ্ন করিল,—কত লোকের কত কাজের কথা আপনি বক্তৃতা-ব্যপদেশে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে বলেছেন, আর মুগ্ধ হ'য়ে শুনেছি। কিন্তু যাতে আপনার প্রতিষ্ঠানটীর পরিপুষ্টির জন্য জনসাধারণ কিছু কাজ করেন, ত্যাগ স্বীকার করেন, সহায়তা দান করেন, এই সম্বন্ধে কিছু বলেন না কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তুমি ত' বাবা মজার প্রশ্ন কর্ল্লে! অন্যেরা এসে আমার কাজে সহায়তা করুন, এই অনুরোধ বা ইঙ্গিত ক'রে একটী কথাও আমি কেন বলি না, তার কারণ ত' সুস্পষ্ট। যেটাকে আমি আমার নিজের কাজ ব'লে মনে কচ্ছি এবং যার জন্য আমি প্রাণান্তকর শ্রমই ক'রে যাচ্ছি, সেটা ত' আমার একার কাজ নয়। সেটা ত' সকলের কাজ। যখন সময় হবে, তখন সকলে একাজ

নিয়ে ভাব্‌বে। আমার কি প্রয়োজন আছে, আমার হাজার কথার মাঝখানে আবার এই কথাটাও তাদের শুনিয়ে দেওয়ার? কি সব স্বপ্ন আমি আকৈশোর দেখে আসছি, তার গল্প ক'রে মানুষের মন ভুলাবার আমার আগ্রহ থাক্‌বে কেন? আমি যে আমার নিজের ভিতরে বিশ্বাধিপতির পুণ্য সিংহাসনটী সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। এজন্য আমার কোনো বিষয়ে কোনো অভাব-বোধ নেই। আর, তা' নেই ব'লেই কারো কাছে কিছু যাচ্ঞা করবার অভিলাষ এই অন্তরে জাগে না। শরীরের প্রতিটি রোমকূপে হাজারটা ক'রে বারুদের স্তূপ নিয়ে আমি উল্কার বেগে দিকে-বিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছি, হিমশীতল মৃতপ্রায় দেহগুলিতে একটুখানি প্রাণের উত্তাপ সঞ্চারিত ক'রে দিয়ে যাবার জন্য। এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত কোনও খোশ খেয়াল বা চরিতার্থতার কোনো বাসনা নেই। নেই ব'লেই আমি এত নিঃশঙ্ক এবং এত অনর্গল। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়-বিরহিত চিত্তে আমি মানুষকে ব'লে যাচ্ছি,—"জাগো নিদ্রিত, তুমি জাগো। ওঠো, বস, কাজে লাগো।" কি কাজে সে লাগবে, সেইটে সে নিজেই নির্দ্ধারণ করুক। কাজ-নির্ব্বাচন ক'রে দেওয়ার ভার আমার উপরে আমি নিতে চাই নি। কার পূর্ব্বসংস্কার কাকে কোন কাজের পক্ষে উপযুক্ত ক'রে গড়ে রেখেছে, এটা সে নিজেই বুঝে নিক এবং সুগমতা দুর্গমতা বিচার ক'রে পথ-নির্ব্বাচন করুক।

আমার বিচারে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার মূল্য সকলের চেয়ে বেশী, এমন কি আমার নিজের প্রয়োজনের দাবী ও তাগিদের চেয়েও বেশী। আমি আমার স্বাধীন রুচি অনুসারে নিজ সাধ্যানুযায়ী কাজ ক'রে যাচ্ছি নিঃশব্দে, আমাকে সহায়তা করার জন্য লোকের সহানুভূতিকে উদ্রিক্ত করার চেষ্টায় আয়ুক্ষয় আমি করব কেন?

যুবকটী স্তম্ভিত ভাবে হঠাৎ উচ্চারণ করিল,—আশ্চর্য্য!

স্বদেশসেবক ও জাতিভেদপ্রথা

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাতিভেদপ্রথার ভালমন্দ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কারণ, দেশে একদল লোক একে জাতীয় উন্নতির সবচেয়ে বড় বাধা ব'লে মনে করেন, অন্যেরা ভাবেন যে, একে রক্ষা করাও একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ওটা হচ্ছে সামাজিক সমস্যা। হিন্দু-সমাজের নিজস্ব সমস্যা। সমগ্র ভারতীয় মানবের কাছে এটা সমস্যা নয়। সমগ্র ভারতের যাবতীয় নরনারী যদি নিজেদিগকে শুধু মাত্র "ভারতীয়" ব'লে ভাবতে শুরু করেন, তবে ধর্ম্মনিরপেক্ষ ভাবেই এই সমস্যার মীমাংসা হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু মুসলমান যেমন মুসলমানত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে ভারতীয়ত্ব গ্রহণে আগ্রহী নয়,

হিন্দুর ভিতরেও তেমন সঙ্কোচ থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং তোমরা যারা স্বদেশপ্রেমিক, তারা সর্ব্বজাতিতে সমব্যবহার ক'রো, কিন্তু জোর ক'রে কারো জাতিপাত ঘটাতে যেও না। ওটা হবে অশালীনতা।

জাতিভেদ-প্রথার ভালমন্দ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাতিভেদ-প্রথার ভালমন্দ নিয়ে দুশ্চিন্তা আমার নেই। সেই জন্যই এই বিষয়ে আমি কখনো কোনো তীব্র মতামত দিতে রুচি পাই না। অন্যান্য দশটা সমস্যার ন্যায় জাতিভেদ-প্রথারও যেমন ভালো দিক্ আছে, তেমন মন্দ দিক্‌ও আছে।

প্রশ্ন হইল,—ভালোটা কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কুলবৈষম্যমূলক জাতিভেদ কখনো ধন-বৈষম্য-মূলক ভেদ সৃষ্টি কত্তে পারে না। একজন ধনী ব্রাহ্মণ যে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যাকে পুত্রবধূ ক'রে ঘরে আনেন, দ্বিধা করেন না, তার কারণ জাতিগত ভেদবুদ্ধি তাকে তাঁর অজ্ঞাতসারে অপর ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যকে উপেক্ষা কত্তে শিখিয়েছে। কৌলিন্য যখন কাঞ্চনের দ্বারা নির্ণীত হয়, তখন ধনীর ঘরে ধনীর কন্যারাই বধূ-রূপে আসেন। কৌলীন্য যখন বংশ দিয়ে নির্ণীত হয়, তখন দরিদ্রে আর ধনীতে

আত্মীয়তার বাধা অপসারিত হয়ে যায়, শ্রেষ্ঠ ধনীর কন্যার চেয়েও শ্রেষ্ঠ কুলের কন্যা অধিকতর অভীপ্সিতা হয়। সুতরাং কুলগত জাতিভেদ ধনগত ভেদকে প্রকারান্তরে প্রশমিত করে। বংশমর্য্যাদায় বিশ্বাসী ব্যক্তিরা কুবেরের ঘর থেকেও একটী নিম্নজাতীয় কন্যাকে এনে বধূ-রূপে বরণ কর্ব্বে না। অনেক মন্দের ভিতরে জাতিভেদ-প্রথার এইটুকু একটী ভালো দিক্। জগতের জাতিভেদের বজ্জাতি নিয়ে যত মারামারি, ধনবৈষম্যের বিপত্তি নিয়ে তার শতগুণ মারামারি হচ্ছে এবং হবে। একজন অপার ধনগর্ব্বে স্ফীত, শত জন ধনহীন কাঙ্গাল,—এর চেয়ে বড় সমস্যা জগতে আর কিছু নেই। জাতিভেদ মুষ্টিমেয় কিছু লোককে ব্রাহ্মণ বা কুলীন ক'রে রেখেছে কিন্তু ধনবৈষম্য অগণিত মানুষকে বুভুক্ষায় কাতর ও দুঃখে ম্রিয়মাণ ক'রে রেখেছে। দুটো সমস্যার আয়তনে অনেক তফাৎ।

জাতিভেদ-প্রথার আসল খুঁটি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাতিভেদ-প্রথার স্থায়িত্বের আসল কারণটা হ'ল এই যে, যা'রা নিজেদিগকে নিম্নবর্ণের লোক ব'লে মনে করে, তারাই আবার সুযোগ পেলে উচ্চবর্ণে উঠবার জন্য অভিলাষী। সবাই উচ্চবর্ণের কন্যাকে বিবাহ কত্তে চায়, নিজের চেয়ে নিম্নবর্ণের কন্যাতে তাদের আগ্রহ

নেই, রুচি নেই, ধ্যান নেই। কিন্তু উচ্চবর্ণের কন্যাকে অঙ্কগত ক'রে নিয়ে তার গর্ভজাত সন্তানকে উচ্চবর্ণের জাতিত্ব-পরিচয় প্রদান করে না, করে নিজের নিম্নবর্ণের জাতিত্বের পরিচয় প্রদান। উচ্চবর্ণের কন্যাভিলাষী ব্যক্তিরা নিজেদের বর্ণাধিভুক্ত ব্যক্তিদের সার্ব্বাঙ্গিক উন্নয়নের জন্য কোনও উল্লেখযোগ্য চেষ্টা না ক'রে শুধু একটী কন্যাকেই তার জাতি থেকে ভ্রষ্ট ক'রে নিয়ে এলেন। এতে নিম্নবর্ণের লোকদের ব্যাপক কোনও হিত সাধিত হ'ল না। অথচ মনে মনে নিম্নবর্ণভুক্ত ব্যক্তিরা উচ্চবর্ণ সম্পর্কে একটী আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাবও পোষণ কত্তে লাগলো। এই শ্রদ্ধা সুগুপ্ত বিদ্বেষের সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে এক বিচিত্র অবস্থায় গিয়ে পৌছুল। যার ফলে যুক্তিহীন আক্রোশ আর লক্ষ্যহীন ভক্তি দুটাই ঐ সমাজের মানুষের মনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কত্তে লাগ্‌ল। জাতিভেদ-প্রথার আসল খুঁটি এই দোদুল্যমান মনটীর ভিতরে, যে মনটী নিজ লক্ষ্য স্থির কত্তে না পেরে এখানে ওখানে একটা দুটা প্রলেপ দিয়ে সর্ব্বাঙ্গব্যাপী পক্ষাঘাতকে নিরাময় কত্তে চায়। একটী নিম্নবর্ণের কন্যা উচ্চবর্ণের ঘরে বধূরূপে গেলে তার সম্পর্কে সামাজিক মন যতই বিরক্তি প্রকাশ করুক, স্বামীর উপাধি অনুসারে তার পুত্রকন্যারা চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, মিশ্র, ত্রিবেদী, ত্রিপাঠী প্রভৃতি উপাধিতেই পরিচিত হ'তে লাগ্‌ল। এর সুদূরপ্রসারী ফল চিন্তা ক'রে দেখ ত'।

জাতিভেদপ্রথা অনেক কালের

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাতিভেদ-প্রথা অনেক কালের। এমন কি, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবেরও কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বের। বুদ্ধদেব জাতিভেদ-প্রথাকে বিশেষ ভাবে দুর্ব্বল ক'রে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন কিন্তু সমূলে উৎপাটন করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এরই জন্য শেষ পর্য্যন্ত তিনি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই পূজ্য, বরণীয়, সম্মানীয় ব'লে নির্দ্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের আচরিত, অনুশীলিত, কথিত সহস্র সহস্র উপদেশকে তিনি নিজের ভাষায় বেদ-বিরোধী ভাবে, যজ্ঞীয় কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিকূলে প্রদান ক'রে বিশ্ববিজয় করেছিলেন কিন্তু একটী ব্যাপার লক্ষ্য ক'রে দেখো যে, যে যে স্থানে তিনি বা তাঁর অনুচরবর্গ জাতিভেদ-প্রথাকে একেবারে তুলে দিতে সমর্থ হয়েছেন, ঠিক সেই সেই স্থানে একেশ্বরবাদী ইসলামধর্ম্ম যেন প্লাবনের জলের মত পাহাড়-পর্ব্বত উড়িয়ে দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেছে। আজ যে ভারতে অধিকাংশ স্থানে হিন্দু ব'লে একটা আলাদা জাতির অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছ, সে ত' শুধু জাতিভেদের পক্ষপুটে এরা কমঠ-নীতি আশ্রয় ক'রে মুখ লুকিয়ে ছিলেন ব'লে। বেঁচে থাক্‌বার সম্ভাবনা ছিল না, তবু হিন্দুত্ব আশ্চর্য্য ভাবে বেঁচে গেছে, ইতিহাসের এটা এক পরম বিস্ময়। সুতরাং জাতিভেদকে এক তুড়িতে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব কিনা, এটা ভাবনার বিষয়।

নব্যযুগে জাতিভেদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নব্যযুগে জাতিভেদ-প্রথাকে নূতন ভাবে আঘাত দিতে চেষ্টা করেন নব্য ইংরিজি শিক্ষার পাণ্ডারা এবং গৌণতঃ ব্রাহ্ম সমাজ। ভোগ-বিলাস-বাদ যাদের অভিভূত করেছিল, তারা মদের পেয়ালায় তুফান দেখে জাতি-ভ্রষ্ট হ'ল। কিন্তু দেশপ্রেম যাঁহাদিগকে প্রেরণা যোগাচ্ছিল, তাঁরা জাতিভেদের তীব্র বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও এতকাল জাতিভেদ-প্রথা বেঁচে রইল কি প্রকারে, তার রহস্য অনুসন্ধানে ব্রতী হ'লেন। স্পষ্ট ভাষায় নিজে একথা কোথাও ব'লে না থাক্‌লেও বিবেকানন্দ সুনিশ্চিত বুঝেছিলেন, ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া পাশ্চাত্য বিলাস-লোলতা এবং জাতি-ভেদের প্রবঞ্চনা এই দুটার একটাকেও রোধ করা যাবে না। তিনি সব্যসাচীর ন্যায় দুই হাতে তীর ছুঁড়তে লাগ্‌লেন। দেশের ভিতরে, বিশেষ ক'রে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের ভিতরে একটা আলোড়ন এল, যার প্রভাব জাতির নবোন্মেষের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশত হ'লেও পড়্‌ল। এখন অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এই যে, দাসের মেয়ে চক্রবর্ত্তীর ছেলেকে বিয়ে কচ্ছে, ভট্টাচার্য্যের ছেলে ঘোষের মেয়েকে বিয়ে কচ্ছে এবং এদের ছেলেপুলেরা চক্রবর্ত্তী আর ভট্টাচার্য্য নামেই চলে যাচ্ছে। এ যেন মহাযুদ্ধ চলার কালে আরমিষ্টিস্ বা সাময়িক যুদ্ধবিরতি। বাপঠাকুরদা দুদিন কালোমুখ ক'রে ব'সে থেকে

কদিন পরেই নাতি-নাতনীদের কোলে তুলে নিয়ে চুমো খাচ্ছেন। এভাবে কয়েক যুগ পার হবার পরে জাতিভেদ-প্রথাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, কিছুকাল প্রতীক্ষা ক'রে দেখ। যেটা ভাঙ্‌বার আপনি ভাঙ্গবে, যেটা থাক্‌বার, চিরকাল থাক্‌বে। লক্ষ্য ক'রে দেখই না কেন যে, কদিন পরে কি হয় আর না হয়। জাতিভেদকে ভাঙ্গবার জন্য অযথা পরিশ্রম না ক'রে সর্ব্বজাতির সর্ব্ববর্ণের মানুষকে শুচিতা, সত্যবাদিতা, সরলতা এবং চরিত্রবত্তার শিক্ষা প্রদান কত্তে থাক, প্রত্যেকের মনে ব্রহ্মচর্য্যের অনুরাগ সৃষ্টি কর। প্রতিটি কুটীরে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ককে যতটা সম্ভব সংযম-পূত ক'রে তোলার চেষ্টা কর। গুণগত উৎকর্ষ বেড়ে গেলে একদিন সব জাতি মিলে একটা বিরাট মানুষ-জাতির বিকাশ সম্ভব হ'তে পারে, যার নাম ব্রাহ্মণ-জাতি বা দেব-মানবজাতি।

জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে কতটুকু শ্রম দিব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে কাজ কর্ব্বার জন্য আমরা কতটা শ্রম দিতে পারি, এটা নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। আমার মত এই যে, কালের ধর্ম্মে যা' ভাঙ্‌বার তা' ভাঙ্গবেই, যা' থাক্‌বার তা' থাক্‌বেই। আমরা মানুষকে সাম্যের বাণী শুনাতে পারি। আমরা আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস বিলাতে পারি। আমরা সদাচারের মহিমা

কীর্ত্তন কত্তে পারি। আমরা পরার্থে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা যোগাতে পারি। আমরা একটা সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে অংশ নিয়ে নিজেদের কর্ম্মক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত কত্তে পারি না। জ্ঞানের রাজ্যে যে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের পার্থক্য নেই, একথা যদি জোর ক'রে বল্‌তে পারি, তবে কর্ম্মের রাজ্যে তাদের পার্থক্য ত' আপনা আপনি কমতে থাক্‌বে। কাউকে সমাজদ্রোহী হ'তে আমরা উস্‌কানি দেব না, কিন্তু কেউ সামাজিক গণ্ডী ভাঙ্গার সঙ্গত কারণ পেয়েছে ব'লেই তাকে গর্হণ বা তিরস্কারও কর্ব্ব না। সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ না ক'রেও যারা জাতিভেদের কাঠামো ভাঙ্গতে সাহসী, আমরা তাঁদের প্রশংসাই কর্ব্ব। স্ত্রীশূদ্রে অকাতরে প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রীর অধিকার-বিতরণকে এই জন্যই আমি আমার কর্ম্মতালিকা ক'রে নিয়েছি, যদিও জগতের একটী প্রাণীকেও আমি কদাচ বলি নাই,—"আমার শিষ্য হও।"

আপন ও পর

একজন প্রশ্ন করিল,—বাবামণি, আপন পর চিন্‌ব কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে পরমেশ্বরকে আপন ভাবে, সে তোমারও আপন। যে পরমেশ্বরকে শত্রু ভাবে, তার সংশ্রবে যেও না। যে দীন-দরিদ্রকে আপন ভাবে, সে তোমার আপন। যে অজ্ঞ, মূর্খ, অনাথ, নিরাশ্রয়কে আপন ভাবে, সে

তোমার আপন। কে তোমার আপন, তা' খুঁজতে দোষ নেই কিন্তু কে তোমার পর, তা' খুঁজতে যেও না। সবাই তোমাকে পর ভাবলেও তুমি কাউকে পর ভাব্‌বে না। মনে প্রাণে তুমি সকলের আপন থাক্‌তে চেষ্টা করো। যে তোমার শত্রু নয়, সেই তোমার বন্ধু। যে তোমার বন্ধু নয়, সেই তোমার শত্রু নয়। কাউকে শত্রু জ্ঞান ক'রো না। মনে জ্ঞানে বিশ্বের সকলকে আপন ভাবতে থাক কিন্তু কর্ম্মে, ব্যবহারে, আচরণে ও অনুশীলনে সুজনতার গণ্ডী কখনো লঙ্ঘন ক'রো না। যার প্রতি আপনত্ব দেখাতে গেলে সুরুচির, সুজনতার, সরলতার ক্ষতি কত্তে হয়, তার সম্পর্কে সতর্ক থাক। সে তোমার পর নয়, তবু সতর্ক থাক। যাকে ভালবাসতে দ্বিধা আসে, তার প্রতি ভালবাসা না দেখিয়েই সর্ব্বপ্রকারে সদ্‌ব্যবহার কর। উচ্চ লক্ষ্যকে আদর্শ ক'রে পথ চল, কিন্তু পায়ের দিকেও নজর রেখো। গর্ত্তে, খানায়, খন্দে, সর্প্‌বিবরে বা পাথরের উপরে পা না পড়ে, তার জন্য একটু মনোযোগ নিম্নদিকেও রাখ্‌বে। বিশ্বপ্রভু নিয়ত তোমার সঙ্গে আছেন, এই বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করো।

খ্রীষ্টান মিশনারীদের শত্রু ভাবিও না

ভারতের নানা পার্ব্বত্য অঞ্চলে খ্রীষ্টান মিশনারীরা পাহাড়ীদের ভিতরে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচার করিয়া খ্রীষ্টানের সংখ্যাবৃদ্ধি

করিতেছেন বলিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন,—এখন এই বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য কি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি খুব ক্ষুদ্র আকারে পার্ব্বত্য নানা জাতির ভিতরে কিছু কিছু কাজ ক'রে আস্‌ছি এবং সাধ্য মত নিজ কর্ম্মীদের পাঠিয়ে পাঠিয়ে তাদের ভিতরে কর্ম্মের ধারাটাকে অব্যাহত রাখবার চেষ্টাও ক'রে আস্‌ছি। আমি লক্ষ্য ক'রে আস্‌ছি যে, খ্রীষ্টান মিশনারীরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে, সুপরিকল্পিত কর্ম্মপন্থা নিয়ে, বিপুল ঐশ্বর্য্যের সম্বল নিয়ে এবং নিজধর্ম্মপ্রচারের বিষয়ে ততোধিক উৎসাহ নিয়ে ধারাবাহিক প্রযত্নে কাজ ক'রে যাচ্ছেন। তাঁদের এ' চেষ্টা প্রশংসনীয়। তাঁদের প্রতি তোমরা কেউ কখনো শত্রুভাব পোষণ ক'রো না। তোমরা যেখানে যাও না, যেতে চাও না, যাওয়ার কোনো উদ্যম বা আয়োজন কর না, এমন সব স্থানে তাঁরা এক একটা শক্ত ঘাঁটি নির্ম্মাণ ক'রে মহাপুরুষ খ্রীষ্টের বাণী ও শিক্ষাকে প্রচার কত্তে চেষ্টা কচ্ছেন। তারই ফলে লোকেরা খ্রীষ্টান হচ্ছে। তাঁদের ধনবল অমিত ব'লে তাঁরা কাজ দীর্ঘকাল চালু রাখতে পাচ্ছেন। তাঁদের কর্ম্মিসংখ্যা অগণিত ব'লে পৃথিবীর সব প্রান্তে তাঁরা কাজ করার সাহস পাচ্ছেন। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, যীশুখ্রীষ্টের প্রতি তাঁদের সেবা-বুদ্ধি অটল অচল ব'লেই তাঁদের কাজে যেটুকু সফলতা হওয়া উচিত, ততটুকু সাফল্য তাঁরা লাভ কচ্ছেন। এজন্য তাঁদের প্রতি ঈর্ষ্যাপোষণ অন্যায়।

স্বদেশপ্রেমিক সৃষ্টি করার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—খ্রীষ্টান হবার ফলে যাদের ভারতপ্রেম নষ্ট হচ্ছে, তারা দুর্ভাগা। স্বদেশপ্রেমিক খ্রীষ্টান দেশের শত্রু নয়, পরমমিত্র। তোমরা শুধু এইটুকু চেষ্টা দেখ্‌তে পার, যেন ধর্ম্মান্তরিত হওয়ার ফলে কেউ স্বদেশদ্রোহী না হয়। ধর্ম্ম বিদেশ থেকে এসেছে ব'লেই দেহ, মন, প্রাণ, আত্মার বিদেশী রূপ হ'তে হবে, এমন কোনো কথা নেই। ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ ক'রে, ভারতের জলবায়ু খাদ্য-পানীয়, সুযোগ-সুবিধার সব পেয়ে পেয়ে বড় হ'য়ে তারপরে একজন তার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ফলস্বরূপে দেশের শত্রু হবে, এটা বরদাস্ত করা যায় না। খুঁজে দেখো, খ্রীষ্টানদের মধ্যে অনেক স্বদেশপ্রেমিক লোক আছেন, যাঁরা সত্যই নমস্য। ভুল ক'রে তোমরা খ্রীষ্টানমাত্রের প্রতিই বিরূপ বুদ্ধি পোষণ ক'রো না। স্বদেশী লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ-ভাবে না মিশতে পার্ল্লে স্বদেশপ্রেম জন্মে না। আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে খ্রীষ্টান বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের নিজেদের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে না রেখে তাদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ হৃদ্যতার বন্ধন সৃষ্টি করা। যে মানুষকে আমি ভালবাসি না, সেই মানুষের কাছে আমি আমার দেশের জন্য প্রেম প্রত্যাশা কর্ব্ব কি করে?

ধর্ম্মান্তরিত-করণের অধিকার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আরও একটী কথা। একজন

ভারতীয়কে খ্রীষ্টান বা মুসলমান করার অধিকার যদি খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মগুরুদের থাকে, তবে একজন অহিন্দুকে হিন্দু ক'রে নেওয়ার অধিকারও হিন্দু ধর্ম্মগুরুদের নিশ্চয়ই থাক্‌বে। যে অবস্থায় একজন অহিন্দু ধর্ম্মগুরু হিন্দুকে নিজ-ধর্ম্মাবলম্বী কত্তে পারেন, তদনুরূপ অবস্থায় একজন হিন্দু ধর্ম্মগুরু নিশ্চয়ই একজন অহিন্দুকে হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ ক'রে নিতে পারেন।

ধর্ম্মান্তরিতের সামাজিক সুবিধা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু ধর্ম্মান্তরিত-করণই বড় কথা নয়। সব চেয়ে বড় কথা হ'ল, ধর্ম্মান্তরিত এই অহিন্দুকে নিজেদের সমাজ-মধ্যে সম্মানযোগ্য স্থান কি তোমরা দিতে পারবে? তা' দিতে কি তোমরা প্রস্তুত? নবদীক্ষিত নূতন হিন্দু তোমাদের কাছে মানুষের পূর্ণাধিকার পাবে ত'? না পেলে সমাজের দায়েই সে পুনঃ ফিরে সেইখানেই চলে যাবে, যেখানে সে কদিন আগেই ছিল। যে-কোনও নবধর্ম্মান্তরিতকে নিজ সমাজের সর্ব্বস্তরে সমান অধিকার নিয়ে চলবার স্বাধীনতা দিলে পরে হিন্দুর জাতিভেদপ্রথা হয়ত ভেঙ্গে চৌচির হ'য়ে যাবে, এইরূপ একটা অস্পষ্ট আতঙ্ক থাকার ফলেই হিন্দু-সমাজ অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে হিন্দু-রূপে ধর্ম্মান্তরিত-করণে তেমন আগ্রহী নয়। নতুবা ধর্ম্মান্তরিত-

করণের উৎসাহ তার বৃদ্ধি পাবার স্বপক্ষে অনেক সুযুক্তি আছে। জাতিভেদ-প্রথাটা নিন্দিত ও নিন্দনীয়, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই প্রথাটা না থাক্‌লে ভারতবর্ষের উপরে ধর্ম্মীয় অত্যাচারের পাঁচ সাত শতাব্দীর পরে হয়ত একটী হিন্দুও আত্ম-পরিচয় দেবার জন্য বেঁচে থাক্‌ত না। লক্ষ্য কর যে, জাতিভেদ-প্রথা যতক্ষণ শিথিল না হ'য়েছে, ততক্ষণ ব্যাপক ভাবে হিন্দু-বিলোপ কোথাও ঘটে নি। এটাও এক চমৎকার রহস্য। আমরা জাতিভেদ-প্রথার নিন্দা শত মুখে করি বটে কিন্তু তাকে নিমেষে ধ্বংস ক'রে দেবার দুঃসাহস আমাদের কখনো হয় নি। গুরুনানক জাতিভেদ মানেন নি, কিন্তু তিনি নূতন এক শিখ জাতির সৃষ্টি সাধন মাত্র কর্ল্লেন, জাতিভেদ দেশ থেকে দূর হ'ল না। শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ মানেন নি, সর্ব্বজাতি সর্ব্ববর্ণকে কোল দিলেন, কিন্তু সমাজ থেকে জাতিভেদ দূর হ'ল না, ভক্তগণের মধ্যে ছুঁৎমার্গ ক'মে গেল মাত্র। ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ শুধু মানেন নি বল্‌ব না, জাতিভেদ ভেঙ্গে চূরে নিশ্চিহ্ন করার ব্রত নিলেন কিন্তু বিশাল হিন্দু-জাতির গায়ে পায়ে তার ঢেউ এসে পৌঁছল মাত্র, সমাজের পরিবর্ত্তন হ'ল না, ব্রাহ্মরা এক রকম এক-ঘরে হ'য়ে এক কোণায় পড়ে রইলেন। তবে মাঝে মাঝে নানা পরিবারে অসবর্ণ বিবাহ দুটা চারটা ক'রে চলছে এবং চলতেই থাক্‌বে। এর ফলে জাতিভেদ সম্পর্কে মানুষের কড়া

মেজাজ কতকটা মৃদু হ'য়ে যাচ্ছে, পরিবর্ত্তনের মধ্যে মাত্র এইটুকুই দেখা যাচ্ছে। হাজার হাজার লোক ভিন্ন ধর্ম্ম ছেড়ে হিন্দু-সমাজের ভিতরে প্রবেশ কর্ল্লে তাদের জন্য বসবার আসনটুকু দেবারও তোমাদের মধ্যে কোনো প্রস্তুতি নেই। এই জন্যই তোমাদের দ্বারা অপরকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করার প্রয়াসের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা নেই বা কোনো সংঘ বা মিশনই এই বিষয়ে সফলতা আহরণ কচ্ছেন না।

অবহেলিত বন-পাহাড়ের অধিবাসিগণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাই ব'লে বন-পাহাড়ের অদিবাসীদের মধ্যে আমরা কাজ কর্ব্ব না, এমন হ'তে পারে না। অনাদি অতীত থেকে তারা ভারতেরই বনে আর পাহাড়ে অর্দ্ধোলঙ্গ নগ্ন জীবন যাপন করেছে। কিছু না কিছু ভারতীয় সংস্কৃতি তারা গৌণ ভাবে হ'লেও পেয়েছে। তাদের পুনরুদ্ধার-কার্য্য আমার হারাণো ভাইকে ফিরে পাওয়ার মতন ব্যাপার। একাজে আমরা আলস্য কত্তে পারি না। রিয়াং, কাইফেং, মলসুং, দারলং, জেমি, মিজো, রূপিণী, ডিমাছা, মিকির, নাগা আদি ক'রে যত স্থানে যত অবহেলিত মানব-গোষ্ঠী আছে, তাদের মধ্যে আমাদের নিশ্চয়ই যেতে হবে। তাদের সকলকে আপন ক'রে নেওয়ার অভিযান আমরা বারংবার

চালাব, এটা আমাদের কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য আমাদের একজনের বা দুজনের নয়, এ কর্ত্তব্য আমাদের প্রত্যেকের, তবে কারো সঙ্গে বৃথা বিরোধ না বাঁধিয়ে একাজ আমাদের কত্তে হবে।

প্রচার কর অদ্বিতীয়কে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রেতোপাসক, বৃক্ষোপাসক, জীবজন্তুর উপাসক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই সব নরনারীকে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ রূপটীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। কের পূজা আর গঙ্গা পূজার নাম ক'রে এদের মধ্যে নবচেতনা আনা যাবে না। খণ্ড খণ্ড দেবতার উপাসনার প্রচলন ক'রে এ'দের বাঁধা সম্ভব হবে না। অলৌকিক কাহিনী প্রচার ক'রে এক দেবতার চেয়ে অন্য দেবতা যে বড়, একথা বুঝাবার লোকের অভাব হবে না। সুতরাং বড়রও যিনি বড়, সবার যিনি বড়, দেবতারও যিনি দেবতা, যিনি একাকীই সর্ব্বদেবময়, যিনি সবকিছুর নিয়ন্তা ও আবরক, সেই পরম সত্যের সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এই আসল কথাটী কেউ যেন কদাচ বিস্মৃত হয়ো না। অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের নাম প্রচারের দ্বারা হাজার মতের ও হাজার পথের বিচিত্র বিভিন্নতার ভিতরে ঐক্য ও সামঞ্জস্য স্থাপন সম্ভব হবে।

ব্যভিচার

জেলার সদর শহরে একজন দুই জনের ব্যভিচারী

আচরণের ফলে কোনো কোনো শান্তিপ্রিয় পরিবারের ভিতরে গুরুতর অশান্তির সৃষ্টি হওয়ার বিবরণ শ্রবণে জনৈক চিন্তাশীল জিজ্ঞাসুকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যৌন ব্যবহারের অধিকার-সীমা প্রত্যেক সভ্য-সমাজেই সুনির্দ্ধারিত আছে। সেই সীমা যে লঙ্ঘন করে, সে সমাজের স্থিতি নষ্ট করে, স্বাস্থ্য নষ্ট করে, সুরুচি নষ্ট করে এবং এভাবে সমাজের সর্ব্বনাশ করে। মুখে যাই বলুক, ব্যভিচারী ব্যক্তি মাত্রেরই মনে থাকে দ্বন্দ্ব, যাকে ঢেকে রাখার জন্য তাকে মদ্য পানে আসক্ত হ'তে হয়। ফলে মদ্য, যা' অনেক সময়ে ঔষধ, তাও সমাজের সর্ব্বনাশকর ব্যসনে পরিণত হয়েছে। নারী যদি বহু পুরুষগামিনী হয়, তবে কদাচ তাহার মনের স্থিরতা থাক্‌তে পারে না। পুরুষ যদি বহু নারীতে আসক্ত হয়, তবে তার দেহ-মনে, চিন্তায়-আচরণে সদ্‌গুণের বিকাশ বা বিস্তার অসম্ভব। এই জন্যই প্রাচীন ও নবীন অধিকাংশ সমাজ-কল্যাণকামীরা বলেছেন, এক নারীর এক পতি এবং এক নরের এক পত্নী থাকাই বাঞ্ছনীয়। প্রথমা পত্নী বন্ধ্যা ব'লে যদি স্বামীর পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণ বিধেয় হয়, তবে পুরুষটি সন্তানোৎপাদন-শক্তিহীন হ'লে পত্নীও তো পত্যন্তর গ্রহণ করতে পারে,—এই একটা প্রশ্ন সঙ্গত ভাবেই উঠতে পারে। এই প্রশ্নের জবাব কি হবে, তা' ভবিষ্যতের কালপুরুষ তাৎকালিক সমাজের বিবর্ত্তন অনুযায়ী স্থির করবেন। হয়ত

ব্যাপক ভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রচলিত হবে এবং একই নারী আইন সঙ্গত ভাবে বহুবার পত্যন্তর গ্রহণের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দর্শকদের চমকিত ক'রে দেবে। আমরা মানব-সমাজকে যে ভাবে যে শিক্ষা দিয়ে যেতে সমর্থ হব, তার উপরে ভবিষ্যৎটা নির্ভর করবে।

সমাজকল্যাণকামীরা ব্যভিচারের বিরুদ্ধতা করেন কেন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারী বা পুরুষ কাহারও যৌবনই চিরস্থায়ী নয়। ফুটন্ত গোলাপ দুদিন গেলেই বাসি হ'য়ে ঝ'রে পড়ে। সৌন্দর্য্যহীন ঝরা ফুলকে কেউ বুক পকেটে এটে গর্ব্বভরে বা আনন্দ সহকারে ঘুরে বেড়ায় না। টাটকা ফুলের যে সমাদর, বাসি ফুলের সে সমাদর কখনও হয় না। ব্যভিচারে বাধা না থাক্‌লে লম্পট পুরুষ বা কামুকী কামিনী নিত্য নূতন শিকারের পিছনে ছুটতে থাকে এবং একটি পুরুষের দৌরাত্ম্যে শত শত নারী জীবন ভ'রে ক্রন্দনের উপলক্ষ্য সঞ্চয় করে। অথবা একটি নারীর মোহিনী মায়ায় মরীচিকাভ্রান্ত শত শত পুরুষ অনুচিত অনলে ঝাঁপ দিয়ে আমৃত্যু আর্ত্তনাদ করে। কেননা, বহুচারীর বা বহুচারিণীর কারো প্রতি এমন মায়া কখনও বসে না, যাতে বার্দ্ধক্য-কালে বা রুগ্নাবস্থায় শিয়রে প্রদীপ জ্বেলে সে যমের আক্রমণের

বিরুদ্ধে পাহারা দেবে। লুব্ধ লম্পটের অভিসার ক্ষণিকের। এই কারণেই সমাজকল্যাণকামীদের পক্ষে ব্যভিচারের বিরুদ্ধতা করা স্বাভাবিক। ব্যভিচারীর জীবনে একনিষ্ঠতা প্রত্যাশা করা ভুল। নানা জনকে প্রেম দেখিয়ে যারা বাজারের সওদা কেনে বা বেচে, তারা নিজেরাও চূড়ান্ত ঠকা ঠকে, অপরকেও চূড়ান্ত ঠকান ঠকায়। নিজেকে এবং সংশ্লিষ্ট পুরুষ ও নারীকে যুগপৎ ঠক্‌বার এমন অদ্ভুত ঘটনা আর কারো জীবনে ঘটে না। এই জন্যই, যাতে সমাজে ব্যভিচারের অভিচার দুরন্ত ভাবে বাড়তে না পারে, তার জন্য প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তির কাজ করা উচিত। ক্ষুদ্র একটু ইন্ধনে দাবানল যেমন জ্ব'লে উঠ্‌তে পারে, ঠিক তেমনি ব্যভিচারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তের প্রভাবে সমাজে ব্যাপক ব্যভিচারের অভিযান শুরু হ'য়ে যেতে পারে।

ব্যভিচার ও উত্তরাধিকার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উত্তরাধিকার ব'লে একটা জিনিষ যতক্ষণ জগতে সুসম্পাদিত থাকবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নরনারীর যৌন মিলনের মধ্যে একনিষ্ঠতার প্রয়োজন থাকবেই থাকবে। পিতার সম্পত্তি পুত্র পায় ব'লেই সন্তানের পিতৃত্ব সম্পর্কে সমাজের লোকের সুস্পষ্ট প্রত্যয় থাকা প্রয়োজন। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র পঞ্চপাণ্ডবের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছিল ব'লে মহাভারতে বর্ণিত আছে। ঘটনাটা আজকালকার যুগের হ'লে

নিশ্চয়ই তারস্বরে প্রশ্ন উঠত যে, কোন্ সন্তান যে যুধিষ্ঠিরের সম্পত্তি পাবে, কোন্ সন্তান যে ভীম বা অর্জ্জুনের সম্পত্তি পাবে, কোন্ সন্তান বা নকুল ও সহদেবের সম্পত্তি পাবে, তার সঠিক নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেকের পিতৃত্বের জন্য প্রকৃষ্ট প্রমাণ চাই। সামাজিক জীবনে এটা একটা বিদ্‌ঘুটে অবস্থা।

ব্যভিচারের প্রশংসা অনুচিত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লোকব্যবহারে বা সাহিত্য-চর্চ্চায় ব্যভিচারকে প্রশংসা করার প্রবণতা সমাজের স্বাভাবিক সমুন্নতির পক্ষে মারাত্মক ভাবে বিপজ্জনক। জগতে অনেক নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক লোককেও অবস্থার ফেরে প'ড়ে ব্যভিচারী ব'লে অপবাদগ্রস্ত হ'তে হয়ে থাক্‌তে পারে কিন্তু মিথ্যা অপবাদ সমাজের রুচিকে খারাপ কর্ল্লেও সত্যিকারের ক্ষতি সাধন কত্তে পারে না। সত্যিকার ব্যভিচার সুনিশ্চতই সমাজের সুদৃঢ় স্বাস্থ্যকে ভঙ্গুর করে এবং মানুষের মেরুদণ্ডকে দুর্ব্বল করে। পিতামাতার চরিত্রবত্তার উপরে যদি পুত্রকন্যার অবিমিশ্র শ্রদ্ধা না থাকে, তাহ'লে এই পুত্রকন্যারা জীবনে গৌরবান্বিত হবার চেষ্টায় পরাঙ্মুখ হয়। নিজ নিজ বংশধরদের ভবিষ্যৎ ভেবেও এই কারণে ব্যভিচারীদের সংযত হওয়া প্রয়োজন।

নরনারীর যৌন একনিষ্ঠা ও ব্রহ্ম-সাধনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সীতার এক অলঙ্ঘনীয়

পাতিব্রত্যের প্রয়োজন ছিল লব-কুশের আবির্ভাবের জন্য। শুধু পতিপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই নয়। অনেক নারীর জীবনে প্রলোভন আসে কিন্তু তারা তা' অবহেলে জয় করে। তারা ধন্য। অনেক পুরুষের জীবনে প্রলোভন আসে কিন্তু তারাও তা' জয় করে। তারাও ধন্য। পতি ও পত্নীর একনিষ্ঠতা এবং উভয়েরই ব্যভিচারহীনতা পরস্পরকে ভাল ক'রে জানতে সহায়তা দেয়। পূজক যেমন মাটির বা পাথরের মূর্ত্তি পূজা করতে করতে মাটি বা প্রস্তরকে উপলক্ষ্য করেই মাটির অতিরিক্ত, প্রস্তরের অতিরিক্ত এক দৈবী সত্তার পরিচয় পায়, স্পর্শ পায়, কথা শোনে, গন্ধ পায় এবং রূপ দেখে, একনিষ্ঠ নরনারী তেমন দুইটা জড়দেহের জড়াজড়ির মধ্য দিয়ে বস্তুর ঊর্দ্ধে, ইন্দ্রিয়ের ঊর্দ্ধে, ভোগাসক্তির ঊর্দ্ধে, মৈথুনানুভূতির ঊর্দ্ধে এক স্থির, অচঞ্চল, পরমসরস, প্রেমময় দেবতাকে দেখতে পায়, যে তাদের উভয়ের পরিপূর্ণতার বিগ্রহ-স্বরূপ। যৌন ঘনিষ্ঠতার একনিষ্ঠতায় এটাই প্রকৃষ্টতম পুরস্কার। এই উপলব্ধি পশুকে মানুষ করে, মানুষকে দেবতা করে, দেবতাকে সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বদেবদেব, পরমব্রহ্মে রূপান্তরিত করে। তখন দম্পতীর মৈথুন-সাধনা অভ্যাসের দাসত্ব নয়, উহা তখন ব্রহ্মসাধনার রকম-ফের। এক মানুষের শরীর অপর মানুষের শরীরকে আকর্ষণ করে,—এটা

রক্তমাংসের ধর্ম্ম; কিন্তু যেখানে রক্তমাংসের দাবীকে তার পাওনা মিটিয়ে দেওয়া একান্তই কর্ত্তব্য, সেখানে স্বামী তার স্ত্রীতে এবং স্ত্রীর তার স্বামীতে উপরত হবে, এটা ত' স্বাভাবিক। একে অশ্লীল বা অন্যায় ব'লে ব্যাখ্যা করা অসঙ্গত হবে। কিন্তু একনিষ্ঠ মন নিয়ে অব্যভিচারী ইন্দ্রিয় নিয়ে যারা এই দাবী মিটায়, তারা সামান্য একটু অভিনিবেশের ফলে নিজেদের দৈহিক-মিলন-কার্য্যের ভিতরে ব্রহ্মসাধনের রস আস্বাদন কত্তে পারে। আর, এ যারা পারে, তারা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়।

তান্ত্রিকের প্রকৃত লক্ষ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তান্ত্রিকেরা এই ভাবে ব্রহ্ম-সাধনা ইন্দ্রিয় দিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একান্ত অনুশীলন ছেড়ে দিয়ে বসলেন তাঁরা ভৈরবী চক্রে, বসলেন তাঁরা বহুদম্পতির এক দঙ্গলে, চক্ষুলজ্জাকে জয় করবার জন্য মড়ার মাথার খুলি পূর্ণ করলেন মদিরা দিয়ে। পূর্ণপাত্র কারণ-বারি সেবনে চক্ষু হোল রক্তবর্ণ, মস্তিষ্ক হোল ঘূর্ণিত। তারপরে শুরু হল হুলস্থূল। সেই তাণ্ডবের বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যভিচার তাঁদের লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল পরমা-শক্তির সহিত পরমশিবকে মিলিয়ে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের অনুভূতিকে আস্বাদন করা। লক্ষ্যের

চেয়ে উপলক্ষ্যটা যখন বড় হ'য়ে গেল, তান্ত্রিক তখন পতিত হলেন, তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে প্রকৃত প্রস্তাবে নির্ম্মূল হলেন।

ব্যভিচার-সম্ভাবনা দমনে তরুণদের মধ্যে আমাদের কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাদের দিক থেকে আমরা যা' করতে পারি, তা' হচ্ছে অকপট হিতাকাঙ্ক্ষা নিয়ে তরুণ-তরুণীদের কাছে গিয়ে দাঁড়ান আর বলা,—"নিষ্কলঙ্ক চরিত্রই যথার্থ সৌন্দর্য্য, নারীর সতীত্ব জাতির অমূল্য সম্পদ,—এই সম্পদ ও এই সৌন্দর্য্য অর্জ্জনের জন্য তোমরা বদ্ধপরিকর হও।" যারা বয়ে গেছে, তাদের মধ্যে হুট্ ক'রে ঢোকবার দরকার নেই, কারণ সেই কাজটা তোমার ও আমার একার সাধ্য নয়। যারা বয়ে যায় নি, এখনও যারা প্রধানতঃ সৎ পথেই আছে, তাদের পায়ের মাংসপেশীগুলো আমরা দৃঢ়তর ক'রে দিতে পারি। ঠিক এই কারণেই, যেখানেই যাই প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের নিয়ে আমার মাথাব্যথা খুবই কম। আমি তরুণদের নিয়েই বসি, তরুণদের সাথেই উঠি, তরুণদেরই ছবি মনের পটে আঁকি, তারুণ্যেরই করি পূজা, তাদেরই বন্দনা-গীতি গেয়ে গেয়ে বেড়াই। যদি অতিশ্রমে ও অনাহারে ম'রে না যাই, তবে একদিন পক্ককেশ বৃদ্ধ হ'য়েও আমি তরুণদেরই স্বপ্ন দেখব।

যীশুর ধর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবামনি বলিলেন,—দেখ, যীশুখ্রীষ্টের ধর্ম্মোপদেশ বড়ই উপাদেয়। তাঁর উপদেশ শুনে ইহুদীদের হয়ত রাগ করার কিছু কারণ ছিল। কিন্তু আমাদের বিরক্ত হওয়ার কিছু কারণ নেই। তিনি বলেছিলেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। তিনি বলেছিলেন, তিনি প্রাচীন সত্যকে বিনাশ করতে আসেন নি, প্রাচীন সত্যকে মানুষের মনে পরিপূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছেন। তিনি বলেছিলেন, ভালবাস সকলকে, ভালবাস প্রতিবেশীকে, ভালবাস ভগবানকে, প্রতিপালন কর ভগবানের আদেশকে। কিন্তু তাঁকে ক্রূশে বিদ্ধ হ'য়ে প্রাণ দিতে হোল। ক্রুদ্ধ জনতা হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে আক্রোশের বশে এত বড় একটা জঘন্য হিংসা ক'রে বসল কিন্তু তিনি প্রতিহিংসা-বাক্য উচ্চারণ করলেন না, তিনি সবাইকে ক্ষমা ক'রে গেলেন। তাঁর শিষ্যানুশিষ্যেরা তাঁর পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করতে গিয়ে কত লাঞ্ছনা পেলেন, কত জন প্রাণ হারালেন। আজ সেই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে কাজ ক'রে যাচ্ছেন। কিন্তু সাড়ে উনিশ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রচারের পরেও সমস্ত পৃথিবীটা খ্রীষ্টান হয় নাই। এর কারণ কি হ'তে পারে বল তো? এমন সুন্দর উপদেশ আর এমন সুসংগঠিত প্রচার-কার্য্য—যা' চালাবার জন্য অতীতে তাঁরা শত শত জনে অবহেলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন এবং যা'

প্রচারের জন্য বিগত পাঁচ ছয় শত বৎসর ধ'রে তাঁরা অগাধ অর্থব্যয় করছেন,—তা' কেন সমস্ত পৃথিবীকে খ্রীষ্টানে পূর্ণ করতে পারল না?

সুরাপানের কুফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার মতে সুরাপানই এর প্রধান কারণ। হ'তে পারে যে, ইস্রায়েল-ভূমিতে দ্রাক্ষা সুপ্রচুর ফলে ব'লে দ্রাক্ষারস সেখানকার প্রধান খাদ্য; হ'তে পারে যে, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী বা নরওয়েতে অত্যন্ত শীত ব'লে সেখানকার লোকের প্রাণ-ধারণের জন্য মদ্যপান একটা আবশ্যিক কর্ত্তব্য কিন্তু ভারতে বা এইরূপ অন্য উষ্ণদেশে খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপানের আধিক্য বাড়ল কেন? সুরাপান সবদেশেই চিরকাল কিছু কিছু লোক করেছে কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ও ইংরেজি সভ্যতা প্রসারিত হওয়ার আগে ভারতে সুরাপানের এমন ব্যাপক অভ্যাস দেখা যায় নাই। কলিকাতায় ডিরোজিও তাঁর কৃতী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে কবিত্ব ও উন্নতি-লিপ্সাই দিলেন না, দান করলেন সুরাপ্রিয়তাও। এটাকেই আবার ভারতীয় রেঁনেসাঁস বা নবসঞ্জীবন ব'লে আখ্যা দেওয়া হয়। আমার ধারণা, যীশুখ্রীষ্টের অপূর্ব্ব উপদেশ গ্রহণকারীরা যদি সুরাপান বর্জ্জন করতে পারতেন, তবে পৃথিবীকে কাণায় কাণায় খ্রীষ্টানে

পূর্ণিত ক'রে দিতে পারতেন। তোমরাও সংকল্প কর যে, ব্যভিচারের প্রতিষেধ করার সঙ্গে সঙ্গে সুরাপানেরও তোমরা প্রতিরোধ করবে। মদ খেলে উৎসাহ বাড়ে একথা যদি সত্য হয়, তবে মদ খেলে বুদ্ধিবিকার ঘটে, একথা তার চেয়েও বেশী সত্য। তোমরা প্রতিজ্ঞা কর, পড়াশুনার জন্য বিলেতে যেতে হ'লেও কেউ মদ ছোঁবে না। মদ্য প্রয়োজন সেই সৈনিকের, যাকে ইহকাল পরকাল বিস্মৃত হ'য়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বেপরোয়া হ'য়ে মানুষ খুন করতে হবে। মদ খাবে সেই দুষ্ট দুশ্চরিত্রেরা, নারী-মাত্রকেই ভোগ্যা জ্ঞান ক'রে যারা প্রকাশ্য দিবালোকে করবে তাকে ধর্ষণ। মদ খাবে সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্ব্বরেরা, পরের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার সম্পদ-রাশি লুণ্ঠন করতে বা ধ্বংস করতে যারা আনন্দ পাবে। মানুষকে অমানুষ করতে মদের প্রয়োজন, অমানুষকে মানুষ করার জন্য প্রয়োজন মদ্যপান-বর্জ্জন, সংযম-সাধনা এবং ব্রহ্মচর্য্য-পালন।

ব্যভিচারী ও তার সমর্থকেরা দেশের শত্রু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তারাই জগতের ঘৃণ্য, তারাই মনুষ্য-সমাজে বন্য, যারা নারীর মর্য্যাদাহানিতে সহায়তা করে, প্রশংসা করে, প্রশ্রয় দেয়। তাঁরাই জগতে ধন্য, তাঁরাই

সমাজে বরেণ্য, যাঁরা নারী-মাত্রকে মাতা বা ভগিনী জ্ঞান ক'রে তার সম্মান রক্ষার কাজে নির্ভয়ে আত্মোৎসর্গ করেন। একদা নারী-মাত্রেই অবারিতা ছিল। যে-কেউ যে-কোনও সময়ে, যে-কোনও অবস্থায়ই তাদের টেনে নিলে কোনো পক্ষেই আপত্তির কিছু থাক্‌ত না। সম্পর্কের কোনও বালাই ছিল না, কে কাকে লঙ্ঘন করতে পারে না, তার কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। জোর যার মুল্লুক তার, এই নৈরাজ্য-নীতির উচ্ছৃঙ্খলতাই ছিল স্বাভাবিক। সেই দিন চলে গেছে। সেই ঘৃণ্য দিনটাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে নীতিভ্রষ্ট ব্যভিচারীরা আর ইন্দ্রিয়াতুর সাহিত্যিকরা। এরা সভ্যতার শত্রু। অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রে অনেক রকমের দুঃখ পেয়ে পেয়ে, নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যে সমাজ-চেতনা মাতাকে গরীয়সী, ভগিনীকে অগম্যা, আপন স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীকে অনতিক্রমণীয়া করেছে, তারই ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে সভ্যতার হবে অগ্রগতি। আমরা আমাদের অনাচার দিয়ে লক্ষ বছরের পুরাণো ইতিহাস এবং তার সুফলকে বিনষ্ট ক'রে দিতে পারি না। যদি সে কুকাজই আমরা করি, তবে সবাই ফিরে যাব বর্ব্বরতার অন্ধ-তমসাবৃত মৃত্যু-গহ্বরে। আর্টের নাম ক'রে পারি না, কাব্যের নাম ক'রে পারি না, সংস্কৃতির নাম ক'রে পারি না। নিজের অবচেতন ইন্দ্রিয়-লালসাকে প্রকারান্তরে গৌণ এক চরিতার্থতা প্রদানকে কৃষ্টির

পরিচয় এবং সংস্কৃতির উন্নতি ব'লে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া ভুল হবে। কাব্যের ভাষায় দর্শনশাস্ত্র ব'লে বা দর্শনের ভাষায় কাব্য রচনা ক'রে আমরা ইতিহাসকে উপহাস করতে পারি না। যে সাধনা ক'রে বনমানুষেরা মানুষে পরিণত হয়েছে, সেই সাধনার পথেই আমাদিগকে চলতে হবে। যে সংযমের পথ আশ্রয় ক'রে সাধারণ মানুষ অমানব অসাধারণত্বে উন্নীত হয়েছে, সেই পথই আমাদের সুপথ, একথা ভুলতে যাওয়া ভুল। একথা অপরকে ভুলিয়ে দিতে যাওয়া মারাত্মক সামাজিক অপরাধ। যে কাম-কণ্ডূয়ন তোমাকে তোমার গৃহকোণে গোপনে বিহ্বল করছে, তাকেই তুমি সাহিত্য ও শিল্পের লেবেল এঁটে যুবসমাজে হাজির ক'রে দিতে পার না। তোমার ঐ অশালীন চটুলতা হাজার হাজার মানুষের ক্ষতিসাধন করবে। এই সকল কু-সাহিত্যের ফলে এমন দুর্দ্দিন এল ব'লে, যে দিন পার্কে, রেঁস্তোরায়, ময়দানে, রাস্তার মোড়ে, শুঁড়ি খানায়, স্কুল-কলেজের বাথরুমে, ট্রেণের পায়খানায়, বস্তির নোংরা ঘরে এবং জাত-গণিকার আশ্রয়ে স্কুল-কলেজের ছেলে-ছোকরারা জোড়ায় জোড়ায় তরুণী সংগ্রহ ক'রে কেবল মদ গিলবে আর কুকাজ করবে। এর ফলে পারিবারিক জীবন তার সৌরভ হারাবে, গৃহস্থালীর মৌচাক মধু হারাবে, বন্ধুত্বের যমুনা-প্রবাহ তার স্বচ্ছতা হারাবে, দম্পতিদের হৃৎপিণ্ডগুলি স্পন্দন হারাবে। এই

দুরবস্থার সৃষ্টির জন্য দায়ী থাকবে সাহিত্যিকরা। রামায়ণে সীতাহরণ আছে, মহাভারতে দ্রৌপদীকে উলঙ্গ করবার জন্য বস্ত্রাকর্ষণ আছে, ভাগবতে গোপীদের বস্ত্রহরণ আছে, এই যুক্তিতে অশ্লীল সাহিত্য রচনা ক'রে যাঁরা যুবক-যুবতীদের মুণ্ড-চর্ব্বণ করছেন, তাঁরা দেশের শত্রু, জগতের শত্রু, সভ্যতার শত্রু।

সৎকর্ম্ম জগতের প্রতি তোমার সেবা

জনসেবা সম্পর্কে কথা হইতেছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাবাহে, কাজ তোমরা অল্পই করো, কিন্তু যে যতটুকু কর, আন্তরিকতার সঙ্গে ক'রো, ভাণবর্জ্জিত ভাবে ক'রো। কুতর্ক, বৃথা প্রজল্প, অন্যায় জেদ, রেশারেশি, আত্মগরিমা ও সবজান্তার ভাব যেন তোমাদের কর্ম্মকে কলুষিত না করে। কুতর্ক আর বৃথা প্রজল্প আসে নিজেকে জ্ঞানী ব'লে অভিমান করার ফলে। জেদ আর রেশারেশি আসে কর্ত্তৃত্বলিপ্সা থেকে। কর্ম্মী যদি হ'তে চাও, তবে প্রাণপণে এই দুটী দোষকে বর্জ্জন কর। হাজার সেবক একটী কাজ নির্ব্বিবাদে ক'রে যেতে পারে কিন্তু দুটী তিনটী কর্ত্তা হ'লে তারা কেবল কলহ করে। কে বড়, কে ছোটর বিচার ছেড়ে দাও। সৎকর্ম্মই জগতের প্রতি তোমার সেবা।

এতে তোমার নিজের লাভ যদি নাও থাকে, সমগ্র জগতের ত' লাভ আছে। ওটা তোমার সব চেয়ে বড় লাভ। সে-ই জগতে শ্রেষ্ঠ সেবক, যে অন্তরে বাহিরে নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ। কিছু কিছু স্বার্থ নিয়েও যদি লোকে সৎকাজ করে, তবে তাও অপ্রশংসার নয়। কিন্তু সৎকাজকে উপলক্ষ্য ক'রে স্বার্থসেবা নিতান্ত গর্হিত।

নিষ্কাম প্রেম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরমেশ্বরের নাম-সাধকেরা নিঃস্বার্থ-চিত্তে জীবসেবার উপদেশ দিয়ে থাকেন। কোনো কোনো সাধক ঈশ্বর-প্রেমকেও নিজেদের স্বার্থবোধ থেকে মুক্ত রাখতে চান। তাঁরা বলেন, তাঁকে যে আমি ভালবাসি, তাঁর চরণে যে অন্তরের প্রেমাঞ্জলি প্রদান করি, তাও আমার কোনো তৃপ্তি, কোনো আনন্দ, কোনো উল্লাস, কোনো গৌরব বা কোনো গৌণ বা প্রত্যক্ষ স্বার্থের জন্য নয়। তাঁকে আমি ভালবাসি, প্রতিদানে তাঁর ভালবাসা, তাঁর স্নেহ, তাঁর করুণা প্রভৃতি পাওয়ার কণামাত্র আশা না ক'রে, কণামাত্র প্রত্যাশা না রেখে। তিনি নিত্যমঙ্গলময়, তিনি নিত্যসুখদ পরাৎপর। আমাকে কিছু দিতে হ'লে তিনি সময় বুঝে নিজের ইচ্ছাতেই ত' দেবেন। তিনি আমাকে কোটি জন্মও যদি সর্ব্বসুখে বঞ্চিত রাখেন, তবে তাই হবে আমার শিরোধার্য্য। এটা দাও

ওটা দাও ব'লে তাঁকে বিরক্ত করা নিরর্থক। তাঁকে আমার হুকুমের চাকর মনে ক'রে অবিরাম শুধু বস্তু, অবস্থা বা ভাব লাভের প্রার্থনারও আমার দরকার নেই। আমি নিয়ত তাঁর নাম স্মরণ কর্ব্ব এবং নাম করার ফলে যখন যে ভাল বা মন্দ বস্তু, ভাল বা মন্দ অবস্থা, ভাল বা মন্দ ভাব উপলব্ধিতে পাই, তাকেই প্রিয়াপ্রিয়বোধবর্জ্জিত হ'য়ে গ্রহণ কর্ব্ব, মেনে নিব।

নিষ্কাম প্রেমের মহিমা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এমন নিষ্কাম প্রেম যার আসে, জগতে সে মহাভাগ্যবান্। তাঁর দেহ কাম-বিকারের ঊর্দ্ধে উঠে যায়, তার মন রিপুকুলকে অনায়াসে দাসানুদাস ক'রে ফেলে, তাঁর প্রাণ থাকে অবারিত উন্মুক্ত উদার, তাঁর আত্মা হয় বিশ্বাত্মার সঙ্গে মিলিত, তাঁর অস্তিত্বের মাঝে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান এই ত্রিকালের হয় সমন্বয়, তাঁর শরীরের প্রতিটি রোমকূপে বৃন্দাবনের মোহন বাঁশরী নিরন্তর বাজতে থাকে, তাঁর দেহের প্রতিটি অণুপরমাণুতে লক্ষ কোটি দেবতার জন্য তীর্থস্থান নির্ম্মিত হয়।

পূর্ব্বদীক্ষিতের পুনর্দীক্ষা

একটী বিবাহিতা মহিলা স্বামী সহ কোনও খ্যাতিমান

সদ্‌গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এমন কতকগুলি উপদেশ পাইয়াছিলেন, যার কার্য্যকারিতা ও পরিহার্য্যতা সম্পর্কে উপদেশ পাইবার আর কোনো উপায় নাই। কারণ, গুরুদেব দীর্ঘকাল মরদেহ ত্যাগ করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিয়াছেন। মহিলাটী বলিলেন যে, তিনি নিজ স্বামীর অনুমতি লইয়াই শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে কতকগুলি বিষয় জানিয়া নিতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণির কৃপা হইলেই তিনি সব প্রকাশ করিয়া বলিবেন। প্রয়োজন হইলে তিনি স্বামী সহ বাবামণির কাছে নূতন করিয়া দীক্ষাও নিতে প্রস্তুত আছেন। কথাবার্ত্তা একান্তে হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একান্তে আমি কখনো কোনো মহিলার সহিত কথা বলি না। সুতরাং তুমি তোমার বক্তব্য কাগজে লিখে জানালে নিশ্চয়ই চল্‌তে পারে। কিন্তু আমি পূর্ব্বদীক্ষিত কাউকে পুনরায় দীক্ষা দিতে আগ্রহী নহি।

মহিলাটী বলিলেন যে, তিনি কাগজে সব বৃত্তান্ত লিখিয়া আনিয়াছেন এবং জানিতে চাহিলেন যে, পূর্ব্বদীক্ষিতকে পুনরায় দীক্ষা দিলে দোষ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একজন একটা পথে কিছুকাল চলার পরে তাকে আবার নূতন আর একটা পথে চলার নির্দ্দেশ দেওয়ার ভিতরে ভাব-ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে এবং গুরুতর দায়িত্বও আছে। যে যেখানে যে ভাবের দীক্ষা পেয়েছে, তাকে সেই ভাবে সেই পথে চল্‌তে উৎসাহ দান

করাই প্রত্যেক গুরুর কর্ত্তব্য। এই জন্যই আমি পুর্ব্বদীক্ষিতকে পুনরায় দীক্ষা দিতে অনাগ্রহী। একটা পথ ছেড়ে যারা আবার নূতন পথে চল্‌তে শুরু করে, তাদের অনেকে হয় পথে বারংবার থেমে যায়, নয় তো দুটা পথকে মিলিয়ে একটা জট পাকিয়ে বসে। একাধারে হিন্দু এবং মুসলমান বা একাধারে মুসলমান ও খ্রীষ্টান বা একাধারে খ্রীষ্টান ও ইহুদী থাকা যেমন শক্ত ব্যাপার, একাধারে বৈষ্ণব এবং শাক্ত বা একাধারে শাক্ত এবং ব্রাহ্ম থাকাও তেমন শক্ত ব্যাপার। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের তোড়ে প'ড়ে অনেক সময়ে দুটো পথের প্রত্যেকটাকেই সমভাবে অবহেলা করে। যাই কর মা, একটা পথেই থাক্‌তে হবে।

অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিকেল বেলা স্বামী সহ এসো। সব প্রয়োজনীয় কথা ব'লে দেব।

তুমি পার্ব্বতী, তুমি মহেশ্বর

অপরাহ্নে জিজ্ঞাসু দম্পতীর আগমন হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি তাহাদের দুজনকে একটা নির্জ্জন ঘরে নিয়া গিয়া বসাইলেন এবং একটী শ্রুতলিপি-লেখককে বলিলেন যে, যাহা-কিছু শ্রীশ্রীবাবামণির মুখ হইতে নিঃসৃত হইবে, তাহা যেন সে সঙ্গেসঙ্গে লিখিয়া লয়। উহার কার্ব্বণ-কপিটি দম্পতীকে দিয়া দিতে হইবে এবং মূল লেখাটির কপি শ্রীশ্রীবাবামণির হাতে থাকিবে।

আলাপ-প্রসঙ্গে প্রকাশ পাইল যে, দম্পতী মাত্র একটী গুরুর কাছেই উপদেশ গ্রহণ করেন নাই, পরন্তু বামাচারী শাক্ত গুরু, কুলাচারী শাক্ত গুরু, কিশোরী-ভজন মতাবলম্বী বৈষ্ণব গুরু এবং পশ্চিমবঙ্গের কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের আউল গুরু তথা বীরভূমের বাউল গুরুদের কাছ হইতেও পর পর অনেক উপদেশ নিয়াছেন এবং প্রত্যেকের কাছ হইতে নানাবিধ যৌনব্যবহারের রীতি ও যৌন-মুদ্রা শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের একান্ত বিশ্বাস যে, এই জাতীয় সঙ্গম-ক্রিয়ার মধ্য দিয়াই তাঁহারা পরমেশ্বরকে পাইয়া যাইবেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোন্‌টা ভাল পেয়েছ, কোন্‌টা মন্দ পেয়েছ, তার বিচার আমি কর্ব্ব না। তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল সৎ। তাই আমি তোমাদের উপদেশ-দান অবশ্যই কর্ব্ব। মনে মনে ভাব, তুমি হচ্ছ মা পার্ব্বতী, কার্ত্তিক এবং গণেশের গর্ভধারিণী, লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর জননী, সর্ব্বপ্রকার কামলালসার ঊর্দ্ধে তোমার মন, তোমার দেহস্থিত ভোগেন্দ্রিয়টী হচ্ছে কামরূপ-কামাখ্যার তীর্থপীঠ, তোমার যোনি সম্ভোগের স্থান নয়, ওটি হচ্ছে পূজার অঞ্জলি দেবার পুণ্য বেদী। আর তুমি ভাব, তুমি হচ্ছ শিব মহেশ্বর, দেবাদিদেব মহাদেব, কাম তোমাকে স্পর্শ কত্তে পারে না, তোমার ভ্রূকুটি-ভঙ্গিতে মদন যায় ভস্ম হয়ে, তোমার লিঙ্গ ব্রহ্মপ্রতীক হ'য়ে বিশ্বময় কোটি কোটি স্থানে ওঁ নমঃ শিবায়

ব'লে পূজিত হচ্ছে। প্রত্যহ এভাবে এক ঘণ্টা ক'রে দুজনে মিলে ধ্যান অভ্যাস কর্ব্বে। তার ফলে যা' হবার, তা' আপনা আপনি হবে, তোমাদিগকে আর অন্য কোনও প্রকারের পুরুষকার প্রয়োগই কত্তে হবে না।

স্বামীটী জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্বামিস্ত্রী-ব্যবহার কি বন্ধ ক'রে দেব?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংসারী মানুষ সহজে যৌনব্যবহার ত্যাগ কত্তে পারে না। যতটা পার, সংযত থাক্‌বে। যে উপদেশ দিলাম, তাই সুদীর্ঘকাল পালন ক'রে যাও। জীবনে অভাবনীয় কিছু আস্বাদন একদা কর্ব্বেই কর্ব্বে।

সমস্ত উপদেশগুলি সঙ্গে সঙ্গে লিখিত হইয়া গেল। এক খণ্ডে শ্রীশ্রীবাবামণি নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। বলিলেন,—সব কথা হয়ত সর্ব্বসময় মনে থাক্‌বে না, এজন্য লিখে দেওয়া হ'ল। এগুলি যে আমারই প্রদত্ত উপদেশ, তার প্রমাণ-স্বরূপ তারিখ সহ আমার নাম স্বাক্ষর রইল। আমার কাছেও একটী অনুলিপি থাকুক। ওতে তোমরা স্বাক্ষর ক'রে দিয়ে যাও।

দম্পতী চলিয়া গেলে শ্রুতিলেখক জিজ্ঞাসা করিলেন,—এগুলি লিখে রাখ্‌বার তাৎপর্য্য আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু নামস্বাক্ষরের তাৎপর্য্য বুঝতে পারি নি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সব ব্যাপারই যে বুঝতে হবে, তার মানে কি?

ক্রোধ ও আত্মসম্মানজ্ঞান

দুইটী উদ্ধত যুবক পরস্পরকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছে। দুই জনেই কিছু ভক্ত সংগ্রহ করিয়াছে, যাহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক এক জনের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হঠাৎ শ্রীশ্রীবাবামণি সেখানে আগমন করিলেন। দুজনেই পরস্পর হইতে একটু দূরে সরিল। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি দুই হাতে দুই জনের দুই করতল ধরিয়া টানিয়া কাছে আনিলেন। বলিলেন,—তোমরা ত' কত্তে যাচ্ছ যুদ্ধ। অর্থাৎ ভীমবধ কাব্য হবে, নইলে হবে দুর্য্যোধনবধ কাব্য। আর ঐ যে এতগুলি লোক তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, তারা কিন্তু একজনেও আর দাঁড়াবে না, যখন দেখ্‌বে যে, তোমাদের একজন ভূতলশায়ী হয়েছ, বেজায় হারা হেরেছ, মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছ। তোমরা দেখাচ্ছ সার্কাস, আর আমরা এতগুলি বাইরের লোক বিনা টিকিটে তা' দেখ্‌ছি আর মনে মনে আমোদ উপভোগ কচ্ছি। অথচ তোমাদের চেহারা এক এক জনের কি চমৎকার এবং কত তোমরা সুন্দর। কিন্তু ক্রোধ নামে এক চণ্ডাল অলক্ষ্যে তোমাদের ভিতরে প্রবেশ ক'রে তোমাদিগকে একেবারে অন্ধ ক'রে দিয়েছে। তোমরা ভাবছ, তোমরা বীরত্ব দেখাচ্ছ, কিন্তু দর্শকেরা সবাই মনে মনে ভাব্‌ছে যে, ছেলে দুটা কি আহাম্মক যে, বুঝতে পাচ্ছে না, ঝগড়ার মীমাংসা মারামারি দিয়ে হয় না। শত্রু তোমার

সামনে নয়, শত্রু তোমার মনে। মনের শত্রুকে চামড়ার চোখে দেখ্‌তে পাওনি ব'লেই সে ছদ্মবেশ ধরেছে আত্ম-সম্মান-বোধের। কি, আমাকে কর্ল্ল অপমান? এটা অসহ্য। কেমন তাই কিনা বল ত'।

আত্মকলহ বর্জ্জন কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আত্মকলহ সর্ব্বদা বর্জ্জন কর্ব্বে। তোমার আত্মীয় বা প্রতিবেশী তোমাকে কিছু মন্দ কথা শুনিয়েছে ব'লেই যদি তুমি তার গৃহে অগ্নি সংযোগ কত্তে ছুটে যাও, একজন তোমার কুৎসা করেছে ব'লেই যদি তুমি তার মুণ্ডচ্ছেদ কত্তে যাও, তাহ'লে জান্‌বে, তোমার নিজ গৃহে অগ্নি-সংযোগের দিনটী বেশী দূরে নয়। তোমার নিজের মুণ্ডটীর ধরাতলে গড়াগড়ি দেবার তিথিটি সন্নিকটবর্ত্তী হ'য়ে এসেছে। একথা সত্য ব'লেই পৃথিবীতে যখনি যে মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে, তখনি তিনি বলেছেন, শান্তি দাও, শান্তি পাও, অশান্তি বর্জ্জন কর। যেখানেই যাও, বিনা কলহে শান্তিতে বাস কর্ব্বার চেষ্টা কত্তে হবে। বারংবার বাসস্থান পরিবর্ত্তন কত্তে কত্তে শেষটায় ইহুদীদের মত দুরবস্থায় না পড়। দেখ, তারা মিশরে ছিল ফ্যারাও-(সম্রাট)দের ক্রীতদাস। দলবদ্ধ হ'য়ে মোজেসের নেতৃত্বে চলে এল ভূমধ্যসাগর পার হ'য়ে ইসরাইলভূমিতে। কিন্তু উৎপীড়ন-

কারীদের উৎপীড়নে স্বদেশ ছেড়ে কিছু কিছু ক'রে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়্ল। কিন্তু তারা যেই দেশেই গেল, নিজের ধর্ম্মকে ত্যাগ কর্ল্ল না, খ্রীষ্টানও হ'ল না, মুসলমানও হ'ল না। এক একটা ইহুদীর জীবন যেন এক একটা বিয়োগান্ত নাটক। কিন্তু ইহুদীরা যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, সুতরাং খ্রীষ্টান-মাত্রেই ইহুদীদের প্রতি রুষ্টভাবাপন্ন। ইহুদীরা এখনো কতক কতক সংখ্যায় আরবদের দ্বারা অধ্যুষিত অঞ্চলে বাস কচ্ছে এবং শত চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলমান হচ্ছে না, অতএব আরবেরাও তাদের বিরোধী। এত বিরোধের মধ্যে থেকেও তারা নিজেদের ঘর গুছাতে চিরতৎপর রয়েছে। মহাপুরুষ মোজেসের শিক্ষা তারা পরিত্যাগ কত্তে প্রস্তুত নয়। শান্তিপ্রিয় থাক, শান্তি প্রার্থনা কর, সকলকে শান্তি দাও, এইটাই হওয়া উচিত তাদের মনোভঙ্গী, যারা দীর্ঘকাল পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাক্তে চায়। সকলে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাক, সকলের সঙ্গে একমন একপ্রাণ হবার চেষ্টা কর কিন্তু নিজের আদর্শ বিসর্জ্জন দিও না। নানা দেবদেবীর পূজা ক'রে দুর্ব্বলতা আহরণ ক'রো না, সর্ব্বদেবময় পরমেশ্বরই তোমাদের একমাত্র আরাধ্য হউন।

কান্নার লাভ

শোকতাপে জর্জ্জরিত একটী মহিলা আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল শ্রীশ্রীবাবামণির চরণপ্রান্তে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

ওঠ মা ওঠ। কান্না যখন পেয়েছে, তখন কাঁদো। কান্না সব সময়েই খারাপ নয়। অনেক সময়ে কান্না অন্তরের টনিকের কাজ করে। কাঁদতে কাঁদতে মন হাল্‌কা হ'য়ে গেলে কান্না থাম্‌লে সে আর এক শান্তি। কান্না ভাল, কিন্তু কান্নাকাটি ভালো নয়। বর্ষা ভাল কিন্তু সারা বৎসর জুড়েই যদি বর্ষা থাকে, তবে তা' ভাল নয়। কাঁদতে শুরু কর্ল্লাম, ত' কেবল কাঁদতেই থাক্‌লাম, সাত দিনের মধ্যেও বাদল আর থামল না, একবারের জন্যও সূর্য্যের কিরণ চোখে পড়্‌ল না, এমন পচা বর্ষা ভালো নয়। কিছুক্ষণ কেঁদে একটুখানি থেমে একবার দেখে নাও যে, এই কান্নায় লাভ কিছু হ'ল কিনা। কান্না যখন ঈশ্বর-প্রেরিত বস্তু, তখন তার ফলে জীবনের লাভ কিছু না কিছু হবেই হবে। সেই লাভটুকুকে দেখ্‌তে পাওয়া চাই। সেই লাভটুকু তুল্‌তে পারা চাই। কেবল কাঁদলুম, লাভ কিছুই পেলুম না, এমন কান্না নিরর্থক।

তিনি চিরকাল আছেন

ভদ্রমহিলার কান্না থামিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— যাঁকে হারিয়েছ, তিনি তোমার পরম আত্মীয়-রূপে এসেছিলেন কিন্তু স্বরূপেতে তিনি স্বয়ং ভগবান্। আবার তিনি যাঁর কাছে চলে গেলেন, তিনিও স্বয়ং ভগবান্। আবার দেখ, তিনি যাঁর কাছ থেকে এসেছিলেন, তিনিও ভগবান্। তিনি যাঁর কাছে

বা যাঁদের কাছে এসেছিলেন, তিনি বা তাঁরাও ভগবান্। অথচ ভগবান্ অনেকগুলি নেই, ভগবান্ শুধু একটী মাত্র জন। তিনি কেমন ক'রে এক থেকেও বহু হ'লেন আবার বহু হ'য়েও একে মিশে গেলেন, পৃথক্ অস্তিত্ব তাঁর কিছু আর রইল না, এটাও এক পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার। একটু ভেবে দেখ। তাহ'লেই অত ঘন ঘন আর কান্না পাবে না। যিনি চলে গেছেন, তিনি যেমন চলে গেছেন, তেমন আবার তোমার মধ্যে রয়েও গেছেন। যাঁর বিরহে অত জ্বালা, তিনি তোমার সাথে নিত্য মিলনে শাশ্বত ভাবে যুক্ত। তিনি চলে গিয়েও তোমাতে রয়ে গিয়েছেন। তিনি ফিরে না এসেও তোমাতেই আছেন। নিজের ভিতরে যদি গভীর ভাবে ডুবতে পার, তবে তাঁর সঙ্গেই তোমাকে আর তোমার সঙ্গেই তাঁকে একত্র পেয়ে একেবারে অবাক্ হ'য়ে যাবে।

নামাশ্রয়ী হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাঁরই মধুময় স্মারক মন্ত্র হচ্ছে সেই নাম, যেই নামে গুরু তোমাকে দীক্ষিত করেছেন। সর্ব্বদা নামে মন লাগিয়ে রাখ। একটী নিমেষের জন্যও মনকে নাম থেকে বিযুক্ত হ'তে দিও না। এই নাম যে তাঁরই নাম, এই শুভস্মৃতিটুকু যেন তোমার কখনো না অনুজ্জ্বল হয়। নামের অফুরন্ত মহিমায়, নামের অশেষ কৃপায় তোমার

সর্ব্বশুভ সম্পাদিত হবে। নামে নির্ভর কর, নামে বিশ্বাস কর, নামাশ্রয়ী হও।

মন্ত্রজাগরণ ও মন্ত্রচৈতন্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মন্ত্রজাগরণ? নামের চৈতন্য সম্পাদন? নামের রুচি থেকেই তা' আপনা আপনি হয়। তার জন্য আলাদা কোনো অনুষ্ঠানের প্রয়োজন পড়ে না। নাম যে সত্য, নাম যে নিত্য, নাম যে অমূল্য ধন, এই কথা নিরন্তর স্মরণে রাখারই অন্য সংজ্ঞা হচ্ছে মন্ত্রজাগরণ। এ নাম যে তাঁরই নাম, এই নাম আর তিনি যে অভেদ, এই স্মৃতিতে, এই অভিজ্ঞানে, এই বোধে অবিচল থাকারই নাম মন্ত্রচৈতন্য। ক্ষণে ক্ষণে হয়, আর ক্ষণে ক্ষণে লয়, এরূপ নয়। সর্ব্বসময় এই বোধটী জাগ্রত রইল। তার নাম মন্ত্রজাগরণ। শোক-দুঃখে যতই ব্যাকুল হও, কেবলি নাম ক'রে যাও।

অবতার

একটী গৌরবর্ণ সুন্দর সুগঠিত চেহারার যুবক আসিয়া একখানা ফটো দেখাইয়া বলিল,—বলুন ত' স্বামীজী, ইনি অবতার কিনা?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাবা হে, আমার দৃষ্টিতে

তুমিও অবতার। পরমেশ্বরের কাছ থেকে ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে তুমি অবতরণ করো নি। তোমার জীবন-ধারণেরও লক্ষ্য ভূভারহরণ, সর্ব্বজীবের দুঃখ-বিতাড়ন, সর্ব্বশঙ্কা-বিনাশন, সাধুগণের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতগণের বিনাশ। তুমিও এই কাজেই যুগে যুগে জন্মগ্রহণ কচ্ছ। আমি, তুমি, রাম, শ্যাম, যদু, মধু জগতে প্রত্যেকেই পরমেশ্বরের অবতার। কৃষ্ণ জানতেন যে, তিনি অবতার, তুমি জান না, এই মাত্র পার্থক্য। যীশু জানতেন, তিনি অবতার, তুমি জান না। মহম্মদ জানতেন তিনি প্রেরিত পুরুষ, তুমি নিজেকে তা' ব'লে জানো না। পার্থক্যটা জ্ঞানবত্তার আর অজ্ঞানতার। তোমাকে কষ্ট ক'রে কথাটা জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং সেই জ্ঞান আসার সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী কাজ কত্তে হবে। এইটুকুর মাত্র অপেক্ষা।

যুবকটী স্তম্ভিত হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণির মুখের পানে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ টিপ করিয়া একটী প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

একজন প্রশ্ন করিল,—এত তাড়া কিসের?

যুবকটী বলিল,—আমি দেখতে পাচ্ছি, ইনি যেন আমাকে তার চক্ষু দুটী দিয়ে গিলে ফেলছেন। বাবামণি অতি সাংঘাতিক মানুষ, আমার ভয় কচ্ছে।—বলিতে বলিতে ছেলেটী কাঁদিয়া ফেলিল।

দধীচির দান

সাম্প্রতিক কতকগুলি ঘটনা লইয়া কথা হইতেছিল। জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন,—এর সমাধান কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমস্যা সকল যুগেই ছিল, এবং থাক্‌বে। তার সমাধানও যুগোপযোগী ভাবে হবেই হবে। সমস্যা আছে অথচ সমাধান নাই, এমন কখনো হয় না। তবে প্রয়োজন হচ্ছে সাহসের, ধৈর্য্যের আর নিষ্ঠার। তিনটী জিনিষই আসে চরিত্রবল থেকে। সুতরাং অক্ষত, অক্ষুণ্ণ, অকলঙ্ক চরিত্র লাভের মধ্যেই সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। চরিত্রের চর্চ্চা আদর্শাপেক্ষ। চোখের সম্মুখে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখতে পেলে বাক্যময় উপদেশের বেশী প্রয়োজন হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকেরা যখন দলে দলে লড়্‌ছে, মরছে আর জিতছে, তখন সেনা-সংগ্রহ সহজ কাজ। তখন প্রাণের ভিতরে আপনা আপনি সামরিক উদ্দীপনা জাগে। ইয়োরোপের অধিকাংশ জাতি, আরব থেকে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডের নানা জাতি জীবনের জয়ধ্বনি শুনেছে যুদ্ধের পরিবেশে। কিন্তু ভারতবর্ষ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীর বৃংহণধ্বনি, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনার ভিতরে প্রকৃত জীবনকে খুঁজে পায় নাই। পেয়েছে আস্ফালন-বর্জ্জিত সর্ব্বত্যাগের মোহন-মন্ত্রে। পেয়েছে, গৌতমের রাজসিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে সমগ্র জগতের হিতকল্পে বোধি অর্জ্জনের

চেষ্টায় আত্মদানে। ভারতের অতীত যুগে ঋষিরা অধিকাংশেই পরার্থজীবী, তাই ভারত তার জীবনের জয়টীকা অর্জ্জন কর্ত্তে চেয়েছে পরার্থে আত্মোৎসর্গে। দধীচি একটী নাম, যে নামটী ভারতীয় চিন্তার জগতে একটী অপ্রতিদ্বন্দী নাম, সহস্র যোজন অন্তরে স্থাপিত যেন একটী মাইল স্টোন (mile stone)। নিজের স্বার্থের জন্য নয়, জগতের স্বার্থের জন্য জীবন-দান এর বিশেষত্ব। ছোট দান দিয়ে সে তুষ্ট নয়, বৃহত্তম দান, মহত্তম দান, সর্ব্বস্ব-উৎসর্গ-করা দান হচ্ছে এর বিশেষত্ব। দান কর্ব্ব, প্রতিদানে কিছুই চাই না, ধন না, মান না, যশ না, প্রতিপত্তি না। চাইব না কর্ত্তৃত্ব, চাইব না নেতৃত্ব, চাইব না রত্নখচিত স্বর্ণ-সিংহাসন, চাইব না ইতিহাসের স্তুতি, চাইব না শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি। এরই নাম দধীচির দান।

দধীচি কি পক্ষপাতী ছিলেন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠ্‌তে পারে যে, দধীচি ত' দেবতাদের স্বার্থেই আত্মত্যাগ করেছেন, যেই দেবতারা অনেকেই ঋষিদেরই সন্তান, যে দেবতারা কেউ কেউ ঋষিদেরই আরাধ্যও। নিজের দলের লোকদের জন্য আত্মদান কর্ল্লে তাতে দলেরই হিতসাধন হয়, বিশ্বের সেবা হয় না, কিন্তু এটাও ত' বিবেচ্য যে, কোনো কোনো দেবতা ঋষিদের অনেকের সঙ্গে মিত্রতা না ক'রে শত্রুতাই বরং

করেছেন। ইন্দ্র ত' দধীচির একজন প্রসিদ্ধ শত্রু। সেই ইন্দ্র এসে যখন দেবতাদের মঙ্গলার্থে দধীচির অস্থি প্রার্থনা কর্লেন, তখন ত' নিশ্চয়ই দধীচি ইন্দ্রের প্রস্তাবে অনভিমত প্রকাশ কত্তে পাত্তেন। কেননা, পরম শত্রুর সহায়তা করা আর নিজের সঙ্গে শত্রুতা করা এক কথা। কিন্তু তিনি দেখ্লেন, দেবতারা বিপন্ন, তারা নিরাশ্রয়, তারা স্বদেশ-নির্ব্বাসিত গৃহহীন উদ্বাস্তু। উৎপীড়িত মানবতার প্রতি ঋষির সহানুভূতি হবে না ত' হবে কি সাধারণ লোকের? একদল লোক যখন উৎপীড়িত হ'য়ে দেশ থেকে দেশান্তরে প্রাণভয়ে সর্ব্বস্ব ফেলে পলায়ন করে, তখন অনেকেই ত' এদের দুর্ভাগ্যের সুযোগে নিজেদের সৌভাগ্য নির্ম্মাণে হয় ব্যস্ত। দেবতারা উৎপীড়িত হ'য়ে ভিটেমাটি-চ্যুত হয়েছিলেন, তাঁরা নিরাশ্রয় ও অত্যাচারিত। বিপন্নের পক্ষ যে আশ্রয় করে, সেই ত' প্রকৃত মানুষ। দৈত্যেরা যুদ্ধে পারদর্শী ও প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়িষ্ণু হ'লেও স্বভাবে তারা উৎপীড়ক, একথা ত' প্রসিদ্ধ। কিন্তু দৈত্যেরা যদি দেবতাদের মত জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হ'য়ে বিপন্ন হ'ত, তা' হ'লে দধীচির মত ঋষিরা ঐ দৈত্যদের হিতার্থেই নিঃসঙ্কোচে আত্মোৎসর্গ কত্তেন। দধীচিরা চিরকাল দুর্ব্বলের পক্ষে থাকেন, বিপন্নের রক্ষায় জীবন দান করেন। কারো প্রতি তাঁদের কোনো পক্ষপাত নেই, থাক্তে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বারংবার

রাষ্ট্রনৈতিক পট-পরিবর্ত্তন এসেছে, তখন নীরব নিভৃত নিবাসে জীবনগঠনকারী আত্মত্যাগী দধীচিরা উৎপীড়িতের দুঃখবিনাশের জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দেন। দধীচিরাই আমাদের আদর্শ।

মণ্ডলী-স্থাপনে সেবকত্বের প্রয়োজনীয়তা

চট্টগ্রামবাসী জনৈক সহকর্ম্মীকে শ্রীশ্রীবাবামণি স্থানে স্থানে অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপনের জন্য প্রেরণ করিতেছেন। তদুপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যেখানেই সম্ভব হয়, ছোট্ট ক'রে হ'লেও একটি অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন করা সঙ্গত। উদ্দেশ্য হবে, সমসাধক ও ঈশ্বরবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রীতির প্রতিষ্ঠা, ঐক্যের স্থাপন এবং মমত্ব-বোধের প্রসার। এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে হ'লে সকলের চাই সেবকের মনোভাব, কর্ত্তৃত্বের অহমিকা নয়। তোমার উচ্চারণ ভাল, এটা তোমার গুণ হ'তে পারে; তুমি সুরজ্ঞ, এটা তোমার প্রশংসার কারণ হ'তে পারে; তুমি মণ্ডলীর কাজে অনেক স্বার্থত্যাগ কর, এটা তোমার বিশিষ্টতা হ'তে পারে; নেতৃত্ব-পরিচালনের দক্ষতা তোমার বেশী আছে, এটা তোমার শ্লাঘা হ'তে পারে; বহুজন তোমাকে শ্রদ্ধা করে, এটা তোমার গৌরব হ'তে পারে; কিন্তু তোমার সার্থকতা শুধু এদের উপরে নির্ভরশীল নয়। তুমি ধন্য হবে তোমার অকৃত্রিম সেবকত্বের মহিমায়।

মণ্ডলীর সভ্যমাত্রেই অপর সকল সভ্যের সেবক,—এখন সে সভাপতিই হোক্, সম্পাদকই হোক্, কোষাধ্যক্ষই হোক্, অথবা আর যা-কিছুই হোক্। আমি পাঠ ভাল করি, অতএব আমিই শ্রেষ্ঠ; আমি সুর শুদ্ধ গাই, অতএব আমিই শ্রেষ্ঠ; আমি বেশী কাজ করি, অতএব আমিই শ্রেষ্ঠ; আমাকে বেশী লোক মানে, অতএব আমিই শ্রেষ্ঠ; আমার আর্থিক অবস্থা সকলের চাইতে ভাল, অতএব আমিই শ্রেষ্ঠ; আমি মান্ধাতার আমল থেকে মণ্ডলীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, অতএব আমিই শ্রেষ্ঠ;—এই ভাব থাকলে চলবে না। আমি সেবক, সকলের সেবক, মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি প্রাণীর সেবক, এই ভাবটুকু মনে রাখতে হবে। দশ সহস্র সেবক এক সঙ্গে কাজ করতে পারে কিন্তু দুটি বা পাঁচটি কর্ত্তা এক সঙ্গে কাজ করতে পারে না। ধর্ম্ম-সঙ্ঘের পরিপূর্ণ বিকাশ সেবকত্বের দ্বারাই সম্ভব, কর্ত্তা-গিন্নীর অহমিকা দ্বারা নয়।

মণ্ডলীর পদাধিকারী নির্ব্বাচনে কুট-নীতি

অনেক সময়ে মণ্ডলী স্থাপনের পরে পদাধিকারীরা ভুলিয়া যান যে, এই পদ চিরস্থায়ী নহে। তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ একজন মণ্ডলীর সম্পাদক হোল বা অন্য কোন পদাধিষ্ঠিত হল। সারা জীবন

তাকেই ঐ পদে থাকতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। দুই-এক বছর পরে পরে প্রয়োজনমত পদাধিকারী ব্যক্তিদের পরিবর্ত্তন উচিত। নূতন লোক এল ব'লে পুরাতনেরা নিজেদিগকে অপমানিত জ্ঞান করলে সেটা নিতান্তই ভুল বুঝা হবে। এই ভুল তোমরা কেউ ক'রো না। একজনের কার্য্যকালে মণ্ডলীর বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা গেলে তাকে আরও দুই-এক বছর বা দুই-চারি বছর মণ্ডলীরই স্বার্থে কাজ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। মিথ্যা অভিযোগ, কল্পিত অনুযোগ এবং অশালীন দুর্য্যোগ সৃষ্টি ক'রে তাকে বিপর্য্যস্ত করা উচিত নয়। একদিকে যেমন জোর ক'রে পদাধিকার রক্ষা করার চেষ্টা ভাল নয়, অন্য দিকে তেমন পরশ্রীকাতরতা বা অন্য নিন্দনীয় অভিপ্রায় দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে ব্যাপক ষড়যন্ত্র সৃষ্টি ক'রে তাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টাও ভাল নয়। ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানে কিংবা নৈতিক চরিত্রের উন্নতি-সাধক অনুষ্ঠানে কূটনীতি ও অপকৌশলের ব্যবহার অত্যন্ত জঘন্য। অথচ নানা স্থানে তাই হ'য়ে আসছে। ব্যক্তির কোনো দাম নেই, দাম হচ্ছে আদর্শটার। মিথ্যা বা অতিরঞ্জন বর্জ্জন করার অভ্যাস বন্ধ না করলে যে-কোনও মণ্ডলীতে কূটকুচক্রের রাজত্ব যে-কোন সময়ে প্রসারিত হ'য়ে যেতে পারে। কারণ, ভগবানের কাজ চলে স্বভাবের গতিতে আস্তে আস্তে। আর শয়তানের কাজ চলে হঠকারিতা সহকারে অতিদ্রুত ও আচম্বিতে।

মণ্ডলী স্থাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মণ্ডলী স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্যেই হচ্ছে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাকে সুনিশ্চিত ক'রে দেওয়া এবং নিয়মিত উপাসনা পরিচালনা। এই কাজটা যদি হয়, তবে অন্যান্য দশটা কাজ এখনই হচ্ছে না ব'লে অনুশোচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। উপাসনাটি যদি সুচারু-রূপে সম্পাদিত হয়, তাহ'লে আস্তে আস্তে অন্যান্য সৎকার্য্যের বা অভিপ্রেত অনুষ্ঠানের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি স্বভাবতঃই সৃষ্ট হবে। ইঞ্জিন চলতে আরম্ভ করলে যেমন রেলগাড়ীর সবগুলি প্রকোষ্ঠই চলতে থাকে, ব্যাপারটা ঠিক সেই রকম। সমবেত উপাসনাকে ইঞ্জিন ব'লে ধরে নাও। এর ভিতরে যেন কোনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট না হয়। উপাসনাটি হ'য়ে গেল তো শান্ত মন, স্নিগ্ধ প্রাণ, তৃপ্ত চিত্ত নিয়ে নিরুদ্বেগে ঘরে ফিরে যাও এবং সংসারের হাজার কর্ত্তব্য সিংহ-বিক্রমে করতে লেগে যাও। সমবেত উপাসনা তোমার টনিক্ হোক্। এই টনিকের সাহায্যে শরীরকে ক্লান্তিমুক্ত, উদ্যমকে বাধামুক্ত ক'রে কাজে লাগ। সমবেত উপাসনাকে তোমরা সাপ্তাহিক সার্ভিসিং বলতে পার। সারা বছর যে

মোটর-কারটা বেপরোয়া বেগে সুপথে, কুপথে, অপথে, বিপথে বিচরণ ক'রে ক'রে ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, আহত ও রুগ্ন হয়, তাকে বছরে বাহান্নটা সপ্তাহে বাহান্নবার সার্ভিসিং করিয়ে নিয়ে দশ বছরের গ্যারন্টির গাড়ী পঁচিশ বছর ধ'রে নিখুঁত সেবা দিতে বাধ্য করা যায়। এটা একটা সরল সত্য। এর মধ্যে কবিকল্পনার স্থান নেই। প্রধান উদ্দেশ্যকেই প্রধান রাখ, গৌণ বিষয়কে প্রধান হ'তে দিও না।

সমবেত উপাসনার মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্মকে ধর্ম্মই থাকতে দাও। তাকে সর্ব্বদা সত্য এবং পবিত্রতার উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ্‌তে চেষ্টা কর। ভাণ এবং কৌশলের সেখানে স্থান নেই। সরল, সহজ, অনাড়ম্বর মৈত্রী-ভাবনা দ্বারা তোমাদের প্রতিটি কার্য্য-পরিচালিত হওয়া চাই। ঈশ্বরের নাম নিয়ে যে অনুষ্ঠান, ও প্রতিষ্ঠান, তার ভিতরে ঝগড়া-ঝাটি এক অতীব বিসদৃশ ব্যাপার। উপাসনার আসরে এসে ঝগড়া করা আরও মারাত্মক। ঝগড়া মেটাবার উপায়-স্বরূপই সমবেত উপাসনার আসরকে গ্রহণ করা উচিত। যার কারও সঙ্গে ঝগড়া নেই, মনোমালিন্য নেই, যার কারও সম্পর্কে হিংসা-বিদ্বেষ নেই, জগতে সেই

তো প্রকৃত সুখী মানুষ। কোথাও সমবেত উপাসনা হচ্ছে শুনলে সেখানে গিয়ে যোগদান করা এই জন্যই তো উচিত। তবে যদি অনিমন্ত্রিত ব্যক্তির উপস্থিতিতে গৃহস্থের কোনও অসুবিধার কারণ থাকে, তাহ'লে না গেলে দোষ নেই। মনে কর, উপাসনার স্থান অতীব সঙ্কীর্ণ, মনে কর উপাসনাটা করাই হচ্ছে একটা মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে, তৎস্থলে, যাবে, কি না যাবে, বিচার করা উচিত।

মন্দ উদ্দেশ্যে সমবেত উপাসনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উদ্দেশ্যের সাত্ত্বিকতা দিয়ে কার্য্যের সাত্ত্বিকতা বিচারিত হয়। দেখতে কার্য্যটী যদি ভাল হয় এবং ভিতরের উদ্দেশ্য যদি মন্দ হয়, তবে দেখ্‌তে ভাল কাজটীও মন্দের পর্য্যায়েই গিয়ে পড়ে। মন্দ উদ্দেশ্যে সমবেত উপাসনা কথাটা শুনতে নূতন। কিন্তু ধর্ম্মীয় কাজের ছলে নরহত্যা, নারীধর্ষণ এসব কুকাণ্ড জগতে বহু সময়ে বহু স্থানে হয়েছে। একটি সমবেত উপাসনায় লোক জমিয়ে পরে তুমি বৈর-সাধনের উদ্দেশ্যে কারও নামে নিন্দা অপবাদ রটনা করবে। এই যদি হ'লো অবস্থা, তবে তো তোমার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মন্দ হোল। কিংবা উপাসনার নাম ক'রে লোক ডেকে এনে প্রসাদ দেবার সময় কারও কারও প্রসাদের সঙ্গে হলাহল মিশ্রিত ক'রে দিলে, এই যদি হয় তোমার উদ্দেশ্য,

তবে এটা নিশ্চয়ই মন্দ হ'লো। সমবেত উপাসনার নাম ক'রে কতকগুলি তরুণ-তরুণীকে এমন অন্যায় ভাবে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ তুমি দিলে, যাতে তারা চরিত্রভ্রষ্ট, সংযমচ্যুত ও পতিত হোল। এরূপ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মন্দই বটে। এসব অন্যায়ের জন্য উপাসনা ডাকা হয়েছে ব'লে যদি কারও মনে সন্দেহ হয়, তবে সে নিশ্চয়ই সমবেত উপাসনার ঐ আসর বর্জ্জন করতে বাধ্য হবে। অথবা কেউ যদি সমবেত উপাসনা রূপ পবিত্র অনুষ্ঠানকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবার উদ্দেশ্যে তাঁর "প্যারোডি" করে, তবে এই বিদ্রূপাত্মক অনুষ্ঠানটিও মন্দ উদ্দেশ্যেই হোল। এমন অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই বর্জ্জন করতে হবে। তবে এই জাতীয় ঘটনা খুবই বিরল।

শান্তি, শৃঙ্খলা ও শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি যদি মনে শান্তি পায়, তবে তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ব্যক্তিকে, সমাজকে এবং জাতিকে শান্তি দিবার জন্যই সমবেত-উপাসনা-জাতীয় অনুষ্ঠানের সৃষ্টি ঘটেছে। শান্তি দেয় শৃঙ্খলা, শৃঙ্খলা দেয় অল্প সময়ে অল্প চেষ্টায় শক্তির উদ্বোধনের সামর্থ্য, শক্তি দেয় জাগৃতি আর জাগৃতি দেয় কর্ম্মৈষণা। ব্যক্তিই বল, সমাজই বল, আর জাতিই বল, বিশ্বমানবের কুশলের জন্য এইগুলির অর্থাৎ শান্তির, শৃঙ্খলার ও শক্তির প্রয়োজন প্রত্যেকের আছে।

সঙ্ঘবদ্ধতাই শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—খুব বড় কাজ আর খুব শক্ত কাজ প্রায়ই কেউ একা ক'রে উঠ্‌তে পারে না। এজন্য বহু জনের সংহতি প্রয়োজন হয়। বড় বড় লোকেরা বড় বড় কাজ একাকী কত্তেন হয়ত সত্য যুগে। এইযুগে সঙ্ঘবদ্ধ না হ'লে বড় কাজ করা কঠিন। বড় কাজের জন্য সব সময়ে যে বড় বড় লোকেরা অবতীর্ণ হবেন, এমন আশা না করাই ভাল। তাঁরা কর্ম্মক্ষেত্রে নামেন ত' খুবই ভাল কথা। কিন্তু সাধারণ লোকেরা যদি একজনের সঙ্গে আর একজন প্রাণের, মনের ও পরিকল্পনার মিল রেখে কাজে নামে, তবে তারাই বড় বড় কাজ সুসম্পন্ন ক'রে দিতে পারে। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন,—"সঙ্ঘে শক্তিঃ কলৌ যুগে।" যে যুগে মানুষের উন্নতির মান খুবই নিম্ন স্তরের, সেই যুগের মানুষও সঙ্ঘবদ্ধ যদি হ'তে পারে, তবে জগৎকে শক্তির খেলা দেখিয়ে বিস্ময়-বিমুগ্ধ ক'রে দিতে পারে।

(একবিংশ খণ্ড সমাপ্ত)